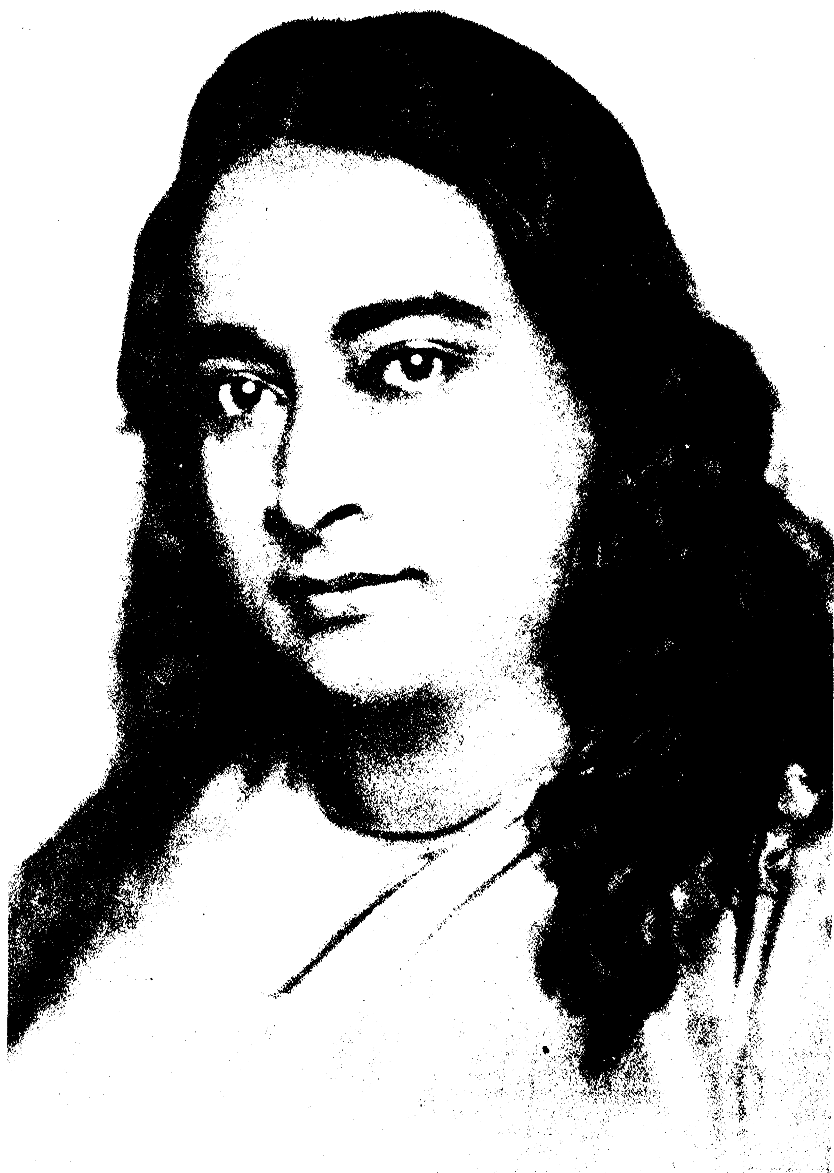


শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ

(১৮৯৩-১৯৫২)

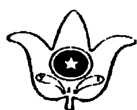
মেজদা

(Mejda)

শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দজীর

পূর্বজীবন ও পারিবারিক বৃত্তান্ত

শ্রী সনন্দলাল ঘোষ



—প্রকাশক—

যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া

যোগদা সৎসঙ্গ মঠ

দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা-৭০০০৭৬

১৩৬০

প্রকাশক :
Yogoda Satsanga Society of India
Yogoda Satsanga Math
Dakshineswar, Calcutta-700076.



An authorized publication of Yogoda Satsanga Society of India/Self-Realization Fellowship

প্রথম বাংলা সংস্করণ ১৩৬০

মুদ্রাকর :
শঙ্করকুমার দে
শ্রীমা মুদ্রণ
৮/বি, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

মদীয় পিতৃদেব শ্রী ভগবতী চরণ ঘোষের
শ্রীকরকমলে—

পিতঃ,

দীপ্ত তোমার পুণ্য প্রভায়
ভরেছিল এই গেহ।
মায়ের অভাব দেয়নি বুঝিতে
তোমার অতল স্নেহ ॥
দীক্ষা নিয়েছ ত্যাগ ও প্রেমের
নিষ্কাম বৈরাগী।
জীবন তোমার পূত হোমানল
বিশ্বদেবের লাগি ॥
হে প্রাচীন বট, আশ্রয় লভি
তোমার শীতল ছায়।
জুড়াইল কত তাপিত পরাণ
করুণার মৃদু বায় ॥
তুমি চলে গেছ মহানদ সম
জীবনের দুই ধারে।
ঊষর মরুরে দানি শ্যামলিমা
ফল-ফুল সম্ভারে ॥
জীবনের শত- বন্ধন মাঝে
ছিলে বন্ধন-হীন।
ক্লান্তিবিহীন কর্মজীবন
ফল-আকাংখা-হীন ॥
স্বর্গ হইতে করগো আশিস্
দাও বুকে নব বল।
হয় যেন তব চরণ চিহ্ন
এ' জীবনে সম্বল ॥

স্নেহধন্য
সনন্দ (গোরা)

মুখবন্ধ

[ডঃ আশুতোষ দাস, এম্. এ. (ডবল্), পি. এইচ্. ডি., ডি. লিট্ (কলি), বিদ্যা-বাচস্পতি, সাহিত্যশাস্ত্রী, তন্ত্রযোগসিদ্ধান্তবাগীশ, এফ্. আর. এ. এস্ (লণ্ডন), প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক লিখিত।]

"মেজদা" : শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দজীর পূর্বজীবন ও পারিবারিক বৃত্তান্ত* নামক গ্রন্থখানি পরমহংস যোগানন্দের "যোগিকথামৃত"-এর (অটো-বাইওগ্রাফি অফ্ এ যোগী-র বাংলা সংস্করণ) পল্লবিত পরিশিষ্ট। তাঁর অনুজ শ্রী সনন্দলাল ঘোষ বিরচিত এ এক অমূল্য জীবনীগ্রন্থ। আত্মবিঘোষণ প্রতিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনায় পরমহংস যোগানন্দ তাঁর আত্মজীবনীতে সহজ সংকোচ ও সপ্রতিভতার জন্য যা বলেন নি, তাঁর অনুজ শ্রী সনন্দলাল ঘোষ তা বলে 'যোগিকথামৃত'র পূর্ণতা সম্পাদনে গ্রন্থটির সৌষ্ঠব বর্ধন করেছেন।

"যোগিকথামৃত" পরমহংস যোগানন্দের আত্মজীবনী। এটি নবযুগের উপনিষদ্†রূপে বিপুল সমাদরলাভ করেছে। ইউরোপ আমেরিকা তথা সমগ্র বিশ্বে ১৬টি ভাষায় এর অনুবাদ হয়ে ঐ সব ভূখণ্ডের অধিবাসীদের অধ্যাত্ম-পিপাসা নিবারণের সহায়ক হয়েছে। ভারতবাসী বিস্ময় বিমুগ্ধতার সঙ্গে তা প্রত্যক্ষ করে অন্তরে ধর্মভাবের ধ্যান জমিয়েছে এবং 'যোগিকথামৃত'র হিরণ্য-ভাণ্ডে মনের অমিয় সঞ্চিত রয়েছে দেখে গর্বানুভবে তৃপ্ত হয়েছে।

পরমহংস যোগানন্দের জীবনকথা চিত্তাকর্ষক। হিন্দু ধর্মের সার্থক প্রবক্তা, আমেরিকায় ভারতীয় 'ক্রিয়াযোগ' প্রচারের অন্যতম প্রধান পুরোহিত-রূপে তাঁর যশঃ-সৌরভ, আপন গৃহাঙ্গন ৪নং গড়পার রোড, তাঁর গুরুদেব স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর আশ্রম শ্রীরামপুর, এবং রাঁচি যোগদা ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়‡ থেকে আমেরিকা পর্যন্ত দিগন্ত প্রবাহিত। যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া/সেলফ্ রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপের অধীনে পৃথিবীর বহু স্থানে তিনি অসংখ্য ধ্যানকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। এইসকল আশ্রম, মন্দির ও ধ্যানকেন্দ্রগুলি হলো ভারতীয় যোগসাধনার পীঠস্থান।

এই অসামান্য শক্তিধর সন্ন্যাসীর পুংখানুপুংখ জীবনকথা শ্রবণের কৌতূহল, তাঁর সাধন সমাদৃত অলৌকিক ঘটনাসমূহের প্রতি স্বতঃ আকর্ষণ দেশ-বিদেশের অধ্যাত্মপিপাসু অগণিত মানুষকে তাঁর তপোধাম কলকাতায় এনে

---

* 'মেজদা'—লেখক শ্রী সনন্দলাল ঘোষ তাঁর আপন মধ্যম ভ্রাতা শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দজীকে এই নামেই সম্বোধন করতেন। (প্রকাশকের মন্তব্য)

† ঐতিহাসিক তথ্যবিচারে উপনিষদের মোট সংখ্যা হলো ১০৮। এগুলি চতুর্বেদের সারাৎসার। উপনিষদ্গুলিকে 'ব্রহ্মবিদ্যা'ও বলা হয়ে থাকে।

‡ শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ প্রতিষ্ঠিত বালক বিদ্যালয়।

কল্লোলিতকণ্ঠ করেছে। সেই কৌতূহল নিবৃত্তিসূত্রে 'মেজদা'র বিবরণ এক যুগোপযোগী সত্ত্বভাব নিষ্ণাত উত্তম উদ্যম। অপূর্ণ গ্রন্থের পূর্ণাবয়ব স্বরূপ।

এই গ্রন্থের মুখবন্ধ রচনার আমন্ত্রণ আমার ক্ষেত্রে একান্ত আকস্মিক। এতে অধিকারের প্রশ্নও সমসংশ্লিষ্ট। অতীতের স্মৃতিসূত্রে আকস্মিকতায় অবগাহনের আত্মপ্রসাদে গ্রন্থকারের ইচ্ছা মান্য করেছি। ১৯৩৮ সনের গ্রীষ্মাবকাশে ছোটনাগপুরের পাহাড়ে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে আকস্মিকভাবে আমি পরমহংস স্বামী যোগানন্দের কীর্তিকথা প্রথম শুনি এবং অভিভূত হই। পরে ছাত্র জীবনোত্তর কর্মজীবনে, কলকাতা ভবানীপুর চক্রবেড়িয়া অঞ্চলে জীবন মৈত্রের 'পদ্মপুরাণে'র পুঁথি সন্ধান উপলক্ষ্য করে এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির বাড়ীতে শ্বেত কৃষ্ণ মূর্তি দেখতে গিয়ে একান্ত আকস্মিকভাবে পরমহংস যোগানন্দের দুই আমেরিকান শিষ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুসী হই। তাঁরাও মধুমুরলীধর শ্বেত কৃষ্ণের মূর্তি দেখতে রাঁচি থেকে এসেছিলেন।

একদিন শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের আমন্ত্রণে তাঁর বাসগৃহে যাই। কথোপকথন প্রসঙ্গে জানতে পারি এ'বাড়ীতেই পরমহংস যোগানন্দ সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর সংগে সেই পবিত্র প্রার্থনা-গৃহে (এটিক্ রুম) গেলাম। প্রণাম জানালাম। কতক্ষণ বসলাম। তাঁর পত্রাবলীতে উল্লেখ রয়েছে—'এটি আমার পীঠস্থান—"হোয়ার আই ফাউণ্ড গড্"। এই তপঃক্ষেত্র দর্শনের সুকৃতি খুবই আকস্মিক। আমার সাধারণ জীবনের এক মাহেন্দ্রমুহূর্ত। এখন ভাবছি—তবে কি ছোটনাগপুরের পাহাড়ে সন্ন্যাসীর আশ্রম থেকে আমার আদর্শ আলোকিত ছাত্রজীবনের নগণ্য প্রণাম তিনি অলৌকিক শক্তিবলে গ্রহণ করেছিলেন? সেই প্রণাম-প্রসন্নতার প্রসাদেই কি তাঁর ঈশ্বরদর্শন কক্ষ দেখবার সৌভাগ্য এবং 'মেজদা' গ্রন্থের মুখবন্ধ লেখার অচিন্তিতপূর্ব সংযোগ।

ইহমুখ্য জীবনের প্রতি আকর্ষণের আধিক্য সত্বেও পাশ্চাত্যের অগণিত মানুষ পরমহংস যোগানন্দের অধ্যাত্মশক্তির তথা তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করছে। এ এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তি বহুশ্রুত। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসীর নিত্য ধ্যায়ত। নিখিল মানবমন এই অলৌকিকতায় সম্মোহিত। অলৌকিকতা সত্ত্বভাবের পরিপোষক ও অধ্যাত্ম অনুভবের মণিমন্দির। তাই পরমহংস যোগানন্দের জীবনের অকথিত ও অলৌকিক কাহিনী শোনার বিনত আবেদন নিয়ে তাঁর পৈতৃক বাসগৃহে এত বিদেশী পর্যটকের সমাগম। সেই প্রত্যাশা পূরণের প্রসন্ন প্রয়াসে পরমহংস যোগানন্দের অনুজ ও আবাল্যসঙ্গী শ্রী সনন্দলাল ঘোষ পরিণত বার্ধক্যে বহু কৃচ্ছ্রসাধ্য এই গ্রন্থ রচনা করে যশোদীপ্ত হলেন। যে সব ঘটনা অন্যের অগোচর, অগ্রজ পরমহংসদেবের অনুগামী, ভক্ত, শৈশবের সহযোগী ও ছায়াসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্যসূত্রে সে সব সাধনাসমৃদ্ধ নিভৃত জীবনপ্রকাশ তাঁরই চোখের সামনে সংঘটিত হয়েছিল বলে তাঁর গ্রন্থের অসীম ঐতিহাসিক মূল্য।

বংশপরিচয় প্রসঙ্গে জানলাম পরমহংস যোগানন্দ এক পুণ্যস্নাত যোগীর বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা গৃহস্থ যোগী ও মনস্বী ব্যক্তি। তাঁর মা ছিলেন সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী। যোগীরাজ লাহিড়ী মশাইর কাছে তাঁর মা ও

বাবা উভয়েই দীক্ষাপ্রাপ্ত। সাংসারিক জীবনে পরমহংস যোগানন্দ মুকুন্দলাল ঘোষ নামে পরিচিত। তাঁর অপর তিন ভ্রাতা এবং চার ভগ্নী—সকলেই অধ্যাত্ম পরিবেশে লালিতপালিত হন্।

ভ্রাতারা সকলেই অসাধারণ গুণান্বিত দিক্‌পাল! অগ্রজ অনন্তলাল। কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত বড় অফিসার* ছিলেন। অল্প বয়সে প্রচুর অর্থ অর্জন করেছিলেন। ভাই বোনদের প্রতি তাঁর অসীম স্নেহশীলতা অন্যের আদর্শ। তিনি খুব দয়ালু, পরোপকারী, মিতাচারী, মিতাহারী ও মিতব্যয়ী ছিলেন। ধর্ম বিষয়ে অত বিশ্বাস ছিল না। পরে মুকুন্দের আধ্যাত্মিক প্রভাবে তাঁর মনে পরিবর্তন আসে এবং তিনি মুকুন্দের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে তাঁর লোকান্তর ঘটে। 'অটোবাইওগ্রাফি অফ্ এ যোগী' গ্রন্থে পরমহংস যোগানন্দ তাঁর অগ্রজের গুণাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।

অনুজ শ্রী সনন্দলাল ঘোষ পরম যোগী। পরমহংস যোগানন্দের পার্শ্বচর। তিনি একাধারে শিল্পী, সাধক, সঙ্গীতজ্ঞ, স্থপতি ও কর্মকুশল কারিগর। তিনি সর্ববিদ্যা বিশারদ বিশ্বকর্মা। তাঁর আঁকা পরমহংস যোগানন্দের ছবি বিশ্বব্যাপ্ত ও বহু প্রশংসিত। তাঁরই আঁকা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ছবিটি সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে অনেক স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মহামনীষী সূত্রে ছবিটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছবিটি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত ও সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং দাঁড়ান ভঙ্গীতে তাঁর ভাল ছবিগুলোর মধ্যে এটিকে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত প্রশংসাপত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দিল্লীর অ্যাসেমব্লিতে তাঁর আঁকা রবীন্দ্রনাথের ছবিটির মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে।

সর্বকনিষ্ঠ বিষ্ণুচরণ ঘোষ। ভারত বিখ্যাত ব্যায়ামবীর। লণ্ডনে 'মিস্টার ইউনিভার্স' বিশ্ব প্রতিযোগিতায় প্রথম ও একমাত্র ভারতীয় বিচারক এবং সর্বসাধারণ্যে হঠযোগ প্রচারের প্রথম পথিকৃৎ। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, শক্তি, সাহস, আন্তরিকতা ও মহানুভবতা দেখে তাঁর পরিচয় প্রসূত সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি। তিনি যোগীন্দ্র এবং ভারত গৌরব মনীষী ব্যক্তি ছিলেন। ভারতীয় হঠযোগকে তিনি আশ্রম অবরোধ থেকে গৃহাঙ্গণে ও মাঠে নামিয়ে এনে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার দাক্ষিণ্য দেখিয়েছেন। ভারতীয় যোগের গণদীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যায়ামাচার্য্য বিষ্ণুচরণ ঘোষ বিশ্ববিশ্রুত ও চিরস্মরণীয়।

পরমহংস যোগানন্দ যোগীশ্বর। যোগ শক্তিতে তাঁর সহজ উত্তরাধিকার। লাহিড়ী মহাশয় তাঁর প্রগুরু (মা, বাবা ও নিজ গুরু স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজীর গুরু)। যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া/সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপের শক্তিমান গুরু পরম্পরায়† তিনি চতুর্থ এবং যোগী সার্বভৌম!

* সরকারী পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপারমেন্টের সুপারভাইজিং অ্যাকাউন্‌টেণ্ট।

† মহাবতার বাবাজী, লাহিড়ী মহাশয়, স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর এবং পরমহংস যোগানন্দ। পরমহংসজীর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীগণ যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া/সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপের মাধ্যমে তাঁরই কাজকে সম্প্রসারিত করে চলেছেন। তাঁর

আমেরিকা, ইউরোপ তথা সারা বিশ্বে তাঁর যোগ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত ক্ষেত্র।

লোকের ধারণা বনপাহাড় নিবাসী সন্ন্যাসী ছাড়া 'ক্রিয়াযোগ' অনুশীলন কারো পক্ষে সম্ভব নয়। পরমহংস যোগানন্দ 'ক্রিয়াযোগে'র সহজ পন্থা প্রবর্তন করে দেখালেন, পৃথিবীর যে কোনো দেশের সংসারী জীবনে নিযুক্ত সাধারণ মানুষের পক্ষেও তা সম্ভব ও হিতকর। লাহিড়ী মহাশয়ের ক্রিয়াযোগের পদ্ধতিকে আরোও সহজ করে দেশ-বিদেশের মানুষের সংসারী জীবনের উপযোগী পন্থা নির্দ্দেশে তিনি জগৎকল্যাণের পথকে প্রশস্ত করেছেন। ভারতবাসীও এই ক্রিয়াযোগের মঙ্গলাভিপ্রায়ে অভিষিক্ত হয়ে পরমহংস যোগানন্দের প্রচারিত ক্রিয়াযোগে উদ্বুদ্ধ হবে।

"মেজদা" সেই 'ক্রিয়াযোগ' মহাযজ্ঞেরই মঙ্গলদীপ।

প্রথম উত্তরাধিকারী রাজর্ষি জনকানন্দ ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্য্যন্ত এই কাজে বৃত ছিলেন। পরবর্তী উত্তরাধিকারী শ্রীশ্রী দয়ামাতাজীও রাজর্ষির মতই পরমহংস যোগানন্দজীর কাছে শিক্ষালাভ করেন এবং তৎ কর্তৃক উক্ত পদে মনোনীত হন্। (প্রকাশকের মন্তব্য)

প্রকাশকের নিবেদন

'মেজদা' নামক এই গ্রন্থের গ্রন্থকারের লোকান্তর প্রাপ্তি আমাদের কাছে এক অতীব মর্মান্তিক ঘটনা। ১৯৭৯ সালের ১০ই অক্টোবর একাশি বছর বয়সে শ্রী সনন্দলাল ঘোষ কল্‌কাতায় পরলোকগমন করেন। 'অটো-বাইওগ্রাফি অফ্‌ এ যোগী' গ্রন্থের রচয়িতা এবং যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্‌ ইণ্ডিয়া/সেলফ্‌ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপের বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা পরমহংস যোগানন্দজী হলেন এই গ্রন্থকারের অগ্রজ এবং তাঁর 'মেজদা'। অগ্রজের বাল্যকাহিনী এবং বিভিন্ন পারিবারিক ঘটনাবলী গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ করার জন্য আমরা তাঁর নিকট অশেষ কৃতজ্ঞ। বইখানিতে প্রকাশিত অনেকগুলি ফটো আমরা শ্রীঘোষের কাছ থেকে পেয়েছি ; বাকী ফটোগুলি সেলফ্‌ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপের সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।

পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত বিবিধ তথ্যের বিশ্লেষণে এবং প্রামাণিকতা প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের সংগে পরামর্শ করার সুযোগলাভ করে আমরা খুবই উপকৃত হয়েছি। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অকৃপণভাবে তিনি আমাদের সেই ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। অবশ্য নিজে তিনি সে' কাজ সমাপ্ত করতে না পারলেও তাঁর পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিগণ এবং সুহৃৎদের কাছ থেকে আমরা অমূল্য সহায়তা পেয়েছি। গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ বিবরণ, কিন্তু পরিতাপের কথা গ্রন্থকার আপন জীবদ্দশায় গ্রন্থটির প্রকাশন দেখে যেতে পারেন নি। যাই হোক্‌ একথা অনস্বীকার্য যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মগুরুর জীবন-কাহিনী রচনা হিসাবে এটি এক অসামান্য অবদান বলে চিরদিন পরিগণিত হবে।

যোগদা সৎসঙ্গ মঠ
দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা-৭০০০৭৬

যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্‌ ইণ্ডিয়া

ভূমিকা

'অটোবাইওগ্রাফি অফ্ এ যোগী' (যোগিকথামৃত) লিখতে গিয়ে 'মেজদা' (পরমহংস যোগানন্দ) নিজের ছোটবেলা বা বাল্যজীবনের অনেক কথাই লেখেন নি। মনে হয়, অনেকটা ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেছেন।

তাঁর হয়তো মনে হয়েছে, এতে বড় বেশী নিজেকে জাহির করা হবে, আশপাশের অনেককে ছাপিয়ে যাওয়া হবে। কেউ হয়তো ভাবতে পারে যোগী মহারাজ নিজের প্রশস্তিই গেয়ে গেছেন। জীবনে অনেক সময় ওঁকে দেখেছি নিজেকে পিছনের সারিতে রেখে অন্যকে সামনের সারিতে এনে বসিয়েছেন, নিজের কথা বলতে গিয়েও তিনি বিরত থেকেছেন। সে' কারণে ঘটনাবহুল ছোটবেলাকে দূরে সরিয়ে রেখে 'যোগিকথামৃত'কে অসম্পূর্ণ করে রাখা তাঁর ইচ্ছাকৃত বলেই আমার মনে হয়েছে।

আমি অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করে আসছিলাম, সাধারণের অজানা মেজদার জীবনের ছোটবেলার ঘটনাগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে সবাইকে জানাতে। আমার ইচ্ছাতরু দিনে দিনে মহীরুহ হয়েছে। সময়োচিত প্রেরণা না পেলে আমার মনের ইচ্ছাটুকু মনেই শুকিয়ে যেতো। একটা বিরাট ঋণের জগদ্দল পাথরের বোঝা নিয়ে পৃথিবী থেকে আমাকে বিদায় নিতে হতো। মেজদা ছিলেন আমার কৈশোরের সঙ্গী সুহৃদ্, যৌবনের পথ প্রদর্শক। আজন্ম যোগী ও জ্ঞানীগুরু, যোগেশ্বর যোগানন্দের অব্যক্ত জীবনকথা আমার অতীত দিনের স্মৃতিচারণার মণিমঞ্জুষা।

মেজদার 'অটোবাইওগ্রাফি অফ্ এ যোগী' (যোগিকথামৃত) বইটি পড়ে, সারা পৃথিবী থেকে বারো মাস যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া/সেলফ্ রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপের ভক্তগণ মেজদার বাল্যজীবনের লীলাভূমি, বাসস্থল ও সাধনার পীঠস্থান এই চার নম্বর গড়পার রোডের বাড়ী দেখতে আসেন। কারণ এটাকে তাঁরা তাঁদের তীর্থস্থান বলেই মনে করেন। অর্থবান লোকেরা তো আসেনই, তাছাড়াও দেখেছি সামান্য অবস্থার লোকও অনেক দিন ধরে অর্থ সঞ্চয় করে এই চার নম্বর গড়পার রোডের বাড়ীতে তীর্থ করতে এসে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। তাঁদের ভক্তি দেখলে অবাক হতে হয়—মাথা নত হয়ে আসে। এই বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কেউ কেউ পরম ভক্তি-ভরে সিঁড়ির ধুলো মাথায় দেন এবং বলেন—এই সিঁড়ি দিয়েই তো পরমহংসজী কতবার ওঠানামা করেছেন। তারপর মেজদা কোন্ ঘরে শুতেন, কোন্ ঘরে বাবাজী মহারাজের দর্শন পেয়েছিলেন সেই সব দেখতে চান এবং তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার উপরের ছোট ঘর—যা 'অ্যাটিক্ রুম' বলে পরিচিত--সেই ঘরে বসে কেউ কেউ ধ্যানও করতে চান।

এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের নানা দেশের ভক্তজন এখানে এসে এবং মেজদার পরিবারের লোকদের দেখে ও পরিচয় জেনে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। যাঁরাই এসেছেন বা আসেন, সকলেই মেজদার ছোটবেলার গল্প ও

জীবনী শুনতে একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং আমাকে তা বলবার জন্য অনুরোধ করেন। প্রত্যেকেই আমাকে মেজদার বাল্যকালের জীবনী বই আকারে প্রকাশ করতে অনুরোধ করেছেন এবং বলেছেন, এতে বহু লোকের উপকার করা হবে। সকলেই জানেন আমি ছাড়া অন্য কেউ সঠিকভাবে তাঁর বাল্যজীবনী ব্যক্ত করতে পারবে না, কারণ আমিই ছিলাম মেজদার বাল্যকালের সঙ্গী—তিনি আমার থেকে মাত্র পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। ছোটবেলায় আমিই ছিলুম ওঁর সেদিনের বিচিত্র ঘটনার নিত্য সাক্ষী। তাই কাছে থেকে আমি ওঁকে যতখানি জেনেছি, চিনেছি, ঠিক্ তেমনটি কারোর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

মেজদার কথা বলতে গিয়ে আমার নিজের কিছু কিছু কথা অনিবার্য্য-ভাবে এসে পড়েছে। এটা কিন্তু আমার নিজেকে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা-প্রসূত নয়। ওঁর জীবনের আশ্চর্য্য ঘটনাগুলির সঠিক সত্যতা বজায় রাখবার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন হয়েছে, নিজেকে আমি ঠিক্ ততটুকুই ব্যবহার করেছি।

বই লেখা এক কাজ কিন্তু তাকে প্রকাশ করা আর এক দুরূহ কাজ। ছাপাখানার জটিল পদ্ধতি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তার উপর আমার সময় ও শক্তির অভাব। অনেক বন্ধু-বান্ধব এ ব্যাপারে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। তাদের সানন্দ প্রচেষ্টার ফলেই বইখানি প্রকাশ করা সম্ভব হলো। এঁদের সকলকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতাসহ তাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করছি :

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ দাস এম. এ. (ডবল), পি. এইচ্. ডি., ডি. লিট্. (কলিকাতা), এফ্. আর. এ. এস্ (লণ্ডন), মহাশয় আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন ও বইটি প্রকাশন প্রসঙ্গে সকল প্রকার আনুকূল্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর দুই পুত্র শ্রী প্রেম সুন্দর দাস এম. এ. (ডবল), বি. এস্. সি, এল. এল. বি., এবং শ্রী দিব্য সুন্দর দাস এম. কম্., এল. এল. বি., আমাকে গ্রন্থ রচনা প্রসঙ্গে আবশ্যকীয় সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। তাঁদের সানন্দ সহযোগিতা ছাড়া এ কাজ সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব ছিল না। আমার প্রতিবেশী শ্রী বিনয় দাস অযাচিতভাবে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন। আমার পৌত্র শ্রীমান্ সোমনাথ ঘোষ খুবই উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে। পত্নী পারুললতাও এ'-বিষয়ে আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। ইহজগতে এটাই ছিল তার অন্যতম শেষ কাজ। আমাদের দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে ছেদ ঘটিয়ে গত ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ সালে সে মর্ত্যধাম ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। এদের সকলকেই আমি আমার একান্ত আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সূচীপত্র

মেজদা

১ বাবার প্রারম্ভিক দুঃখময় জীবন

ইছাপুরের আদি বাসস্থান

শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দের পারিবারিক নাম ছিল মুকুন্দলাল ঘোষ। বড়রা তাঁকে 'মুকুন' বা 'মুকো' বলে ডাকতেন, আর আমরা যারা ছোট—সবাই 'মেজদা' বলে ডাকতুম।

আমরা ভাই-বোন মিলে মোট আটজন—চার ভাই আর চার বোন। আমাদের বড়দার ভাল নাম অনন্তলাল—ডাক নাম ছিল নান্টু। তারপর বড়দি রমার্শশি, ডাক নাম টুনি। এরপর মেজদি নাম উমাশশি—বড়রা ডাকতেন মুনি বলে। চতুর্থ আমাদের মেজদা। পঞ্চম আমাদের তৃতীয় বোন, ভাল নাম নলিনী সুন্দরী, ডাকনাম নলি। ষষ্ঠ আমি স্বয়ং অর্থাৎ সনন্দলাল—সবাই ডাকতো গোরা বলে। সপ্তম আমাদের সবথেকে ছোট বোন পূর্ণময়ী বা থামু। আর অষ্টম—বাবা-মায়ের শেষ সন্তান এবং আমাদের সবার ছোট ভাই বিষ্টু বা বিষ্ণুচরণ। এই আট ভাইবোনের মধ্যে আমি একলাই কেবল জীবিত আছি।*

মেজদার সম্বন্ধে বলতে হলে যে আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছিলেন, তার বিষয়ে আগে কিছু বলে নেওয়া দরকার। আমাদের বাবা-মা ঋষিসুলভ এক আদর্শ দাম্পত্য জীবনযাপন করতেন। মেজদার মত একজন উন্নত যোগিপুরুষ এইরকমই এক আদর্শ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শাস্ত্রে বলে, "যিনি প্রজ্ঞালাভ করেছেন তিনি উন্নত যোগি পরিবারেই জন্মগ্রহণ করে থাকেন।" বাবা-মা যোগাবতার লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে 'ক্রিয়াযোগে'† দীক্ষালাভ করেন। মেজদার জীবনে মায়ের আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা ছিল অসীম এবং মায়ের মৃত্যুর পর বাবাও দীর্ঘকাল মেজদাকে তাঁর আধ্যাত্মিক লক্ষ্যপূরণে সহযোগিতা করে গেছেন। ক্রিয়াযোগ সাধনাকে বিশ্বময় প্রসার করার কাজে মেজদার জীবনের লক্ষ্য বা মিশনকে চরিতার্থ করার জন্য বাবা দশ বছর ধরে আমেরিকায় মেজদাকে আর্থিক সাহায্য পাঠিয়েছিলেন।

আমাদের আদি বাড়ী ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার ব্যারাকপুর মহকুমার ইছাপুর গ্রামে। আমরা হুগলী জেলার বালী সমাজভুক্ত দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন

কায়স্থ। আমাদের এক পূর্বপুরুষ দয়ারাম ঘোষ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইছাপুর গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন। কিন্তু তারও অনেক আগে একাদশ শতাব্দীতে, আমাদের এক পূর্বপুরুষ মকরন্দ ঘোষ, বাংলা দেশের রাজা আদিশূরের* আমন্ত্রণে বাংলা দেশে বসবাস আরম্ভ করেন। এরপর দ্বাদশ শতাব্দীতে মকরন্দের এক বংশধর নিশাপতি ঘোষ, হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার বালী গ্রামে রাজা বল্লাল সেনের দান করা একখণ্ড জমিতে বসবাস করা সুরু করেন। রাজার নামে সমাজ সেবা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। 'বর্গী' হাঙ্গামার জন্য দয়ারাম ঘোষ অষ্টাদশ শতাব্দীতে পরিবারবর্গকে নিয়ে ইছাপুরে চলে আসেন। এই বর্গীরা দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত—গ্রামের পর গ্রাম, লুঠ করে বেড়াতো। কিন্তু গঙ্গা পার হওয়া মুশকিল বলে ঐ পর্য্যন্ত এসে তারা আর এগোতো না। ঘোষ পরিবার গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে বাস করতো ; সেজন্য তাদের উপর বর্গী আক্রমণের আশংকা যথেষ্ট ছিল। তাই দয়ারাম ঘোষ গঙ্গার পূব পাড়ে, নিরাপদ ইছাপুরে, পরিবারকে সরিয়ে নিয়ে যেতে মনস্থ করলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি একটা বেশ বড় জায়গাও খরিদ করলেন। জমিটাতে ভাল ভাল অনেক গাছ ছিল। এখানে আমাদের বাড়ীর সামনে একটি বড় গাব গাছ ছিল। তাই আমাদের গ্রাম্য পরিচয় ছিল 'গাবতলার ঘোষ বাড়ী।' গাছটার বয়স আন্দাজ করা কঠিন।

ঠাকুরদাদা ঁঈশান চন্দ্র ঘোষ ছিলেন গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষক। তাঁর ছিল দুই মেয়ে ও তিন ছেলে। বড় মেয়ে নাম বেণী নন্দী ও ছোট মেয়ে হরিমতী। তারপর বড় ছেলের নাম ভগবতীচরণ, মেজো সারদা প্রসাদ ও ছোট সতীশ চন্দ্র। বাবার কাছে শুনেছি ঈশান চন্দ্র নিজ বাগানের শাক-সব্জী, ফল আর গরুর দুধ বিক্রি করে সংসার চালাতেন। একবার ঈশানচন্দ্র একটি পাকা ঘর করার জন্য দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ধার করেন। কিন্তু ভিত গড়ার আগেই হঠাৎ তিনি মারা যান। আমাদের ঠাকুরদা মারা যান বসন্ত রোগে। পাশের বাড়ীর একটি ছোট মেয়েকে তিনি খুব বেশী স্নেহ করতেন। মেয়েটিও তাঁকে খুব ভালবাসতো। একবার এই মেয়েটির বসন্ত হয়েছিল। ঠাকুরদা নিজের নানা ওষুধে ওকে সারিয়ে তুলেছিলেন। ঠাকুরদা সময় পেলেই মেয়েটির কাছে গিয়ে বসতেন। বসন্ত হবার দিন দশেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা ঘুমের ঘোরে ভয় পেয়ে মেয়েটি লাফিয়ে উঠে বসে ঠাকুরদাকে জড়িয়ে ধরে। এ রোগের এই সময়টি খুবই মারাত্মক। বাধা দিতে পারলেন না ঠাকুরদা। কাউকে কিছু না জানিয়ে গঙ্গায় স্নান করে এলেন। সেদিন ভোর-রাত থেকেই জ্বরে পড়লেন ; ঠিক তিনদিন পরে সারা গায়ে গুটি দেখা দিল। খুব শুদ্ধ হয়ে এ রোগের ওষুধ তৈরী করতে হয়। ভীষণ জ্বর আর সারা গায়ে ব্যথা নিয়ে তিনি উঠতে পারলেন না বিছানা ছেড়ে। মারাও গেলেন বসন্ত রোগেই।

* ঘোষ পরিবারের পিতৃপরিচয় জানতে হলে বংশ তালিকা দেখুন।

ছোট ছোট ভাইবোন এবং বিধবা মাকে নিয়ে আমাদের বাবা পড়ে যান অথৈ সমুদ্রে। ধার শোধ হয় না—ঘর তৈরী তো দূরের কথা। আত্মীয়টিও সুযোগ বুঝে একদিন পাঁজার ইঁটগুলি নিয়ে যান। দুরবস্থার পুরোপুরি সুবিধেটুকু আদায়ের আশায় প্রায়ই তিনি আসতে থাকেন আমাদের বাড়ী। যুক্তি ছিল—ঈশানচন্দ্র যে টাকা ঋণ করেছিলেন, তার সবটা ইঁটের পাঁজাগুলি দিয়েও মেটেনি। ফলে বিধবা মায়ের (আমাদের ঠাকুরমা) কপালে জুটতো গঞ্জনা আর লাঞ্ছনা। সম্পদ বলতে তখন শুধু আমার ঠাকুরমার হাতের মাত্র দু'গাছা রুপোর চুড়ি। কিন্তু তা দিয়ে তো আর দেনাশোধ করা যায় না! তাই ঠাকুরমা খালি কাঁদতেন আর কাঁদতেন। আর বাবা ও তাঁর ভাইবোন তাঁকে জড়িয়ে ধরে ঐ করুণ অসহায় মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতেন।

এই দুঃসহ স্মৃতি বাবা জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ভুলতে পারেন নি। যখনই কোন অহেতুক খরচের ব্যাপার ঘটেছে তখনই তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন তাঁর সে'দিনের অবস্থার কথা। আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঋণের সব টাকাই সুদ সমেত শোধ করেছিলেন সেই উত্তমর্ণ আত্মীয়টির অবর্তমানে তাঁর পরিবারবর্গকে।

বাবা নিজের মেধা আর চেষ্টায় হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে ফ্রীতে পড়তেন। ইছাপুর থেকে হেঁটে যাতায়াত করতেন। আমাদের এক জ্যাঠামশাই ছিলেন —বেশ পয়সাওয়ালা। তিনি দয়া করে মাঝে মাঝে একটা করে জলখাবারের জন্য পয়সা দিতেন। তখনকার দিনে এক পয়সায় আটটা কলা পাওয়া যেত। সারাদিন বাবা ঐ কলা খেয়েই কাটিয়ে দিতেন। যেদিন জ্যাঠামশাই পয়সা দিতেন না, সেদিন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পথের ধারে পেয়ারা গাছে পেয়ারা খুঁজতেন। পেলে খেতেন, না পেলে উপোষ।

বাবার দুরবস্থার কথা বলে শেষ করা যাবে না। একদিন রাস্তায় জুতোর সোলের সেলাই গেল কেটে। খাওয়া জোটে না, জুতো সেলাই করবেন কোথা থেকে? দড়ি দিয়ে বেঁধে স্কুলে গেলেন—ক্লাসে যাবার আগে দারোয়ানের ঘরের কাছে গাছের ঝোপের আড়ালে দড়ি বাঁধা ছেঁড়া জুতো লুকিয়ে রেখে খালি পায়ে ক্লাসে ঢুকলেন। যতদিন না সেলাই করতে পেরেছেন ততদিন দড়িবাঁধা জুতো পরেই স্কুলে আসা-যাওয়া করেছেন।

অর্থের অভাবে বাবা বন্ধুদের কাছ থেকে বই চেয়ে পড়া লিখে নিয়েছেন —তবুও বরাবর প্রথম স্থানই অধিকার করেছেন। বিচিত্র তাঁর ছাত্রজীবন। বাড়ীর সামনে বড় গাব গাছের তলায় বসে কলাপাতায় খাগের কলমে লিখতেন। মাটির দোয়াতে তৈরী করে নিতেন ভুষো কালি। ব্লটিং ছিল আরো অদ্ভুত—ধুলোমাটি।

মাঝে মধ্যে দু'একখানা ইংরাজী খবরের কাগজ সেদিনের অজ পাড়াগাঁয়ে যখন পেঁাছত, তখন তিনি ইংরাজী শেখার জন্য তার প্রতিটি লাইন, প্রতিটি শব্দ খুঁটিয়ে পড়তেন। স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে কঠিন শব্দের অর্থ জেনে নিয়ে মনে রাখবার চেষ্টা করতেন। এতে অবাক হয়ে যেতেন অনেকে। ভাবতেন, গরিব ছেলেটি কি করে এই অল্প বয়সে ইংরাজী ভাষা এতখানি

আয়ত্ত করেছে। একবার অল্ ইণ্ডিয়া লেটার রাইটিং কম্পিটিশনে বাবা প্রথম হয়েছিলেন। পরে বড় হয়ে আমরা দেখেছি—ইংরাজী অভিধান তাঁর সম্পূর্ণ মুখস্থ। তাই বাবাকে কেউ ইংরাজী শব্দের অর্থগত বিষয়ে ভুল বোঝাবার অবকাশ পেত না। প্রয়োজনে তাদের তিনি কোন্ শব্দ, কোন্ পাতায় কোন্ লাইনে আছে, এবং তার প্রয়োগগত অর্থ কি—বলে দিতেন।

তখনকার দিনে বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য ছাত্রদের প্রত্যেককে নিজের কাগজ কিনে আনতে হোত। বাবা তাঁর দুঃখী অবস্থার জন্য সব সময় তা পারতেন না। একবার তাঁর এমনি অবস্থা দেখে স্কুলেরই এক অংক-শিক্ষক খানিকটা দয়া করে কোনরকমে একটা লেটার-হেড এনে দিলেন তাঁকে। বাবা তার ছাপান অংশটুকু ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বাকি কাগজের দু'পিঠে সব কটি অংক কষে একশো নম্বর পান। এমনি সব দুঃখ-কষ্ট আর দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করেই তিনি এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইচ্ছা ছিল অনেক লেখাপড়া শিখবেন। সেই আশা নিয়ে আই. এ. পড়তে চাইলেন। অনেকের কাছে হাত পাতলেন—কেউ দিল, কেউ দিল না। প্রয়োজনীয় টাকা শেষ পর্যন্ত অবশ্য জুটলো না মাত্র এক টাকার অভাবে। হাল ছেড়ে না দিয়ে আশায় বুক বেঁধে আবার ধর্ণা দিলেন অনেকের দুয়ারে। ফিরে এলেন বঞ্চনার গ্লানি আর অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা বুকে নিয়ে। মাত্র একটি টাকা আর জোগাড় করতে পারলেন না কিছুতেই। শেষ পর্যন্ত মনের ইচ্ছাটাকে দুমড়ে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন—আই. এ. পড়া আর তাঁর ভাগ্যে হয়ে উঠল না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন—ছোট ভাইদের কোন ইচ্ছাকে এভাবে তিনি মরে যেতে দেবেন না—কিছুতেই না।

বাবা সেই থেকে টিউশ্যনি খোঁজ করতে লাগলেন। কিছুদিন বাদে অনেক কষ্টে সামান্য টাকার কয়েকটা টিউশ্যনি জোগাড় করে তাই দিয়ে ভাইদের লেখাপড়া আর সংসারের খরচ চালাতে লাগলেন।

পরিবারের ভরণপোষণ

বাবা আঠার বছর বয়সে এক স্নেহপ্রবণ প্রতিবেশীর দয়ায় কলকাতায় আসেন। নিজের কর্মস্থলে বাবাকে একটা কাজ পাইয়ে দিতে তিনি অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ! বাবার ছোটখাট চেহারা দেখে ইংরাজ অফিসার বললেন—বাছা! তুমি তো নিতান্তই নাবালক। তোমার তো এখন কলেজে পড়াই উচিত!

বাবা সাহেবকে কিছুতেই বোঝাতে পারলেন না নিজের অভাবের কথা, সংসারের কথা। হতাশার জগদ্দল বোঝা বইতে বইতে শরীর মন দিন দিন ভেঙ্গে পড়তে লাগল। মনে হল—মরীচিকার পেছনে যেন ছুটে চলেছেন। তখনই মনে পড়ে গেল প্রতিজ্ঞার কথা, আবার নতুন আশায় বুক বাঁধলেন। মনে মনে ঠিক করলেন—কলকাতা কিছুতেই তাঁর ছাড়া চলবে না, কারণ ইছাপুর থেকে চাকরীর জন্য যোগাযোগ বজায় রাখা সম্ভব নয়। স্নেহপ্রবণ সেই

প্রতিবেশীর চেষ্টায় ও এক ভদ্রলোকের অনুগ্রহে থাকার একটা ব্যবস্থা হোল—চীৎপুরের কাছে বিডন ষ্ট্রীট এলাকায় গলির মধ্যে একটা আস্তাবলের ওপর। ঘরটা এত ছোট যে বাবার মত বেঁটে মানুষও লম্বা হয়ে শুতে পারতেন না। তোষকের বদলে মেঝেতে ছেঁড়া মাদুর, শীতে লেপের জায়গায় জোড়াতালি দেওয়া খুবই সস্তাদামের একটা কম্বল, আর বালিশের বদলে টিনের তোরঙ্গ মাথায় দিয়েও হার মানতে চাইলেন না তিনি। অনেক ঘোরাঘুরি করে গুটি-কয়েক টিউশ্যনি জুটলো। এক বাড়ীতে দু'বেলা ছেলেকে পড়ানোর বিনিময়ে একবেলা খাওয়ারও ব্যবস্থা হোল। একদিন অনুভব করলেন মনে যেন ওঁর খানিকটা উৎসাহ আর সাহস ফিরে এসেছে। দুর্জয় সাহসে ভর করে তাঁর মেজভাইকে (সারদা প্রসাদ, আমরা ন'কাকা বলতাম) কলেজে পড়াতে কলকাতায় নিয়ে এলেন নিজের কাছে।

চীৎপুর রোড তখনও পাকা হয়নি—বৃষ্টির জলে আর কাদায় মাখামাখি হয়ে থাকত। সে সময় ফোর্ট উইলিয়াম থেকে তিনটাকা জোড়া হিসাবে পুরোন পরিত্যক্ত ফৌজী বুট বিক্রি হোত। রোদ আর জল-ঝড়ে এ ধরণের জুতোর কতকগুলি বিশেষ সুবিধে থাকায় আর দামও অল্প বলে বাবা ঐ জুতো পরেই সব জায়গায় যেতেন। তখনও কলের জল হয়নি, তাই অতদূর থেকে হেদুয়াতে এসে কুঁজোয় ভর্তি করে খাবার জল নিয়ে যেতেন।

এরপর অবশ্য বাবা একটা ভাল সরকারী চাকরি পেয়ে যান। তিনি ভারত সরকারের পি. ডব্লু. ডি. বিভাগে সহকারী হিসাবরক্ষক হিসাবে যোগদান করেন ১৮৭৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর।* তাঁর চাকুরিস্থল ছিল বিহারের দেওঘর অঞ্চলে বৈদ্যনাথ ধামে।

মেজভাই সারদাপ্রসাদ বি. এ. পাশ করার পর বাবার কাছে আইন পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, বাবা এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েন। ভাইয়ের ইচ্ছা পূরণ করতে পারছেন না বলে অনুশোচনা করতে থাকেন। ভাগ্যক্রমে হঠাৎ রেঙ্গুন প্রবাসী এক বাঙালীর সঙ্গে বাবার আলাপ হয়। তিনি বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি বর্মা† যেতে রাজী আছ? তাহলে আমি সেখানে তোমার একটা চাকরী করে দিতে পারি।' ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে যাওয়া হবে না, অথচ চাকরিটি না নিলে সারদা প্রসাদের আইন পড়ানোর খরচ চালান সম্ভব নয়—তাই কাউকে একরকম না জানিয়েই একশো টাকা মাইনের ঐ চাকরী নিয়ে বাবা বার্মাতে চলে যান।‡ কাজটি ছিল রেঙ্গুনের বৃটিশ বার্মা সেণ্ট্রাল

* এইটি এবং ১৯০৭ সাল পর্যন্ত বাবার পরবর্তী সরকারী চাকরিস্থল এবং তারিখের বিবরণ পাই "History of Services of the Officers of the Engineer and Accounts Establishment", Government of India, Public Works Department—পুস্তকে।

† ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ বৃটিশ শাসকের অধীনে ভারতের একটা প্রদেশ ছিল।

‡ বাবা ১৮৭৫ সালের ১৬ই এপ্রিল বার্মায় চাকরি জীবন শুরু করে দশ বৎসর সেদেশে কাজ করেন।

অফিসের পি. ডব্লু. ডি. বিভাগে। সেখানে থাকাকালে নিজের খাওয়া-পরার মত সামান্য কিছু টাকা রেখে বাকী সব টাকা কলকাতায় সারদা প্রসাদকে এবং ইছাপুরে সতীশচন্দ্রকে পাঠিয়ে দিতেন। সতীশচন্দ্র ছিলেন রুগ্ন প্রকৃতির—লেখাপড়া তাঁর বেশীদূর হয়নি।

পিতার বিবাহ ও রেঙ্গুনের কর্মজীবন

বাবা যখন প্রথম রেঙ্গুনে যান তখন সেখানে বাবাকে নিয়ে মোট পাঁচজন মাত্র বাঙ্গালী ছিলেন। বাবাই তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। অপর চারজন রোজই ভীষণ মদ খেতেন। একদিন তাদের একজন মত্ত অবস্থায় হঠাৎ বাবাকে চিৎ করে ফেলে দিয়ে মদ খাওয়াবার চেষ্টা করে। মদ কিছুতেই ছোঁবেন না—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বাবা অবিচল ছিলেন। তখন ওদেরই মধ্যে অন্য একজনার দয়া হোল। বললেন—'কি করছিস্, ছেলে মানুষটাকে কেন মদ খাওয়াবার চেষ্টা করছিস্ ; ছেড়ে দে।' তারপর থেকে অবশ্য তারা আর বাবাকে জ্বালাতন করেনি।

বাবা রেঙ্গুনে থাকাকালে আমাদের ঠাকুরমা ইহলোক ত্যাগ করেন। বছর খানেক পর কলকাতায় এলে বাবার সঙ্গে চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসতের নিকটবর্তী রাজীবপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের তৃতীয় কন্যা জ্ঞানপ্রভার বিবাহ হয়। সেকালে পাত্রীপক্ষ পাত্রের স্বাস্থ্য, চাকুরিতে মোটামুটি প্রতিষ্ঠা এবং বংশ-পরিচয়ের ওপরেই বেশী নির্ভর করতেন। বাবার সবক'টি গুণই ছিল।

বিবাহের পর বাবা আবার রেঙ্গুনে ফিরে যান। স্ত্রী জ্ঞানপ্রভা ইছাপুরে শ্বশুরবাড়িতে কিছুকাল থাকার পর বাবার কাছে রেঙ্গুনে চলে যান। রেঙ্গুনেই তাঁদের প্রথম সন্তান অনন্ত-র জন্ম হয়।

ইতিমধ্যে কাকা সারদাপ্রসাদ আইন পরীক্ষার ফী-এর টাকা চেয়ে বাবাকে রেঙ্গুনে চিঠি লিখলেন। বাবা পড়লেন মহা মুশকিলে—মাইনের প্রায় সব টাকাটাই দেশে পাঠানোর ফলে আলাদাভাবে একটি টাকাও জমাতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে বিয়ের সময় শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া গরম শাল-খানা পাঠিয়ে দিলেন ভাইয়ের কাছে—বিক্রি করে সে যাতে ফী-র টাকা জোগাড় করে নিতে পারে।

ছোট ভাইয়ের পরীক্ষার ফী-র ব্যাপারে বাবা সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। অনেকেই বড় বড় অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। শুধু একজনার কথাই তিনি শুনেছিলেন—কোনদিন তাঁর কথা তিনি ভোলেন নি। তিনি বলেছিলেনঃ "এভাবে সব টাকা তোমার দেশে পাঠিয়ে দেওয়া কোনমতেই উচিত নয় ভগবতী ; কিছু কিছু জমাও, তা না হলে বিদেশ বিভুঁয়ে কে তোমাকে সাহায্য করবে? আর তাছাড়া শরীরের কথা কি কেউ কখনও বলতে পারে! অসুখ-বিসুখে পড়লে চিকিৎসা করাবে কোত্থেকে?" অবস্থার বিপাকে বাবার চোখ খুলে গেল। বুঝতে পারলেন—নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই তবে তিনি ভাইবোনদের দেখাশুনা করতে পারবেন। সেই থেকে টাকা পয়সা

জমাতে শুরু করলেন। জীবনে সৎ ও মিতব্যয়ী থেকে বেশ ভাল অংকের টাকা সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন। তিনি ভাইদের সকলকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন এবং বোনদেরও সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ দিয়েছেন। মেজদাকে আমেরিকা যাবার টাকা দেওয়া ছাড়াও সেখানে দশ বৎসর মেজদার সমস্ত খরচ বহন করেছেন। এছাড়া অনেক আত্মীয়স্বজনের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া এবং বিবাহের খরচও দিয়েছেন। সাহায্য চেয়ে কাউকে কোনদিন তাঁর কাছে বিমুখ হতে হয়নি।

রেঙ্গুনের প্রবাসী জীবনেই বাবা অ্যাকাউনটেন্সী পরীক্ষায় পাশ করেন। তার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরের গভর্ণমেণ্ট এক্‌জামিনার অফ্‌ রেলওয়ে অ্যাকাউণ্ট-এর পি. ডব্লু. ডি. অফিসে বদলি হয়ে যান। তিনি সাহদারা-সাহারানপুর রেলে কাজ করতেন। বাবা সপরিবারে সাহারানপুরে চলে আসেন এবং সেখানে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ১৮৮৫ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখে। বছর দেড়েক সেখানে কাটাবার পর তাঁকে বিহারের মজঃফরপুরে* বদলি করা হয়। এখানে আমাদের বড় দুই বোন রমাদি ও উমাদির জন্ম হয়।

লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে বাবা ও মা-র দীক্ষাগ্রহণ

মজঃফরপুরে চার বছর থাকার পর বাবা উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে বদলি হয়ে আসেন। সেখানে ১৮৯০ সালের ১৬ই অক্টোবর** থেকে তিনি গভর্ণমেণ্ট একজামিনার অফ্‌ রেলওয়ে অ্যাকাউণ্টস, বেঙ্গল এবং নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে ও তিরহুত রেলওয়ে শাখায় কাজ করেন।

গোরক্ষপুরে বাবার একজন অধস্তন কর্মচারী ছিলেন—নাম অবিনাশ। একবার তিনি কিছুদিনের জন্য ছুটির দরখাস্ত করলেন। এর আগেও কয়েক-বার অবিনাশবাবু একসঙ্গে পাঁচ-সাতদিনের ছুটি নিয়েছিলেন। কাজের সময় মাঝে মাঝে অহেতুক ছুটি নেওয়া বাবা মোটেই পছন্দ করতেন না। এতে রোজকার কাজ রোজ শেষ হয় না। বেশ অসন্তুষ্ট হয়েই অবিনাশবাবুকে বাবা

* মজঃফরপুরে ১৮৮৬ সালের ১০ই অক্টোবর থেকে বাবা তিরহুতের গভর্ণমেণ্ট এক্‌-জামিনার অফ্‌ রেলওয়ে অ্যাকাউণ্টস্‌ অফিসে এবং নলহাটি স্টেট্‌ রেলওয়েতে কাজ করেন।

** সেকেণ্ড গ্রেড অ্যাকাউনটেণ্ট হিসাবে বাবা গোরক্ষপুরে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তারপর অ্যাকাউনটেন্ট ফার্স্ট গ্রেড এবং রেলওয়ে অ্যাকাউনটেণ্ট-এর ডেপুটি এক-জামিনার রূপে তাঁর পদোন্নতি হয়। এরপর ১৮৯৯ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৯০২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বহুবার কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি করে তাঁকে গভর্ণমেণ্ট একজামিনার অফ্‌ রেলওয়ে অ্যাকাউনটস্‌ বেঙ্গল, নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে ও তিরহুত রেলওয়ে অফিসের কর্তৃত্বভার দেওয়া হয়। তাছাড়া ১৯০০ সালের ৯ই এপ্রিল থেকে ৭ই জুলাই পর্যন্ত বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়েতে (হেড-অফিস কলকাতা) তিনি ঐ দায়িত্বভার পালন করেন।

জিজ্ঞাসা করলেন : 'মাঝে মাঝেই দেখছি আপনি একসঙ্গে পাঁচ-সাতদিনের ছুটি নেন। কোথায় যান ?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'কাশীতে গুরুদেবকে দেখতে যাই।'

একটু ব্যাঙ্গের সুরেই বাবা বলেছিলেন, 'ধর্ম করতে যাবেন! আচ্ছা, ধর্ম জিনিষটা কি আমায় বোঝাতে পারেন? ভগবান, ভগবান করেই জাতটা গেল। আরে মশাই, ও নামে কিছু নেই ; ওসবের মধ্যে যাবেন না। তার-চেয়ে জীবনে যদি উন্নতি করতে চান তো কাজ করুন, কাজ করুন—আখেরে কিছু হবে।'

কথাগুলির আড়ালে রূঢ়তার বদলে ভগবানের বিরুদ্ধে তাঁর অভিমানের ফল্গুধারাই বরঞ্চ ছিল। কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু রূঢ়তার জন্য তিনি মনে মনে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। ভাবলেন—কি দরকার ছিল অবিনাশকে কথাগুলি ওভাবে বলার? যে যেভাবে চলতে চায় তাকে সেই রাস্তাতেই চলতে দেওয়া ভালো। মানুষের উচিত শুধু সেই রাস্তার ভালমন্দ দেখিয়ে, বুঝিয়ে দেওয়া। রুক্ষতা দিয়ে সৌন্দর্য প্রকাশ পায় না। ঠিক করলেন—অবিনাশবাবুকে ধীরে-সুস্থে বুঝিয়ে বলবেন।

সেদিন বিকেলবেলা। অবিনাশবাবুর সঙ্গে অফিস-ফেরতা দেখা হয়ে গেল। পাল্‌কিকে ছেড়ে দিয়ে অবিনাশবাবুর সংগে হাঁটতে হাঁটতে ক'ঘণ্টা আগের ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলেন বাবা। সে চেষ্টার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল ঠিকই, কিন্তু যেখানে পেঁাছতে পারলে মনের মানুষ হওয়া যায়, উঁচুপদের গুণে বাবা সেই মুহূর্তে ততখানি সহজ বোধহয় হতে পারেননি। অবিনাশ-বাবু কি বুঝলেন কে জানে, কিন্তু তিনি যে তখন মনে মনে নীরবে তাঁর গুরুদেবকে স্মরণ করছিলেন, সেকথা বাবা আদৌ জানতেন না।
গুরুদেব'কে স্মরণ করছিলেন, সেকথা বাবা আদৌ জানতেন না।

অফিস থেকে বাড়ী ফেরার পথটা ছিল ছায়া সুনিবিড়—দু'পাশের বড় বড় গাছের ডালপালা হেলে পড়ে পরস্পর এমন জড়িয়ে রয়েছে, মনে হয় সমস্ত রাস্তাটি যেন একটি বিরাট পান্থশালা। এখানে এলে অতি বড় অহংবাদীকেও স্বীকার করতে হবে যে প্রকৃতির চেয়ে বড় শিল্পী আর নেই। কথা বলতে বলতে দু'জনে পায়ে হেঁটে এগুচ্ছিলেন। খানিক পরেই ওঁরা উপস্থিত হলেন বিরাট এক মাঠের কাছে। সূর্যের শেষ আবির আলোয় প্রকৃতির বুকে তখন যেন মাদকতা জেগেছে। বুনো ঘাসের মাথার ওপর রংয়ের ঢেউ খেলছে। এমন দৃশ্য এঁরা আগে আর কোনদিন দেখেন নি। দু'জনের প্রাণেও যেন পুলকের স্পর্শ লাগল। দাঁড়িয়ে পড়লেন তাঁরা। অবাক বিস্ময়ে সুন্দরের মায়ায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। মনে মনে ভাবলেন—প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে যদি নিজেদের মিশিয়ে দিতে পারতেন!

প্রকৃতিতে সূর্যাস্তের সেই অপরূপ রংয়ের বাহার দেখতে দেখতে যখন উভয়ে তন্ময় হয়ে গেছেন, তখন হঠাৎ দেখতে পেলেন মাত্র কয়েক গজ দূরেই তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক সৌম্য পুরুষ। তাই দেখে অবিনাশবাবু চিৎকার করে উঠলেন, 'ইনিই লাহিড়ী মহাশয়, আমার গুরুদেব।' তাঁরা উভয়েই

স্পষ্ট শুনতে পেলেন তিনি বলছেন, 'ভগবতী, তুমি তোমার অধস্তন কর্মচারীটির উপর বড় নির্দয়!' সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই লাহিড়ী মহাশয় অন্তর্ধান করলেন। দু'জনে ভাল করে চারদিক লক্ষ্য করে দেখলেন—যতদূর দৃষ্টি চলে মাঠ জনশূন্য। কেউ কোথাও নেই। অবিনাশবাবু মাটির ওপর শুয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

বাবা বিস্মিত, বিমূঢ়। হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে অবিনাশবাবুর পিঠে হাত রেখে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, 'অবিনাশ, তোমাকে আমি নিশ্চয়ই ছুটি দেব, আর আমিও যাব তোমার সঙ্গে কাশীতে। তুমি আমাকে তোমার গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাবে তো? যিনি ইচ্ছে করলেই ভক্তকে সাহায্য করতে যেখানে খুশী উপস্থিত হতে পারেন, তিনি শুধু তোমারই গুরুদেব নন্ অবিনাশ—তিনি মহাগুরু, বিশ্বগুরু। তাঁর কাছেই আমি এবং আমার স্ত্রী দীক্ষা নেবো—সাধনপথে পাড়ি চাইব।' অবিনাশবাবু তো আনন্দে আত্মহারা।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সস্ত্রীক বাবাকে নিয়ে তিনি রওনা হলেন কাশীর পথে। মা তখন সন্তান সম্ভবা—তাঁর চতুর্থ সন্তানের (মেজদা) আগমন প্রতীক্ষায় দিন গুণছিলেন। কাশীতে লাহিড়ী মহাশয় একটি নির্জন নিরিবিলি গলিতে বাস করতেন। পরদিন সকালে ওঁরা যখন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে পেঁছিলেন, দেখলেন বৈঠকখানায় তিনি পদ্মাসনে বসে। মাটিতে মাথা স্পর্শ করে সকলে একসঙ্গে প্রণাম করলেন।

অর্ধনিমিলিত চোখ মেলে লাহিড়ী মহাশয় তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে দু'দিন আগে মাঠের ধারে শোনা সেই একই কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ভগবতী, তুমি তোমার অধস্তন কর্মচারীটির উপর বড় নির্দয়'। বাবা অন্তরের অন্তস্তল থেকে যেন কেঁপে উঠলেন। লজ্জায় মাথা নিচু করে নিলেন তিনি। জীবনে এমনভাবে কেউ কখনো তাঁকে তিরস্কার করেনি।

একটু থেমে যোগীরাজ আবার বললেন—"তবে আজ কিন্তু আমার বড় আনন্দ হয়েছে। তুমি শুধু অবিনাশকেই আমার কাছে আসার জন্য ছুটি দাওনি, নিজেও সস্ত্রীক এসেছ দীক্ষা নিতে।" আবার চমকালেন বাবা সেই অন্তর্যামীর কথায়।

'ক্রিয়াযোগে' দীক্ষা নেবার পর বাবা আর অবিনাশবাবু হলেন গুরুভাই—অন্তরঙ্গ বন্ধু। যতদিন বেঁচে ছিলেন একজন আরেকজনকে ভোলেন নি।

লাহিড়ী মহাশয় মেজদার জন্মের ব্যাপারেও খুব আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। মাকে দীক্ষা দিয়ে বলেছিলেন, 'দেখ গো মেয়ে, তোমার গর্ভে ভগবানের আশীর্বাদে এমন একজন মহাপুরুষের জন্ম হচ্ছে, যিনি তাঁর সমস্ত জীবন ধরে মানুষকে ঈশ্বর লাভের পথ দেখাবেন। সেই পথে বহু মানুষ এ পৃথিবীর মায়া-মমতার খোলস ছেড়ে মুক্তির পথ খুঁজে পাবে। তোমরা তো রেলগাড়ি চড়েই এসেছ। নিশ্চয়ই দেখেছো, কামরাগুলির আগে একটি ইঞ্জিন রয়েছে। তোমার এ ছেলে ঠিক এমনি করেই সাধারণ মানুষকে উঁচু মার্গের পথে

টেনে নিয়ে যাবে।"* লাহিড়ী মহাশয়ের ভবিষ্যৎ বাণী মিথ্যা হয়নি। মেজদার জীবনই তার সাক্ষী। তাইতো দেখি মেজদা তাঁর মহাগুরুর জীবনের সংগে সংযুক্ত হয়েছিলেন।

পারিবারিক দেবতা

দীক্ষা নেবার পর মা আমাদের ইছাপুরের বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য এসেছিলেন। একদিন রাতে স্বপ্ন দেখলেন ঠাকুর-ঘরে 'মা চণ্ডী' রয়েছেন। তিনি পূজা পাচ্ছেন না। খুবই অদ্ভুত স্বপ্ন কেননা আমাদের নতুন বাড়ীর চিলে কোঠার ঠাকুর ঘরে বংশের আরাধ্য নারায়ণ শিলা† স্থাপিত ছিল এবং নিত্য পূজারও ব্যবস্থা ছিল!

সঙ্গে সঙ্গে মা'র ঘুম ভেঙ্গে গেল। একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন নিয়ে তাড়াতাড়ি ঠাকুর ঘরে গিয়ে দেখেন উত্তরের দেয়ালে একটা ফাটল দেখা দিয়েছে। আর সেই ফাটলের মাঝখান দিয়ে মা চণ্ডীর মুখটুকু বেরিয়ে রয়েছে। অভাবনীয় এই পাওয়ার আনন্দ ও উত্তেজনায় মা তখন কাঁপছিলেন। কোনরকমে ঘরের দরজা ভেজিয়ে রেখে বাবাকে ডেকে এনে সব দেখালেন। তারপর দু'জনে মিলে একসঙ্গে ফাটলের ভেতর থেকে অষ্টধাতু দিয়ে গড়া সেই মূর্তিকে বার করেন এবং পরদিন প্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠান করে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের কুলোপুরোহিত অনুকূল ঠাকুরদা'কে দিয়ে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করা হয়। অনেকদিন পর্য্যন্ত মা চণ্ডীর এই মূর্তিটি অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে ইছাপুরেই ছিল এবং পূজা করা হতো।

আমাদের আসল পৈতৃক বাড়ীতে শোবার ঘর ছিল মাত্র দু'খানা। খুব অসুবিধা হত, কারণ তখন এই বাড়ীতে ছোটকাকা ও কাকীমারাও থাকতেন

* বোধহয় এই ঘটনার কথা বলতে গিয়েই পরমহংসজীর মা তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমার জন্মের অল্পকাল আগে তিনি (লাহিড়ী মহাশয়) আমাকে বলেছিলেন যে তুমি তাঁরই পথ অনুসরণ করবে।' শিশুবয়সে পরমহংসজীকে আশীর্বাদ করার সময় লাহিড়ী মহাশয় ঐ একই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'Autobiography of a Yogi' তে লিখিত পরমহংসজীর মায়ের উক্তিটি স্মর্তব্যঃ তুমি যখন আমার কোলে ছোট্ট শিশু তখনই তোমার ভবিষ্যৎ বিধিনির্দিষ্ট কর্মধারার কথা জানতে পারি। আমি সে সময় তোমাকে নিয়ে বেনারসে গুরুগৃহে গিয়েছিলাম।...আমার গুরুদেব তোমায় কোলে বসিয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষাদানের মত তোমার কপালে হাত রেখে বল্লেন 'মা জননি, তোমার ছেলে একজন যোগী হবে, আর আধ্যাত্মিক ইঞ্জিনের মত এ বহু লোককে ভগবানের রাজ্যে টেনে নিয়ে যাবে।' (প্রকাশকের মন্তব্য)

† বিশ্বব্রহ্মান্ডের রক্ষক ও পালক ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অপর একটি নাম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সৃজন, পালন ও ধ্বংসের অধিকর্তা এই ত্রিমূর্তির অন্যতম হলেন বিষ্ণু। ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়েই শিব নতুনের আগমনের পথ রচনা করেন। হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরের অষ্টোত্তর শতনাম দেওয়া আছে। তাঁরা সেই একমেবাদ্বিতীয়মেরই বিভিন্ন রূপের প্রকাশ। সৃষ্টিরূপিণী মা ভগবতীর এইরূপ একটি নাম শ্রীশ্রীচণ্ডী। (প্রকাশকের মন্তব্য)

আর থাকতেন আমাদের দুই পিসিমা। তাই মায়ের ইচ্ছামত এরই পশ্চিম-দিকের জমিতে নতুন দোতলা বাড়ীটি তৈরী করা হয়েছিল। বাবারই তত্ত্বাবধানে বাড়ীটি তৈরী হয়।

পুরাণো বাড়ীর উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা পুকুর ছিল আমাদের। বাবা তাকে আরও গভীর এবং বড় করে কাটালেন। সেই মাটি দিয়ে নতুন বাড়ীর ভিত উঁচু করা হয়। খুব অল্পদিনের মধ্যেই বাড়ীটি তৈরী হয়ে গেল। মা নিজের পছন্দমত ঠাকুরঘরের পরিকল্পনা করেছিলেন আর তাকে সাজিয়েও ছিলেন মনের মত করে। ইছাপুরে বেড়াতে যেতে আমাদের খুবই ভাল লাগত। ঘুরে শুয়ে শুয়ে গাছের ছায়ায় ঢাকা পুকুরে আলো-আঁধারির খেলা, আর বাতাসের সঙ্গে তার ছোট ছোট ঢেউগুলির দোলা দেখতে কি যে সুন্দর লাগতো!

ইছাপুর গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকের জমিতে কোনদিনই কোন জমিদারের কর্তৃত্ব ছিল না। আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনে অনেকেরই বেশ হিংসা হয়েছিল। হঠাৎ দেখা গেল, বাবার নামে অচেনা অজানা এক জমিদারের পক্ষ থেকে আদালতের সমনজারী হয়েছে। আমরা না কি বেআইনি ভাবে তার জমি ভোগ-দখল করছি। শেষ পর্য্যন্ত জমিদার বাবুটি আদালতে কোন নথিপত্তর হাজির করে তাঁর দাবী প্রমাণ করতে পারেন নি, বরঞ্চ অযথা হয়রানির দোষে আদালতের সামনে বাবার কাছে নিঃসর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে অব্যাহতি পেয়েছিলেন।

১৯১৮ সালে ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি সম্প্রসারণ করার সময় বৃটিশ সরকার বাবার জমিটি কিনে নেন। ক্ষতিপূরণের সব টাকা বাবা তাঁর ছোট ভাই এবং বোনের মধ্যে ভাগ করে দেন—নিজের বলতে কিছুই নেন নি। সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে রেল লাইনের পূবধারে এক টুকুরো জমি কিনে একটি আটচালা তৈরী করে সেখানে নারায়ণের সঙ্গে মা চণ্ডীর নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেন।*

কুলোপুরোহিত অনুকূল ঠাকুরদা ইতিমধ্যে দেহত্যাগ করায় তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের থাকার জন্যও বাবা একখানা কুঁড়ে বানিয়ে দেন। তিনি তাঁদেরকে আমাদের পারিবারিক দেবমন্দিরে নিত্য পূজার জন্য একজন পুরোহিতকে নিয়োগ করতে বলেন এবং সেই সঙ্গে পূজার ব্যয় ও সেবার জন্য কিছু মাসোহারারও বন্দোবস্ত করে দেন।

এদিকে কিছুদিন বাদে নতুন পুরোহিত কাউকে কিছু না জানিয়ে আমাদের জমিজমা বিক্রি করে নারায়ণ ও মা চণ্ডীর মূর্তিটিকে নিয়ে কাশী চলে যান। বাবাকে চিঠি লিখে ওর কাশীর ঠিকানায় পূজোর মাসোহারা

* সারদা ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র ডাঃ প্রকাশ ঘোষের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে সারদা ঘোষের দ্বিতীয় পুত্র প্রভাস চন্দ্র ঘোষ এবং খুড়তুতো ভাই যতীন্দ্র ঘোষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই সরানোর কাজ হয়েছিল এবং তাঁরা মন্দির তৈরীর ব্যাপারেও যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। (প্রকাশকের মন্তব্য)

পাঠাতেও বলেন। কীরকম সন্দেহ হওয়াতে বাবা খোঁজখবর করে জানতে পারেন—নতুন পুরোহিত বেশ কিছুদিন ধরে পূজার্চ্চনা বন্ধ করে দিয়েছে এবং পূজার জন্য বাবার পাঠান টাকায় নেশাভাঙ করছে। এমন কি নিজের ছেলে-মেয়ে এবং স্ত্রীর সঙ্গেও সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছে।

বাবা এরকম দুষ্ট প্রকৃতির লোককে উপযুক্ত শাস্তি দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত আত্মীয়-স্বজনদের অনেক অনুরোধে শুধু ক্ষমাভিক্ষা করিয়েই নিষ্কৃতি দেন। এর অল্প কিছুদিন পরেই ঐ পুরোহিত যে বন্ধুটির সংগে বাস করছিলেন, তার কাছ থেকে খবর পাওয়া যায় যে পুরোহিত মারা গেছেন। পরে বাবা আত্মীয়দের সংগে যোগাযোগ করে ভবানীপুর অঞ্চলে অ্যালেনবী রোডে প্রভাসদা'র বাড়ীতে মা চণ্ডীর মূর্তিটি ও নারায়ণ শিলা প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যাপারে বৌদির অর্থাৎ প্রভাসদার স্ত্রী সবচেয়ে খুসী হয়েছিলেন। প্রভাসদা* অবসর নেবার পর অ্যালেনবী রোডের বাসা ছেড়ে শ্রীরামপুরে নিজেদের পৈতৃক বাড়ীতে চলে যান এবং সেখানে ছোট ভাই প্রকাশ ঘোষ ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে ঐ বাড়ীতেই বসবাস করতে থাকেন। বাড়ীর তিনতলার পূজার ঘরে মা চণ্ডী এবং নারায়ণকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। নিয়মিত পূজার জন্য আমরা সকলেই একটা বাৎসরিক খরচ দিয়ে থাকি।

২ গোরক্ষপুরে মেজদার জন্ম ও বাল্যজীবন

মেজদার দিব্য-আশীর্বাদপূত আবির্ভাব

গোরক্ষপুর শহরের একটা ঐতিহাসিক খ্যাতি আছে। বেনারস থেকে উত্তরে একশো মাইল দূরে হলো গোরক্ষপুর শহর। কয়েকশো বছর আগে গোরক্ষনাথ* নামে এক পরম ঈশ্বরভক্ত সেখানে বাস করতেন। তিনি যেখানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, সেই পুরাতন মন্দির এখনো বর্তমান! সেখানে আজও ধুনি জ্বলে। দূর-দূরান্ত থেকে বহু ভক্ত শিষ্য সেই ধুনি ভস্মের তিলক নিয়ে যান। সম্প্রতি পুরাতন মন্দিরের পাশে ভক্ত শিষ্যরা বহু অর্থ ব্যয়ে তাঁর নামে উৎসর্গ করে বিরাট এক মন্দির স্থাপন করেছেন। সেখানেও গোরক্ষনাথের ধুনি ভস্মতিলক সকলে পান।

মহাসাধক যোগীরাজ গোরক্ষনাথের আবির্ভাব হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিল বলা যেতে পারে। আদি শংকরাচার্যের† পর বেশ কিছুকাল পর্যন্ত তাঁর মতো এমন সাধক ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নি! গোরক্ষনাথ ছিলেন দশম-একাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় নেতা। অনেকের মতে তিনি তাঁর গুরুদেব মৎস্যেন্দ্রনাথের চেয়েও প্রথিতযশা ছিলেন।

কথিত আছে গোরক্ষনাথের জন্মের আগে তাঁর মা শিবঠাকুরের মত একটি সন্তান প্রার্থনা করতেন। একদিন ইষ্টদেব তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন—বেলপাতায় লেগে থাকা সব 'বিভূতি' খেয়ে ফেল। এই ঘটনার প্রায় এক বছর পর শিব সাধিকার গর্ভে শিবকল্প গোরক্ষনাথের জন্ম হয়।

দীনদুঃখী বাপ-মায়ের সন্তান গোরক্ষনাথ অল্প বয়সেই বুঝতে পারেন মায়ের দুঃখের কথা। বেশিরভাগ দিনই কাটতো আধপেটা অবস্থায়। দেখতে দেখতে গোরক্ষনাথের বাল্যের বারোটি বছর পার হয়ে গেল। একদিন মায়ের সঙ্গে বসে গোরক্ষনাথও চাপড়া করে মাটিতে ঘুঁটে দিচ্ছিলেন। পরদিন ওগুলো বিক্রি করে খাওয়ার সংস্থান হবে। সেই সময় হেলেপড়া ভাঙ্গা বাঁশের বেড়ার ধারে এসে দাঁড়ালেন জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী।

ধারে এসে দাঁড়ালেন জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী।

তিনি দুঃখিনী মাকে কাছে ডেকে বললেন—'মা, খুব শীঘ্রই তোমার ছেলে সংসার ছেড়ে চলে যাবে। ঐ গোবরস্তূপ নিয়ে খেলায় মত্ত তোমার ছেলে একজন মহাযোগী। এজন্য দুঃখ করো না মা ; ঈশ্বরের এক মহান্ আশীর্বাদ

* গোরক্ষনাথের জীবনী শ্রীশংকর নাথ রায় রচিত 'ভারতের সাধক' গ্রন্থমালা (২য় খণ্ড) অবলম্বনে লিখিত।

† ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তাঁর মধ্যে একাধারে পাণ্ডিত্য ও ঋষিশ্রেষ্ঠের বিরল সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তিনিই সুপ্রাচীন স্বামী সম্প্রদায়কে পুনর্গঠিত করে বর্তমান রূপ দান করেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ তাঁর আবির্ভাব কাল অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বলে মনে করেন।

রয়েছে তোমার উপর। বিশ্বজননীর অংশে তোমার জন্ম। ছেলের গর্বে তুমি গরবিনী হবে মাগো।'

আশ্চর্য্য! পরদিনেই গোরক্ষনাথ ঘর ছেড়ে অজানা পথে যাত্রা শুরু করেন। মায়ের তখনো ঘুম ভাঙ্গেনি। ঘরের মায়া বুঝবার আগেই মায়ামোহ ত্যাগ করতে সব কিছু ছেড়ে চলে যান মায়ের অজ্ঞাতে। তাঁর মা বুঝিতেই পারেন নি সন্ন্যাসীর কথা এত তাড়াতাড়ি অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে।

গোরক্ষনাথ এক নতুন সাধন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। তাঁর ধর্মমতে জাতিবর্ণের বিচার করা হয় না। তিনি বলতেন—তাঁর উপদেশ মেনে চললে যে কোন ভক্তই সাধুসন্ত হতে পারে, জয় করতে পারে জীবন ও মৃত্যুকে। গোরক্ষনাথ যে ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা তাদের বলা হয় 'গোরক্ষপন্থী'। এঁরা এবং এই ধরণের সাধনপন্থা অনুসরণ করেন যে সব সন্ন্যাসী, তাঁদের 'কানকাটা যোগী'* বলা হয়।

গোরক্ষনাথের নাম অনুসারে এই জায়গার নাম হয় গোরক্ষপুর। তাঁরই নাম-মাহাত্ম্যে গোরক্ষপুর আজও ভারতের শ্রেষ্ঠতম পবিত্র তীর্থস্থানগুলির মধ্যে অন্যতম বলে বিবেচিত হয়।

এই গোরক্ষপুরেই মেজদার জন্ম। মিঁয়া বাজারে নাখাসি ক্রসিংয়ের কাছে, কোতোয়ালি রোডে, কোতোয়ালির পাশের বাড়ীতেই আমরা থাকতুম।

কোতোয়ালি আর আমাদের বাড়ীর মাঝখান থেকে, ঠিক বিপরীত দিকে, বাঁ কোণে একটা বড় পাতকুয়া ছিল। পুলিশ লাইনের লোক ছাড়াও আমরা এবং আসপাশের অনেকেই সেই জল ব্যবহার করতাম। বাড়ীর সামনে একটা মাঠ ছিল। সেটা ছিল আমাদের খেলাধুলার জায়গা।

এই গোরক্ষপুরের বাড়ীর দোতলায় কোতোয়ালীর দিকের ঘরটিতে মেজদা ১৮৯৩ সালের ৫ই জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। ঘরটি বরাবর আঁতুড় ঘর হিসাবেই ব্যবহৃত হতো। ঐ একই ঘরে, মেজদার জন্মের পাঁচবছর পরে ১৮৯৮ সালের ১৩ই মার্চ আমার জন্ম হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের নামানুসারে মেজদার নাম রাখা হয় মুকুন্দ। আর মহর্ষি গোরক্ষনাথের নাম অনুসারে মা-বাবা আমার নাম রেখেছিলেন গোরক্ষনাথ। তবে বড়রা সবাই আমাকে 'গোরা' বলেই ডাকতেন।

মেজদার জন্মের সময় যারা আঁতুড়ঘরে উপস্থিত ছিলেন, তাদের কাছে পরে শুনেছি যে প্রসবের সময় মা খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। মা সেই সময় লাহিড়ী মহাশয়কে স্মরণ করতেই ঘরটি জ্যোতিতে ভরে যায় এবং তার মাঝে লাহিড়ী মহাশয়ের দিব্যরূপ দেখতে পান। এর অল্পক্ষণ পরেই মায়ের যন্ত্রণার অবসান হয়। সেই দিব্য জ্যোতি মেজদার জন্মাবার সময় পর্য্যন্ত ঘরটিকে আলোকিত করে রেখেছিল।

* এঁদের দক্ষিণ কর্ণ ভেদ করে একটা পিতলের দুল পরানো হয়। এটা ঐ সম্প্রদায়ের প্রতীক।

শৈশবে মেজদার ঈশ্বরভক্তি

মেজদার শিশু বয়স থেকেই বাড়ীর বড়রা লক্ষ্য করতে থাকেন, যেন নির্জন নিরিবিলি জায়গাই সে বেশি পছন্দ করে। আমরা দেখতাম—মেজদা দিনে দিনে কেমন যেন আলাদা প্রকৃতির হয়ে উঠছেন। সময় ও সুযোগ পেলেই নিরিবিলি জায়গায় যোগাসনে বসে চোখ বন্ধ করে থাকেন। কখনও কখনও অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বলেন।

আমাদের ঠাকুর ঘরে সুদৃশ্য বাঁধাই করা লাহিড়ী মহাশয়ের একটি প্রতিকৃতির সামনে মা রোজ পূজা করতেন এবং ফুল, চন্দন, সুগন্ধি, কর্পূর নিবেদন করে আরতি করতেন। এই পূজার সময় মেজদা প্রায়ই তাঁর পাশে গিয়ে বসে থাকতেন।

এখানে রবিবার বা ছুটির দিনে আমরা সকলে বাবা-মায়ের সংগে গোরক্ষ-নাথের মন্দিরে পূজো দিতে যেতাম। এমনি এক রবিবারে বাড়ীতে কীসের যেন উৎসব ছিল—ঠিক মনে করতে পারছি না। উৎসব উপলক্ষ্যে চেনাজানা অনেকেই এসেছেন, মেয়েদেরও অনেকে মাকে সাহায্য করছিলেন—তবুও খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে বেশ রাত হয়ে গেল। তারপর একে একে সকলে যখন বিদায় নিচ্ছিলেন তখন মায়ের হঠাৎ খেয়াল হল, মেজদাকে অনেকক্ষণ দেখা যায়নি। বাড়ীর মধ্যে, আশেপাশে খোঁজাখুঁজি করেও মেজদাকে পাওয়া গেল না। মা মেজদার প্রকৃতি বুঝতে পেরেছিলেন বলে বাবাকে বললেন—'প্রতি রবিবারেই তো আমরা গোরক্ষনাথের মন্দিরে পূজা দিতে যাই। আজ যাওয়া হয়নি। সে আবার সেখানে গিয়ে বসে নেই তো?'

বাবার সংগে কয়েকজন গেলেন গোরক্ষনাথজীর মন্দিরে। মায়ের কথাই ঠিক; মেজদা মন্দিরে বসে আছেন চুপচাপ ধ্যানমগ্ন তপস্বীর মত। বাড়ীতে উৎসবের আনন্দে সকলে যখন ব্যস্ত, মেজদা সেই অবসরে প্রায় এক কিলো-মিটারেরও বেশি পথ হেঁটে চলে এসেছেন মন্দিরে।

কে যেন চেঁচিয়ে মেজদার নাম ধরে ডাকতে যাচ্ছিলেন। বাবা তাকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিলেন। সকলেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। অনেকেই বেশ বিরক্ত- এ আবার কী রকম আদর, যত্তো সব আদিখ্যেতা। এমন দুর্বিনীত ছেলেকে এখনই না শাসন করলে পরে যে কি করবে, কে জানে!

যাকে নিয়ে এত আলোচনা, ভাবনা—তার কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। রাত বাড়ছে; বাড়ি ফেরার তাড়ায় কেউ কেউ উসখুস করছেন। মেজদা এক সময় চোখ খুলে চাইলেন—সামনে অত লোক দেখে একটু হকচকিয়েও গেলেন। তারপর চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারেন তিনি কোথায়, আর এঁরাই বা কেন এসেছেন। একটু হেঁসে বাবার দিকে চেয়ে অপরাধীর মত মাথা নিচু করে নিলেন।

গম্ভীর মুখে বাবা ডাকলেন মেজদাকে, "বাড়ী চল, রাত হয়েছে। তোমার জন্য এঁরা চিন্তিত ছিলেন।" এরপর বাড়ী ফিরে শুতে শুতে রাত প্রায় শেষ।

মেজদার আধ্যাত্মিক কাজকর্মে মা যতরকমে পারতেন, সাহায্য করতেন। মেজদার জন্যে প্রায় দেড় ফুট লম্বা নিখুঁত একটা কালী প্রতিমা স্বহস্তে তৈরী করেছিলেন। মেজদা তাকে জলচৌকির ওপর বসিয়ে রোজ পুজো করতেন, ধ্যানে বসতেন। পুজার সময় একটা গেরুয়া রংয়ের পর্দা টাঙিয়ে নিজেকে বাড়ীর সকলের কাছ থেকে আড়াল করতেন। পুজোর ব্যবস্থাও ছিল অদ্ভুত ; মেজদা, সেজদি আর আমার জন্য সকাল-সন্ধ্যায় যে দুধ, সন্দেশ আর ফলের বরাদ্দ ছিল—তাই দিয়ে মেজদা মা কালীর নৈবেদ্য সাজাতেন। পরদার বাইরে থেকে সেজদি আর আমি ওর কাণ্ডকারখানা দেখতাম। তারপর পুজো শেষ হলে তিনজনে একসঙ্গে বসে সেই প্রসাদ খেতাম। সেদিনের সেই তৃপ্তি আর আনন্দ কাউকে আজ বলে বোঝান যাবে না।

শ্যামাপুজা হিন্দুদের এক অতীব পবিত্র উৎসব। কোথাও কোথাও রীতি ও নিয়ম মত এদিনে বলিদানের ব্যবস্থা থাকে। ভক্তরা আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী কেউ মোষ, আবার কেউ পাঁঠা বা ছাগ বলি দেয়। যারা প্রাণীহত্যার বিরোধী, তারা ফল বলি দেয়। এই বলি দেওয়ার রীতি নিয়ে অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা করেছেন—তর্কবিতর্কও হয়েছে প্রচুর। যে যুক্তিটি আমার কাছে আত্মিক ও গ্রাহ্যনীয় বলে মনে হয়, তা হল—আমাদের মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষের মনে কোন না কোন পশুপ্রবৃত্তি সব সময়েই কাজ করে চলেছে। আর বলিদান হলো, এই প্রবৃত্তিকে মন থেকে সমূলে উচ্ছেদ করারই এক প্রতীকি রূপ। আর এটি এসেছে সেই পরীক্ষিত সত্য থেকে যা বলে—কোন মানুষ যদি ঐকান্তিকভাবে কোন চিন্তা করে বা কিছুর কামনা করে, তাহলে সেটি অবশ্যই সফল হবে।

প্রতি বছর কালীপুজার অনুষ্ঠানটি মেজদা বেশ আড়ম্বর করেই করতেন। পশুবলির পরিবর্তে শশা বলি দিতেন। মা কালীর কাছে প্রার্থনা করতেন : 'মাগো, আমাদের সকলকে নিষ্কলুষ করো, সমস্ত কু-প্রবৃত্তির বিনাশ করো....।'

একটি সোনালী মাছের মৃত্যু

এখানে আমাদের পাশের বাড়ীতে একজন বাঙালী ভদ্রমহিলা থাকতেন। আমরা অর্থাৎ ভাইবোনেরা, সবাই তাঁকে মাসিমা বলে ডাকতুম। তিনি আমাদের খুব ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন। আমরা সময় নেই অসময় নেই তাঁর বাড়ী গিয়ে জিনিষপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতাম—জ্বালাতনও করতাম। কতদিন কত কিছু হাত লেগে ভেঙ্গে যেত, নষ্ট হত। মাসিমা কিন্তু কিছু মনে করতেন না। শাসনের পদ্ধতি ছিল অদ্ভুত। কিছু ভাঙ্গলে বলতেন—'এই যা! ভেঙ্গে গেল, নষ্ট হয়ে গেল তো? এবার কি নিয়ে খেলবে? এমনি করে বীরত্ব দেখাতে নেই।' দামী জিনিষ কিছু ভাঙ্গলে আমরা ভয়ে চার-পাঁচদিন আর সেখানে যেতাম না। মায়ের মনে বোধ করি সন্দেহ হতো। মাসিমাকে জিজ্ঞাসা

করলে তিনি বলতেন, "কি যে আপনি বলেন দিদি, ওদের মত শান্ত ছেলেমেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি। ওদের সম্বন্ধে এসব বলে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না।"

তবু কেন জানি না আমাদের সকলের মনে সন্দেহ হতো তিনি মেজদাকেই বেশী ভালবাসেন। একবার তিনি মেজদাকে একটা লাল রংয়ের সোনালী মাছ দিয়েছিলেন—মেজদা সেটিকে আমাদের বাড়ীর চৌবাচ্চায় ছেড়ে দিলেন। বাড়ীর কাজের লোকেরা সেই চৌবাচ্চার জল দিয়ে ঘরদোর ধোয়ামোছা আর বাসন মাজার কাজ চালাত। মেজদার ভয় ছিল—ওরা জল তুলতে গিয়ে মাছটিকে না মেরে ফেলে। তাই বারবার গিয়ে দেখে আসতেন, বেঁচে আছে কি না। চৌবাচ্চা জুড়ে ওর খেলা দেখে খুব আনন্দ পেতেন। মাঝে মাঝে বড়দা আর বড়দিও চৌবাচ্চায় মাছের খেলা দেখতেন। সকলের যেন কেমন মায়া পড়ে গেল মাছটার ওপর।

একদিন ভোরে কি এক দুঃস্বপ্ন দেখে বড়দির ঘুম গেল ভেঙ্গে। আমাদের বাঙালীদের মধ্যে অনেকদিন থেকে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে: দুঃস্বপ্নের কথা যদি জলের কাছে দাঁড়িয়ে মনে মনে বলা যায় তবে সেটি আর ঘটে না। স্বপ্ন দেখে বড়দির মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বাড়ীর আর কেউ তখনো বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। পা টিপে টিপে বড়দি চৌবাচ্চার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। জলের দিকে চেয়ে স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে সোনালী মাছটির কথা মনে হতে লক্ষ্য করতে গিয়ে দেখেন—কৈ মাছটি তো নেই। ভুল দেখছেন না তো। ঘুম চোখে উঠে এসেছেন, তাই চোখ দুটো হাত দিয়ে ভাল করে কচলে নিলেন। কিন্তু না, সে নেই। ভাবলেন—চৌবাচ্চার গা বয়ে উঠে কোথাও পড়ে নেই তো! ভাল করে চারদিক তাকিয়ে অবশেষে দেখতে পেলেন, সোনালী মাছটি একটু দূরেই পড়ে আছে—মরে গেছে।

চেঁচিয়ে ডাকলেন মাকে—'মা, মা, মুকোর মাছ কে যেন মেরে ফেলেছে!'

বড়দির চেঁচামিচিতে বাড়ীর সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমরা সকলে নীচে নেমে এলাম। বাবা—ঝি, চাকর, বামুন—সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। অনেক জেরার পর নীতু বলে চাকর স্বীকার করে বলল—'জল তোলার সময় বুঝতে পারিনি যে মাছটিও জলের সঙ্গে উঠে এসেছে। সেই জল উঠোনে ঢালতে গিয়ে জলের চাপে মাছটি মরে গিয়েছে। ভয়ে সেকথা গোপন করেছি। মাছটিকেও আর তুলে আনি নি।'

এই সব হৈ-হট্টোগোলের ভেতর মেজদা যে কখন এসে দাঁড়িয়েছেন কেউই তা লক্ষ্য করেনি। দুচোখে তাঁর জল; নীতুকে দুহাতে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'তুমি আমার সোনালীকে কেন মেরে ফেলেছ? কেন?' মা, বাবা, দিদি, দাদা—সকলে বোঝানর চেষ্টা করলেন ওঁকে; তবু মেজদার সেই এক কথা—"কেন ওকে মেরে ফেললে? মাছ বলে বুঝি ওর প্রাণ নেই।" বলে নীতুর দিকে চেয়ে রইলেন কটি মুহূর্ত; তারপর একে একে সকলকে একবার দেখে কাঁদতে কাঁদতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

ছাতে যাবার দরজার কাছে বড় সিঁড়িটাতে বসে দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে অঝোরে কাঁদছিলেন মেজদা। মাঝে মাঝে তাঁর ফোঁপানো কান্নার শব্দ আমরা দোতলা থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। ওঁর মনের অবস্থার কথা ভেবে বাবা সকলকেই বারণ করেছিলেন তার কাছে যেতে। অফিসে যাবার আগে নীতুকে ডেকে মেজদাকে শুনিয়ে যেন জোরে জোরে বললেন—'এই নাও তোমার টাকা, আজ থেকেই তোমার ছুটি। তোমার মত খেয়ালী লোকের আমার প্রয়োজন নেই—যাও।' এতেও কিন্তু মেজদার মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। তিনি হাপুস নয়নে কেঁদেই চললেন। এদিকে বেলা বহে যায়। হাত মুখ ধোয়া, স্নান-খাওয়া কিছুই করলেন না মেজদা। বড়দাকে স্কুলে পাঠিয়ে বড়দি একবার সন্তর্পণে দেখে এলেন মেজদা কি করছে।

বেলা গড়িয়ে চলে—তবু মেজদার অভিমান বা রাগ কমে না। মা কাছে যাননি ; জানতেন তাহলে কান্না আরও বাড়বে। মায়ের দুশ্চিন্তা ক্রমশঃই বাড়ছিল। সূর্যের রোদ ক্রমশঃ পশ্চিমে হেলে পড়ছে। আবার বড়দি গেলেন তাকে বুঝিয়ে খেতে নিয়ে আসার জন্যে।

মেজদা কিন্তু সহজে ধরা দিতে রাজী ছিলেন না। লুকোচুরি খেলতে লাগলেন ; হাঁপিয়ে উঠলেন বড়দি। শেষে সিঁড়িটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে মেজদাকে ধরে ফেলে, আদর করে কপালে চুমু দিয়ে বললেন—'শোন্, শোন্ আমার কথা।'

মেজদা শুনবেন না কিছুতেই—খালি বড়দির হাত ছাড়াবার চেষ্টা করেন। বড়দি তখন বললেন—'মুকো, তুমি তো মাকে খুব ভালবাস। এই তোমার ভালবাসা ? যে মাকে ভালবাসে সে কি মাকে এমন করে কষ্ট দেয় ?'

মেজদা জলভরা চোখে তাকিয়ে বললেন, 'কেন, মাকে তো আমি কোন কষ্ট দেই নি।'

সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইলেন বড়দি। বললেন, 'মাকে তুমি কষ্ট দিচ্ছ না, না ?'

—'না'।

—'না। ফের তুমি কিন্তু অন্যায় কথা বলছ। এই যে মাকে এতক্ষণ না খাইয়ে রেখেছ, এটা ? এটা কি মাকে কষ্ট দেওয়া নয় ?'

অবাক চোখে তাকান মেজদা বড়দির দিকে। বড়দিও ওঁকে হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলেন—'চলো শীগ্গির। মাকে খেতে ডাকবে এসো। মা খুব রাগ করেছেন তোমার ওপরে। না খেয়ে শুয়ে রয়েছেন।'

তারপর একরকম জোর করেই কোলে তুলে নিলেন মেজদাকে। বললেন, 'দু হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধর।'

মেজদা শুধু ডান হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরলেন। বড়দি ধমক দেবার সুরে বললেন 'কী হোল ? বললাম দুহাতে ধরতে। দুজনেই পড়ে হাত পা ভাঙ্গবো নাকি একসঙ্গে, অ্যা ?'

মেজদা তবুও দুহাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরছে না দেখে, বড়দি তার হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলেন—এক হাত মুঠো করে আছে। বড়দি জোর

করে সেই মুঠো খুলে দেখতে পেলেন তাতে ধরা আছে একটি পেন্সিল আর এক টুকরো কাগজ। সেই কাগজটিতে মেজদা ইংরাজীতে লিখেছেন—

"my
red fish is die."

মেজদার প্রথম কবিতা!

ভগবানের উদ্দেশ্যে চিঠি

মেজদার ছাত্রজীবন শুরু হয় গোরক্ষপুরে। তিনি সেখানকার সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ স্কুলে ভর্তি হন। পরে এটি একটা কলেজে পরিবর্তিত হয়। বাড়ী থেকে স্কুল আধ মাইলের পথ। বাবা অফিস যাবার পথে পাল্‌কী করে মেজদাকে স্কুলে পেঁাছে দিয়ে যেতেন। আবার ছুটি হলে পাল্‌কীতেই মেজদা ফিরতেন। একজন চাকর গিয়ে নিয়ে আসত।

ঐ সময় মেজদা অদ্ভুত এক কাণ্ড করলেন। বাড়ীতে স্বাভাবিক ভাবেই মা-বাবার নামে অনেক চিঠিপত্র আসতো। বড়দাকেও দু-চারজন বন্ধু মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন। ওঁরা যখন সেই সব চিঠি পড়তেন, মেজদা অনেক সময় তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতেন—কে লিখেছে, কোথা থেকে লিখেছে, কেন লিখেছে। মা-বাবা ওঁর ঔৎসুক্য অনেকক্ষণ ধরে মেটাবার চেষ্টা করতেন ; বড়দা কিন্তু রাগাতেন—বলতেন, 'দেখেছ, আমার কত বন্ধু। কত দূর দেশ থেকে আমাকে তারা চিঠি দেয়। তোমায় কি কেউ চিঠি দেয় ? দূর, তোমার কোন বন্ধুই নেই যে চিঠি দেবে।'

মেজদার অভিমান হোত কেউ ওঁকে চিঠি দেয় না বলে। মুখ গম্ভীর করে এসে মায়ের চিবুক ধরে জিজ্ঞাসা করতেন, 'আচ্ছা মা, বল তো আমাকে কেন কেউ চিঠি লেখে না ?' মা হাসতেন ; বাবাকে শুনিয়ে বলতেন 'শুনছ ছেলের কথা ? ওকে বল কেন কেউ চিঠি লেখে না ওর কাছে!' মায়ের কথা বলার ধরণ দেখে বাবাও হাসতেন আর মাথা চুলকে বলতেন, 'সত্যি, কি ব্যাপার বল তো ? মুকুন্দকে কেউ কেন চিঠি দেয় না!'

মেজদা একবার মায়ের, একবার বাবার মুখের দিকে তাকাতেন। মা বলতেন, 'আর একটু বড় হও, দেখবে তোমাকে কত লোক চিঠি দিচ্ছে। আর তার সবকটি তুমি পড়বার সময়ই পাচ্ছ না। এখন যাও, দিদিদের সঙ্গে খেলা করগে।'

মেজদা ঠিক সন্তুষ্ট হতেন না। ওকে ঠিকমত কেউ বুঝিয়েও দেয় না —মনটা তাই খুব খারাপ হয়ে যেত। ভাবতেন, বড়দা কি ওর চেয়ে বিশেষ আলাদা কেউ নাকি ? সকলে মিছামিছি ওকে খালি ছোট বলে। তাছাড়া, ভগবানও যেন কেমন নিষ্ঠুর। ওতো তাঁর সঙ্গে কত কথা বলে, তবুও কেন তিনি ওকে চিঠি দেন না ? তিনিও কি ওর মনের কথা বুঝতে পারেন না। এমনি অনেক কিছু ভেবে একদিন একটা বড় কাগজে চিঠি লিখলেন ভগবানের কাছে।

শ্রীচরণকমলেষু 'ভগবান',

তুমি কেমন আছ? তোমার কি জ্বর হয়েছে? তোমার সঙ্গে আমি রোজ কত কথা বলি, তোমাকে আমার কাছে চিঠি দিতে বলি। তুমি বোধ হয় আমার কথা ভুলে গেছ। আমার খুব খারাপ লাগে। জান—মা, বাবা আর বড়দার নামে কত চিঠি আসে, আমাকে কেউ দেয় না। তুমি এবার নিশ্চয়ই আমাকে চিঠি দেবে। তাড়াতাড়ি লিখবে। দেখ, আর যেন ভুল না হয়। আর কি লিখব! তুমি আমার প্রণাম নেবে, সবাইকে দেবে। আমি ভালই আছি। বাবা-মা সকলেই ভালো আছেন।

ইতি—

প্রণতঃ

'মুকুন্দ'

এরপর কাগজটি ভাঁজ করে একটি খামে ভরে আঠা দিয়ে মুখ বন্ধ করে ঠিকানা লিখলেন—শ্রী ভগবান, স্বর্গ। খামটি ডাক বাক্সেও ফেললেন।

দশদিন কেটে গেল। ভগবানের কাছ থেকে কোন চিঠি এল না। মেজদা চঞ্চল হয়ে উঠলেন—ভাবলেন, ভগবান চিঠি পেয়েছেন তো? বাড়ীতে ডাকপিওন এলেই ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন ওঁর নামে কোন চিঠি আছে কি না। পিওন মেজদার কাণ্ড দেখে হেসে বলেন, 'না খোকন সাহেব, আসে নি। এলে কাউকে দেব না, তোমার হাতেই দেব। তবে আমাকে কিন্তু বখ্‌শিস দিতে হবে।'

আরও কটি দিন চলে গেল—কিন্তু মেজদার চিঠির জবাব এল না। ওতো জানে না যে ডাকঘরের লোকেরা সেই চিঠিটাকে পাগলের কাণ্ড ভেবে ছিঁড়ে ফেলেছে। রাগ হয় ওঁর ভগবানের ওপর: 'পৃথিবী চালানো কি এমন হাতি-খোড়া কাজ যে আমাকে দু-চারটে কথার চিঠি লেখারও সময় হয় না। ঠিক্ আছে; আমিও তোমাকে আর চিঠি দেব না। নিজে কোন উত্তর দেবেন না, আমি খালি খালি লিখব, না?' তবু কিন্তু মেজদা আপন মনে ভগবানের সঙ্গে কথা বলতেন: 'আচ্ছা, তুমি এতো নিষ্ঠুর কেন বলতো? তোমার সঙ্গে আমি রোজ কত কথা বলি, সেদিন একটা চিঠিও ডাকে পাঠালুম, তবু তুমি কেন আমার কথার উত্তর দাও না, চিঠিও লেখ না....'

এমনি করে চলছিল তাঁর দিনগুলি। একদিন রাতে হঠাৎ মেজদা দেখলেন, আমাদের শোবার ঘরটি আলোয় আলো হয়ে উঠেছে। ভগবান সেই আলোয় ওঁর চিঠির উত্তর দিয়েছেন! এরপর কেমন এক শিহরণে ওঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে আর আনন্দ ধরে না। ঘুম থেকে মাকে তুলে বললেন সব কথা। মেজদাকে বুকে টেনে নিয়ে মা বললেন, 'আমি জানতুম মুকুন্দ! তোমার মত ভক্তের কাছ থেকে তিনি বেশি দিন দূরে সরে থাকতে পারেন না। তোমার চিঠির উত্তর একদিন আসবেই।'

বিধির বিধানে রোষীর শাস্তি

রোজ ভোরবেলায় পালোয়ানেরা কুস্তির মহড়া শেষ করে পাতকুয়ার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁতন করত। একদিন কেন জানি না, ওদের একজনার সঙ্গে এক ফেরিওয়ালার বচসা শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ পালোয়ানটি এক ঝটকায় ফেরিওয়ালাটিকে মাটিতে চিৎ করে ফেলে দিয়ে, বুকে চড়ে বসে এলোপাথারী রুদ্দা, চড় কিল মারতে থাকে। ঘটনাটি এতো আকস্মিক যে ফেরিওয়ালাও বুঝতে পারেনি সামান্য বচসার পরিণতি এতদূর গড়াতে পারে। আকস্মিকতার ঘোর কেটে গেলে বাঁচার তাগিদে ও পরিত্রাহি চীৎকার শুরু করে দেয়। আমাদের সঙ্গে আরো অনেকে এসে জড়ো হয় সেখানে। ফেরিওয়ালার জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে—মুখের কস্ বেয়ে রক্ত পড়ছে। চোখ দুটোও জখম হয়েছে, আর ফুলেও উঠেছে।

পালোয়ানটির সঙ্গীদের কাছ থেকে সব শুনে অনেকেই বললেন—এবার ছেড়ে দাও, অনেক হয়েছে। দেখছ না, ও কাঁদছে আর বলছে আর কখনো এমনটি করবে না।

কিন্তু কে শোনে কার কথা? এতগুলো লোকের অনুরোধকে গুরুত্বই দিল না—মেরেই চলেছে ফেরিওয়ালাকে। কেউ কোন প্রতিবাদও করছে না। ক্রমশঃ ফেরিওয়ালার পা দুটো স্থির হয়ে গেল, হাত দুটো নেতিয়ে পড়ল দু-পাশে। পালোয়ানটিকে যেন খুনের নেশায় ধরেছে। কেউ যে সাহস করে এগিয়ে গিয়ে ছাড়াবে, তাও না। সকলেরই যেন ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে।

হঠাৎ শুনি মেজদা চীৎকার করে কেঁদে বলছেন, 'ভগবান তোমার বিচার করবেন! ভগবান তোমার বিচার করবেন। তোমার গায়ে শক্তি আছে বলে তুমি এই দুর্বল মানুষটাকে এমন করে মারছ। ও যদি মরে যায়, তবে তোমাকে ওর চেয়েও নৃশংসভাবে মরতে হবে।'

মজার ব্যাপার হল—কিছুক্ষণ পরে পুলিশ লাইনস্ থেকে তিন চারজন ভোজপুরী পালোয়ান ছুটে এলো। আর কি মার সেই পালোয়ানটাকে। হাতের ছোট রুল দিয়ে দমাদম্ বাড়ি। ব্যাপার দেখে ওর সঙ্গী পালোয়ানরা অনেকেই পালালো। ধরাও পড়ল বেশ কয়েকজন। তারপর পুলিশই ফেরিওয়ালাকে একটা পাল্কী করে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

বিচারে পালোয়ানটির কি শাস্তি হয়েছিল জানি না; ফেরিওয়ালাটাও বোধ হয় বেঁচে গিয়েছিল। ছয়মাস পরে আবার যখন পালোয়ানটির সঙ্গে দেখা হল, দেখলাম তার দশাসই স্বাস্থ্য কুঁকড়ে গেছে। বাতে সারা শরীর জড়াগত—চলতে ফিরতে পারে না। দয়া করে কেউ সাহায্য করলে তবেই ঘরের বাইরে আস্তে পারে। বেশিরভাগ সময় শুয়েই থাকতে হয়। চারপাশে মাছি ভন্ভন্ করে। ব্যথায় চেঁচায়, কাঁদে। বিড়বিড় করে ঐ ফেরিওয়ালাটার ওপর অত্যাচারের জন্য অনুশোচনা করে। বলে—এ শাস্তির চেয়ে মরণও ভাল ছিল। যদি কোনদিন সেই ফেরিওয়ালাটির সঙ্গে দেখা হয়, তবে পায়ে

ধরে ক্ষমা চেয়ে নেবে। ওকে বলবে, সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে। জানিনা সে সুযোগ ও কোনদিন পেয়েছিল কি না। এসব দেখে বাবা মেজদাকে বলেছিলেন, 'দেখেছ, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারের কী শাস্তি।'

হাকিমের অলৌকিক রোগ-নিরাময়

একটি ঘটনার কথা বলি। ছোটবেলায় ইছাপুরে থাকার সময় মেজদার ভীষণ ম্যালেরিয়া আর জণ্ডিস্ হয়। লিভার বড় হয়ে গিয়ে সে এক ভীষণ অবস্থা। দু একদিন অন্তর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকে। বাধ্য হয়ে আমরা গোরক্ষপুরে বাবার কাছে চলে যাই। এখানে, আমাদের বাড়ীর সামনের দিকের মাঠটা যেখানে শেষ হয়েছিল, তার ডান কোণে ছিল একটা ছোট কুঁড়ে —একজন হাকিম সেখানে থাকতেন। অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় তিনি রোগীকে সুস্থ করে তুলতেন। রোগী বা রোগিনীর নাড়ী ধরে তিনি জানতে পারতেন তার কি রোগ হয়েছে এবং কতদিন ধরে ভুগছে। তাঁর ওষুধ ছিল আশ্চর্যরকমের --সামান্য ছোট একটা কাল্চে রংয়ের গুলি। যার যত কঠিন রোগই হোক্ না কেন, সেই ওষুধ খেলে সেরে যেত। মেজদাও এই হাকিমের ওষুধ খেয়েই ভালো হয়েছিলেন।

গোরক্ষপুরে আমরা আসার অনেক আগেই একটা হাসপাতাল তৈরী হয়েছিল, আর সেটা ছিল হাকিমের কুঁড়ের কাছেই। কিন্তু সেখানে রুগীরা বড় একটা যেত না। সকলে এসে ভীড় করতেন হাকিমের কাছে—তিনি তাদের কাছে না ডাকলেও। কুঁড়ের ভেতর থেকে জানলার ঘুলঘুলি দিয়ে হাত বাড়িয়ে রুগীর নাড়ী পরীক্ষা করে দেখতেন।

হাসপাতাল আছে অথচ রুগী নেই—সে এক অসহ্য, অস্বস্তিকর অবস্থা। ইংরেজ সিভিল সার্জেন পড়লেন মহা মুশ্‌কিলে। শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হয়ে হাকিমকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন—'দেখুন হাকিম সাহেব, এভাবে সমস্ত কঠিন রোগের চিকিৎসা হয় না ; আপনি করবেন না। বিজ্ঞানসম্মত রীতিনীতি মেনে যদি আপনি এসব করতেন, তাহলে আমি কখনও বলতে আসতুম না। মানুষের জীবন নিয়ে এভাবে খেলা করার অধিকার আপনার নেই। মানলুম আপনার গুলি খেয়ে অনেকেই সুস্থ হয়েছে। কিন্তু হলফ্ করে বলতে পারি —এ সাময়িক, ক'দিনের জন্য একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা মাত্র। তাছাড়া, আপনি কি বলতে পারেন, কোনো রোগীর ক্ষেত্রেই আপনি ব্যর্থ হন্‌নি? কে বলতে পারে পুরোনো রোগ আবার আক্রমণ করবে না? সবচেয়ে বড় কথা, সে সময়ে আপনি নাও বেঁচে থাকতে পারেন। রুগীর অভাবে একদিন এই হাসপাতাল নিশ্চয়ই উঠে যাবে। বলুন, তখন তাদের কি উপায় হবে?'

হাকিম সাহেব শুধু বললেন, 'ঈশ্বরের চেয়ে বড় হাকিম আর কেউ আছে নাকি সাহেব?

ঠিক উত্তর দিতে না পেরে ইংরেজ ডাক্তার চেয়ে থাকেন শুধু। অবশেষে

হাকিম বললেন, "ঠিক্ আছে সাহেব ; আমি কথা দিচ্ছি আজ থেকে দিনের বেলায় আর কোন রুগী দেখব না।"

কিন্তু এত করেও রুগী আসার বিরাম নেই। দূর দূরান্ত থেকে পাল্কী চড়ে, গরুর গাড়িতে, কাঁধে চড়ে, পায়ে হেঁটে রাত্রিতেই আসতে থাকল রুগীরা। এক একদিন এমন অবস্থা হোত, ভীড় আমাদের বাড়ীর সামনের জায়গাটুকু উপচে আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ত। রাত ঠিক্ চারটের সময় হাকিমের জানলার ঘুলঘুলি খুলে যেত—একদিনও সময়ের ব্যতিক্রম হোত না। আরও আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই জন্যে যে হাকিমের কোন ঘড়ি ছিল না। তাঁর দক্ষিণাও ছিল অল্প। যাঁরা তাঁর কুঁড়েতে আসতেন তাদের দিতে হোত দশ পনেরো পয়সা। রুগীর বাড়ী গেলে আট আনা।

এমনি করেই দিন চলছিল। একদিন সেই ইংরেজ ডাক্তারেরই একমাত্র ছেলে পড়ল ভীষণ অসুখে। নিজের সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি খাটিয়েও সাহেব কিছুতেই ছেলেকে সুস্থ করতে পারছিলেন না। দিন দিন তার শরীর ক্রমশঃ খারাপ হতেই থাকল। সাহেবের এক প্রিয় পুরোনো বিশ্বাসী খান্সামা ছিল। সে সাহেবের ছেলেকে নিজের ছেলের চেয়েও বেশি স্নেহ করত। বেগতিক অবস্থা দেখে খুব মিনতি করে সাহেবকে বললো, 'সাহেব, অনেক কিছুই তো করলেন। গরিবের একটি অনুরোধ রাখেন তো বলি : আপনি বরং হাকিমকে একবারটি দেখান। দেখুন না তিনি কি বলেন।'

খানসামার অনুরোধ সাহেবের কাছে মনে হল এক বিরাট ঔদ্ধত্য। ভীষণ রেগে গিয়ে তিনি বললেন—'কি বললে ঐ হাতুড়ের কাছে আমি যাব? তোমরা চাকরের জাত, চাকরের মতই থাকবে। কোত্থেকে এত স্পর্ধা হোল মনিবকে উপদেশ দিতে? যত সব নেংটি পরা অশিক্ষিতের দল। এই জন্যেই ইংরেজ তোমাদের দেশ এত সহজে জয় করে নিতে পেরেছে, আর আজও তাদের তাঁবেদার তল্পিদার হয়ে রয়েছ। ঐ হাতুড়ে ডাক্তার আজও তার হাতুড়ে চিকিৎসা করে বেশ দু'পয়সা লোকের গাঁট কেটে রোজকার করে চলেছে। আর তা করছে মজাদার বুদ্ধির ভড়ং দেখিয়ে, লোক ঠকিয়ে।'

খানসামা বুঝতেই পারে না কেন সাহেব রেগে এত গালমন্দ করছে। সে তো ভাল কথাই বলেছে—ছেলেকে হাকিমের কাছে দেখাতে বলার মধ্যে এমন কি অপরাধ হয়েছে?

ইংরাজ ডাক্তার বললেন, 'শোন, তোমায় আমি শেষবারের মত বলে দিচ্ছি, যদি আর কখনও তুমি এরকম বলো, তবে, তোমাকে ছুটি দিয়ে দিতে বাধ্য হব।'

এভাবে আরও দুদিন কেটে যায়। ছেলেটির কষ্ট দেখে আর সহ্য করতে না পেরে খানসামাটি শেষ পর্য্যন্ত সাহেবের পা দুটি জড়িয়ে ধরে বলে, 'আমাকে ছুটি দিয়ে দিন সাহেব। যাকে নিজের ছেলের মতই ভালবাসি, স্নেহ করি, চোখের সামনে তাকে এমন তিলে তিলে শেষ হয়ে যেতে দেখা—সে আমার সহ্য হবে না। আপনি বাপ হতে পারেন, কিন্তু আমিও ওকে কোলেপিঠে মানুষ করেছি। যে বাপ অন্যায় এক জেদের জন্য ছেলের মৃত্যু পর্য্যন্ত দেখতে

পারেন, তাঁর কাছে আমার থাকা আর পোষাবে না সাহেব। আমাকে আপনি ছুটি দিয়ে দিন ; দেশে আমারও ছেলেমেয়ে আছে, আমিও তো বাপ।"

পরের ছেলের প্রতি এমন অকপট ভালবাসার কথা সেই সাহেব কখনো শোনেন নি বা দেখেনও নি। ভাবতেও পারেন নি—কালা আদমীর দেশের লোকের এমন মধুর মন হতে পারে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে এমন নিরুদ্বেগ নিরুত্তাপ প্রতিবাদ প্রতিরোধও গড়ে তুলতে পারে। জীবনে যেন এক নতুন শিক্ষালাভ করলেন। দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। মালিক চাকরের প্রভেদ ভুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন খানসামাকে। ডেকে পাঠালেন হাকিমকে।

একটা ছোট্ট কালচে গুলিতেই সিভিল সার্জেনের ছেলে ভালো হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন আর স্বীকারও করলেন—ঈশ্বরের কাছ থেকেই মানুষ সমস্ত জ্ঞান আহরণ করে থাকে এবং ঐশ্বরিক শক্তি পৃথিবীতে আছে আর চিরদিন থাকবেও।

হাকিম কিন্তু এই বিদ্যা কাউকে শেখান নি—এমনকি ছেলেকেও নয়। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিলেন মানুষ বড়ই অর্থলোভী। তাই ছেলেকে বলেছিলেন—'না, এ বিদ্যা আমি তোমায় শেখাবো না। পয়সার লোভে তুমি রুগীকে মেরে ফেলবে।'

বাক্‌সিদ্ধ মেজদা

একদিন আমাদের মেজো বোন উমাদি বাড়ীর উঠানে নিমগাছের নীচে বসে মেজদাকে পড়াচ্ছিলেন। কয়েকটা টিয়া পাখি গাছে বসে হৈচৈ করে ঝগড়া করছিল। মেজদির পায়ে সেই সময় একটা ফোঁড়া হয়েছিল ; ডাক্তারবাবু তাতে মলম লাগাতে বলেছিলেন। পা মুড়ে বসার জন্যে বোধ হয় যন্ত্রণা হচ্ছিল—তাই মেজদি উঠে গিয়ে মলমের শিশিটা নিয়ে এলেন। ওঁর দেখাদেখি মেজদাও একটু মলম নিজের হাতে লাগালেন। মেজদি রেগে বললেন, 'এটা কি হচ্ছে মুকো? শুধু শুধু মলম লাগাচ্ছ কেন?'

মেজদা বললেন, 'দেখ মেজদি, মনে হচ্ছে আমার হাতের ঠিক এই জায়গায় কাল সকালে একটা ফোঁড়া বেরোবে। এই জন্যেই আগে থেকে একটু মলম লাগিয়ে রাখলুম।'

মেজদি খুব রেগে গিয়ে বললেন, 'মুকো, তুমি শুধু পাজীই নও, মিথ্যুকও।'

মেজদাও রেগে জবাব দিলেন, 'কাল সকাল পর্য্যন্ত না দেখে তুমি শুধু শুধু আমাকে মিথ্যুক বলবে না।'

ব্যাপারটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে মেজদিও মেজদার কথার কোন গুরুত্ব দিলেন না। বরঞ্চ ঐ নিয়ে ছোট ভাইয়ের সংগে খানিকক্ষণ খুনসুটি করলেন। মেজদা কিন্তু আস্তে হলেও বেশ জোর দিয়েই বললেন, "মানুষের কথা এরকম হেলাফেলা কোর না। আমি মন থেকে বলছি—কাল সকালেই

দেখতে পাবে আমার হাতের ঠিক এই জায়গাতে বেশ বড় একটা ফোঁড়া হয়েছে। আর তোমারটাও ফুলে ডবল হয়েছে।"

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই মেজদি দেখেন ওঁর ফোঁড়াটি আরও বড় হয়েছে। মেজদাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে হাত টেনে নিয়ে দেখেন সত্যি তাঁর হাতেও একটা ফোঁড়া হয়েছে। তারপর মার কাছ ছুটে গিয়ে চীৎকার করে বলতে থাকেন—'মা, মা, মুকোটা জাদু শিখেছে।'

সমস্ত কথা শুনে মা মেজদাকে গম্ভীরভাবে বললেন, "মুকুন্দ, কারো কোন ক্ষতি করার জন্য এভাবে নিজের শক্তির অপব্যবহার করতে নেই। তাতে ভালো হয় না।"

এরপর পনেরো দিন ধরে ওষুধ মলমে ফল না হতে মেজদার হাতে অপারেশন করতে হয়। সামান্য একটি কথার শক্তি যে কি ভীষণ হতে পারে মেজদার আমৃত্যু ডান হাতের কাটা দাগটিই তার প্রমাণ।

৩ লাহোরে মেজদা

মা ভগবতীর দেওয়া দুটি ঘুড়ি

গোরক্ষপুর থেকে বাবা বদলী হয়ে এলেন লাহোরে।* গাড়ী থেকে নেমে সকলে যখন বাড়ীটার এঘর-ওঘর, এ বারাণ্ডা ও বারাণ্ডা ঘুরে ভালমন্দ দেখছেন, মেজদা তখন খোঁজ করছেন কোথায় মা কালীর প্রতিমাখানা বেশ সুবিধামত জায়গায় স্থাপন করা যায়। আমিও তাঁর পেছন পেছন ঘুরছি। শেষ পর্যন্ত অনেক ভাবনা-চিন্তা করে দোতলার বারান্দার একধারে প্রতিমাটি স্থাপন করলেন। আড়াল করার জন্যে একটা পর্দাও টাঙালেন। যতদিন আমরা লাহোরে ছিলাম মেজদা এইখানটিতে বসেই রোজ মা কালীর পূজা আরাধনা করতেন।

বড়দি মেজদাকে যেমন ভালবাসতেন তেমনি তাঁর সঙ্গে খুনসুটি করতেন—খেপাতেন, রাগাতেন। পড়াশুনা না করে মেজদা হয়তো কিছু চিন্তা করছেন—বড়দি আস্তে আস্তে মেজদাকে চমকে দেবার জন্য কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জোরে বলে উঠতেন, "এই মুকো. . . !" মেজদা চমকে ফিরে তাকালে বলতেন, 'দাঁড়াও, মাকে বলছি। লেখাপড়ার নাম নেই ওই দিকে চেয়ে থাকা হচ্ছে। উঃ, কি ভাবুক মহারাজ এলেন গো! যেন দুনিয়াসুদ্ধু ভাবনা একা ওঁর মাথায় এসে ভীড় করেছে। বস্ শীগ্গির বই পড়তে, নইলে কান মলে দেবো।" কখনও কখন এইরকম বকাবকির পর কিম্বা এমনিতেই, বড়দি মেজদাকে কাছে টেনে নিয়ে খুব আদর করতেন। আমার কিন্তু একটু রাগ হোত—কই, বড়দি তো আমাকে এমন করে কাছে টেনে আদর করেন না।

মেজদি অর্থাৎ উমাদিও এইরকম মেজদাকে খেপাতেন আবার ভালও-বাসতেন। একদিন সকালবেলা মেজদা দোতলার বারান্দায় কুলুঙ্গির সামনে দাঁড়িয়ে বোধহয় মনে মনে ভাবছিলেন—"এইখানে দাঁড়িয়ে মনপ্রাণ দিয়ে ভগবানের কাছে যদি কোন প্রার্থনা করা হয়, তবে কি তিনি তা পূর্ণ করবেন না?" ঠিক্ এমনি সময় মেজদি এসে মেজদার গালে আদর করে একটু টিপে দিয়ে বললেন, 'কি গো শান্ত ছেলেটি, কোন জলেতে ঢিল ছোঁড়ার মতলব আঁটছ?'

একটুও রাগ না করে মেজদা বললেন, 'দেখ মেজদি, আমি কি ভাবছি জানো?'

"হয়েছে, হয়েছে, আর বলতে হবে না—তুমি ভাবছ আমাকে কি করে আচ্ছা জব্দ করা যায়। তাহলে আমি আর তোমাকে রাগাতে পারব না—তাই না?"

* পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোরে ছিল নর্থ-ওয়েষ্টার্ন রেলের সদর অফিস। বাবা ১৯০২ সালের ২৪শে নভেম্বর থেকে ১৯০৪ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত গভর্ণমেন্ট এক্‌জামিনার অফ্ রেলওয়ে অ্যাকাউন্টস দফতরে ডেপুটি এক্‌জামিনার হিসাবে কাজ করেন।

মেজদা বললেন, 'না, না, তা নয়। আমি ভাবছি, মা কালীর কাছে আমি যাই চাই না কেন, ঠিক পেয়ে যাই।'

আমাদের বাড়ী থেকে একটু দূরে একটা সরু গলি থেকে দুটি ছেলে সেইসময় দুটো ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল। মেজদি ঘুড়ি দুটো দেখিয়ে বেশ ঠাট্টার সুরে বললেন: 'কিন্তু আমি কি চাই বল তো? আমি চাই, মা কালী ঘুড়ি দুটো তোমায় পাইয়ে দিন।'

মেজদা বললেন, 'ওঃ, শুধু এই! আমি ভাবলুম তুমি না জানি বিশেষ কিছু একটা চাইবে। আচ্ছা, তুমিই না আমায় বইয়ে পড়িয়েছ, যে পৃথিবীর সব কিছুই তাঁরই সৃষ্টি। তবে....'

মেজদি, মেজদার কথা শেষ করতে না দিয়ে ওঁকে রাগাবার জন্যেই বলে উঠলেন, 'ঠিক্ আছে, ঠিক্ আছে—তোমার ওসব পাকা পাকা কথা শুনতে আমি এখানে আসিনি।'

মেজদা কোন কথা না বলে ঘুড়ি দুটোর দিকে চেয়ে রইলেন। মনে মনে তিনি মা কালীর কাছে গভীর প্রার্থনা করছিলেন। হঠাৎ ঘুড়ি দুটোতে প্যাঁচ কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। একটির সুতে কেটে যেতে সেটা আমাদের বারান্দার দিকে ভেসে এল। তারপর হঠাৎ কেমন যেন হাওয়ার জোর কমে গেল আর ঘুড়িটাও সামনের বাড়ীর ছাদের মনসা গাছে এমনভাবে জড়িয়ে গেল যে, মেজদা সহজেই হাত বাড়িয়ে সেটি টেনে নিলেন।

মেজদি কিন্তু তবুও খেপানোর চেষ্টা ছাড়লেন না। বললেন: "তুমি কি ভাবছ ঘুড়িটা তোমার প্রার্থনার জোরে পেয়েছ? আমি বলব, না—এটি নেহাৎ তোমার ভাগ্যে ছিল, তাই পেয়েছ।"

মেজদা এবারেও কিছু বললেন না—একভাবে চেয়ে রইলেন উড়ন্ত ঘুড়িটার দিকে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, সেটিও আগেরটির মত উড়ে এসে ঐ একই মনসা গাছে জড়িয়ে গেল। হাতবাড়িয়ে মেজদা ঘুড়িটি ধরে নিলেন। তারপর দুটো ঘুড়িই মেজদিকে উপহার দিলেন। আর উমাদি ত্রস্ত হরিণীর মত ছুটে বাড়ীর ভেতর পালিয়ে বাঁচলেন।

অদম্য ইচ্ছা

আমাদের অল্প বয়সে টিক্কার সিং আর কাল্লু নামে দুজন বিখ্যাত কুস্তিগীর পালোয়ান ছিল। তাদের কুস্তির লড়াই হবে—তাই সেকথা সকলকে জানবার জন্যে রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার মারা আর ঢ্যাড়া পেটানো হলো। সেই লড়াই দেখবার জন্যে মেজদা বাবার কাছে আব্দার করলেন। কুস্তি শেষে দু'দল যে কাণ্ড সাধারণতঃ করে থাকে তা অনেকেই পচ্ছন্দ করতেন না—আমাদের বাবা-মাও নয়। তাই তাঁরা কেউই রাজী হলেন না। এদিকে মেজদাও গোঁ ধরলেন—যাবেনই। শেষ পর্যন্ত ওঁর জেদাজেদিতে মা যদিও বা রাজী হলেন, বাবা এবং বড়দা কিছুতেই সম্মত হলেন না।

কিছুতেই যখন বাবা যেতে দেবেন না, তখন মেজদা একদিন সুযোগ বুঝে বাবার ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে ছিট্‌কিনি তুলে দিলেন দরজায়। কিছুতেই দরজা খোলেন না। ওঁর সেই এক কথা—'আগে বল যেতে দেবে, তবে দরজা খুলব।'

বাবা অফিস যেতে পারেন না—জামা কাপড় সব তো ঐ ঘরেই। বাধ্য হয়ে সব কাজকর্ম বাতিল করতে হলো। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা খাওয়া—নাওয়া বন্ধ করে মেজদা সেই ঘরেই রয়ে গেলেন। কোন ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে। শেষে নিতান্ত বাধ্য হয়ে বাবা রাজী হলেন। দরজা খুলে মেজদা দিগ্বিজয়ীর মত বেরিয়ে এলেন। শরীরে তাঁর কোথাও কোন ক্লান্তির চিহ্ন নেই। গম্ভীরভাবে বাবা ঘরে ঢুকলেন। আমাদের কিন্তু খুব আনন্দ হয়েছিল সেদিন।

আপাত দৃষ্টিতে এই ঘটনাটির মধ্যে অবাধ্যতা প্রকাশ পেলেও, ভবিষ্যতে তিনি যে একজন মহাপুরুষ হবেন—এই তেজস্বীতা ও দৃঢ়সংকল্প তারই সাক্ষ্য বহন করছে।

আমাদের ছোট ভাই ও স্কাইলাইট সংক্রান্ত ঘটনা

লাহোরে দিনেও যেমন, রাতেও তেমনি গরম। গ্রীষ্মকালে তাই বাধ্য হয়ে আমরা দোতলায় গম্বুজের মত ছাদে দড়ির খাটিয়া পেতে শুতুম। এর আগে সন্ধ্যে হলে ছাদে বেশ ভালরকম জল ঢেলে দেওয়া হত। এই কাজে বাড়ীর চাকরদের সঙ্গে মেজদা আর আমিও লেগে পড়তাম।

লাহোরে ছোট ভাই বিষ্ণুর জন্ম হয় ১৯০৩ সালের ২৪শে জুন তারিখে। ছাদে ঘুমিয়ে আছি, এমন সময় মেজদা আমাকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওঠ্ গোরা, ওঠ না। দেখবি চল, আমাদের একটা ভাই হয়েছে।' তাকিয়ে দেখি, অনেকক্ষণ সকাল হয়ে গিয়েছে—আকাশ বেশ পরিষ্কার। ছাদে কেউই নেই।

লাফিয়ে উঠে বসে তাড়াতাড়ি নীচের হলঘরে নেমে এলাম। সেখানে সেজদি নলিনীর সঙ্গে দেখা। দুজনে নাচতে নাচতে গলা মিলিয়ে বলতে শুরু করলাম—আমাদের ভাই হয়েছে, আমাদের ভাই হয়েছে।

হঠাৎ কোথা থেকে বড়দা এসে আমাদের সব আনন্দ মাটি করে দিলেন। প্রসবের পর মা তখনও সুস্থ হন্ নি অথচ আমরা হৈ হট্টগোল করছি। তাই বড়দা দু জনার দুই কান ধরে হলঘরের পাশে ডান দিকের ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিলেন। সেই ভীষণ কানমলার কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

এর কিছুদিন বাদে মা একদিন বিষ্ণুকে কোলে নিয়ে হলঘরে বসে আছেন, আর মেজদা অনবরত কমলালেবু চেয়ে তাঁকে বিরক্ত করছেন। মা যত বলছেন ঝুড়ি থেকে নিয়ে নিতে, কিছুতেই নেবেন না—মাকেই এনে দিতে হবে, তখনই। কোন রকমে কষ্ট করে উঠে গিয়ে মা যেই ঝুড়িতে হাত দিয়েছেন, অম্‌নি স্কাইলাইটের রঙীন কাঁচগুলো মা যেখানে বিষ্ণুকে কোলে

নিয়ে আগে বসেছিলেন, ঠিক্ সেখানেই ভেঙ্গে পড়ল। মেজদার জেদাজেদিতেই মাকে সেখান থেকে উঠতে হয়েছিল, আর সেই কারণেই ওঁরা একটা ভয়ংকর দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

আমি বরাবরই ভীষণ খেয়ালী আর দুরন্ত। না বুঝে কাঁচের ওপর নিজের পায়ের জোর পরীক্ষা করতে গিয়ে এই দুর্বিপাক। বড়দা দৌড়ে ছাদে এসে দেখেন স্কাইলাইটের কাঁচে রক্ত। আমি তখন ভয়ে বলির পাঁঠার মত ছাদের এক কোণে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বুঝতে পারিনি পাটা অনেক-খানা কেটে গেছে এবং একটা বড় কাঁচের টুকরো সেখানে বিঁধে আছে। সেদিনের সেই ঘটনার সাক্ষী হয়ে কাটা দাগটি আজও আমার পায়ে রয়ে গিয়েছে।

৪ আমাদের মাতৃদেবী

তাঁর ভালবাসা, শিল্পকলা ও দানধ্যান

মেজদার ভাষায় বলতে হলে—মাকে আমরা সবাই 'অন্তর রাজ্যের রাণী' বলেই মনে করতাম। তাঁর স্নেহ-ভালবাসার কথা আমরা কোনদিনই ভুলতে পারব না। তিনিই আমাদের মনে ভাল হবার, সৎভাবে বেঁচে থাকার প্রেরণা জুগিয়েছেন। আমরা সব ভাইবোন মায়ের কাছেই প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছি। রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের উপদেশ দিতেন, রীতিনীতি শেখাতেন। তাঁর স্নেহ আর শাসন—দুই একসঙ্গে পাশাপাশি চলত।

মায়ের মধ্যে একটা শিল্পীসত্তা ছিল। আজ বুঝতে পারি কেন মা মেজদার জন্যে সেদিন গোরক্ষপুরে অত যত্ন নিয়ে ঠাকুরঘরে বসে কালীমূর্তি গড়েছিলেন। মূর্তিটি তৈরী করার সময় মা এত নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে, বুঝতেই পারেন নি কখন আমি তাঁর পাশে উপস্থিত হয়েছি। একেবারে কাছে গিয়ে 'মা' বলে ডাকতে তবে তিনি বাস্তব পরিবেশে ফিরে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন, "মুকোকে এই কালী মূর্তিটি গড়ে দিচ্ছি—রোজই বায়না করছে। চুপ করে বসে দেখ, দুষ্টুমি কোরো না।"

কি অপূর্ব সুন্দর সে মূর্তি! আজও চোখ বুজে মনে মনে সে রূপ অনুভব করতে পারি। প্রতিমাটি দেড়ফুট লম্বা, নিখুঁত তার সৌন্দর্য্য—মনে হবে যেন কোন কুমোরের তৈরী। পরে মায়ের হাতে গড়া আরও অনেক দেব-দেবীর মূর্তি দেখেছি। তাদেরকে স্বচ্ছন্দ্যে কৃষ্ণনগরের বিশ্ববিখ্যাত মাটির মূর্তিগুলির পাশে স্থান দেওয়া যেতে পারে।

রান্নাতেও তাঁর দক্ষতা কিছু কম ছিল না। তখনকার দিনে আজকের মত এত মিষ্টির দোকানও ছিল না, বা ময়রাও চোখে পড়ত না। বাড়ীর বৌ-ঝিরাই অবসর মত নিজের হাতে নানা রকম রসালো মুখরোচক খাবার তৈরী করতেন এবং অতিথি পরিজন তাই খেয়ে পরিতৃপ্ত হতেন। এইসব মিষ্টি তৈরী করতে ছাঁচের প্রয়োজন হয়। মাকে দেখেছি, নিজের হাতেই সেইসব ছাঁচ তৈরী করছেন। মায়ের তৈরী সেই ছাঁচের মধ্যে দু-তিনখানা আজও আমার কাছে রয়েছে।

মা বাড়ীতে খাবার তৈরী করতে খুব ভালবাসতেন। মনে আছে, রোজ দুপুর বেলা আহারের পর সামান্য বিশ্রাম করেই নানা ধরণের সুস্বাদু মিষ্টান্ন তৈরী করতে বসে যেতেন। বাজারের খাবার আমাদের খেতে দিতেন না। তাই নানারকমের খাবারের জন্য নানান্ মাটির ছাঁচ তৈরী করেছিলেন। কি মাটি ব্যবহার করতেন জানি না, তবে অনেক ধরণের সন্দেশের ছাঁচ তৈরী করেছিলেন। ঐ ছাঁচগুলো আজ যখন দেখি তখন আশ্চর্য্য হই মায়ের শিল্প বোধে, সৃষ্টি ক্ষমতা দেখে। সেইগুলির কারুকার্য্য দেখলে অবাক্ হতে হয়—বুঝতে পারি কত বড় শিল্পী ছিলেন তিনি। আমার মনে হয় আমার শিল্পীজীবনের প্রেরণা

মায়ের কাছেই পেয়েছিলাম ; তাঁর তৈরী মূর্তি এবং আরও অনেক কিছু দেখে আমি শিল্পী জীবন গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম।

সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষাদান কালে প্রয়োজনবোধে মা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতেও দ্বিধা করতেন না। একবার বড়দিকে বলেছিলেন—সন্তান কামনার আশায় তোমার বাবা এবং আমি বৎসরে একদিন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পালন করে থাকি।

গরমের সময় গোরক্ষপুরে 'লু' বইতে থাকে এবং বেলা যতই বাড়ে 'লু'র উৎপাতও ততই বাড়ে। দিনটি ছিল বোধহয় রবিবার। দুপুরের দিকে বাবা নিজের ঘরে বসে কিছু কাজ করছেন, এমন সময়ে একজন গরীব ব্রাহ্মণ এলেন আমাদের বাড়ীতে। বড়দি ওঁর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলেন, ব্রাহ্মণটি কন্যাদায়গ্রস্ত—কিছু আর্থিক সাহায্য চান। মা বড়দিকে বাবার কাছ থেকে দশটি টাকা চেয়ে আনতে বললেন। তারপর ব্রাহ্মণকে ঘরে বসিয়ে নিজে চলে গেলেন ভাঁড়ার ঘরে দই-য়ের সরবৎ করে আনতে।

বড়দির কাছে ব্যাপারটা শুনে বাবা রেগে গিয়ে মাকে ডাকিয়ে এনে বললেন ঃ 'দশ টাকা কেন ? এক টাকা দিয়েই বিদায় করে দাওগে যাও।' মা সেকথা শোনেন নি। বাবাকে অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত দশ টাকাই দিতে হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে দুটি ঘটনার কথা এখানে বলতে চাই। বেশিরভাগ সময় মায়ের দানধ্যান সংসারের আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই চলত। তবে একবার গরীব দুঃস্থ মানুষদের খাওয়াতে মা, বাবার মাইনের অর্দ্ধেক খরচ করে ফেলেছিলেন। সেদিন বাবা মাকে ডেকে বলেছিলেন ঃ 'তোমার দান ধ্যান একটু সামলে কর, যাতে আমার অস্বস্তি না বাড়ে। লোকে শুনেছি ঋণ করে আয়াস করে, আর তুমি দেখছি ধার করে দানবিলাসিনী হতে চাইছ।"

বাবার এই কথা শুনে খুব আঘাত পেয়েছিলেন মা। তখুনি গাড়ি ডাকিয়ে আনলেন। আমাদের শুধু বললেন, 'আমি এখুনি তোমাদের মামার বাড়ী যাচ্ছি।' মায়ের গলায় এমন একটা সুর ছিল যে কান্নায় আমাদের নিজেদের গলা বুঁজে এল। হঠাৎ সেই সময় কোথা থেকে রাঙা মামা এসে হাজির। বাড়ীর থমথমে আবহাওয়া দেখে কি বুঝলেন তিনি জানি না, তবে বাবার কানে কানে কি যেন বলতে তাঁর গম্ভীর মুখে বিদ্যুতের মত এক ঝলক হাসি দেখা দিয়েই আবার তা মিলিয়ে গেল। তারপর বাবা উঠে গিয়ে মাকে কিছু একটা বললেন। তাতে সেই মুহূর্তে মায়ের ঠোঁটের কোণে যে মধুর হাসি আমরা দেখেছিলাম তার ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মা যাবেন না শুনে আমাদের ভাই-বোনেদের মধ্যে আবার আনন্দ ফিরে এল। গাড়ি ফিরে গেল। এর অল্প দিন পরেই বাবা লাহোরে বদলী হয়ে যান।

সেখানেও একবার ঠিক এমনিই এক ঘটনা ঘটেছিল। একদিন মা, বাবাকে এসে বললেন, "দেখ, নীচে বৈঠকখানায় একটি মেয়ে বসে আছে। বড় বিপদে পড়েছে বেচারী—দশটা টাকা দিতে পার ?" গোরক্ষপুরের সেই ঘটনার পর থেকে বাবা মায়ের দানধ্যান নিয়ে বিশেষ কিছু বলতেন না। কিন্তু সেদিন তিনি বললেন, কেন, দশটাকা কেন ? এক টাকা কি যথেষ্ট নয় ? তুমি ভাল করেই জান আমার

বাল্য, কৈশোর আর যৌবনের দিনগুলি কিভাবে কেটেছে। কি কষ্ট করে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে, প্রায়ই না খাওয়া অবস্থায় স্কুল করেছি—মাত্র একটি টাকার অভাবে আই. এ. পরীক্ষা দিতে পারিনি। সেদিন আমার ভিক্ষের ঝুলিতে কোন দয়ালুই সে টাকাটি দেন নি। তাই বলছি, একটি টাকাই কি যথেষ্ট নয় !'

মা সেই কথা শুনতে শুনতে আবার কেঁদেছিলেন এবং বাবাকে বলেছিলেন : 'সেদিনের সেই একটি টাকার স্মৃতি আজও তোমার মনে কত উৎকণ্ঠা, হতাশা আর নিরাশার কথা মনে করিয়ে দেয়। আসলে মানুষের এমন কিছু ঘটনা থাকে যা ভোলা যায় না কিছুতেই। তুমিও কি মেয়েটিকে দশটি টাকা সাহায্য না দিয়ে, তোমারই মত তার স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করে রাখতে চাও ? ভেবে দেখ—আজ তুমি বড় মাইনের এক বিরাট চাকুরে। তা সত্ত্বেও সেই দুঃস্বপ্ন ভরা দিনগুলির স্মৃতি এখনও মাঝে মাঝে তোমার মনে পড়ে। আজ যদি ও শূণ্য হাতে আশাহত মনে ফিরে যায়, তাহলে ওকি কোনদিন ভুলতে পারবে আজকের কথা ? মানুষের সমাজ থেকে দয়া মায়া স্নেহ ভালবাসা আর সহানুভূতি ক্ষয় হতে হতে শেষে কি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে ?'

বাবা মায়ের এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি—হার স্বীকার করেছিলেন। মানিব্যাগ খুলে দশ টাকার নোট বার করতে করতে বললেন, 'নাঃ, তোমারই জিত। এই নাও, নিজে হাতে দিয়ে এসো—আর শোনো, সঙ্গে আমার আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছার অংশটুকু যেন নিজের থলিতেই পুরে ফেলোনা, দেখো।'—হাসলেন বাবা। মাও হেসে টাকাটি নিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

সপ্রেম অনুশাসন

মা তাঁর ছেলেমেয়েদের কিভাবে শিক্ষা দিতেন সেই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বলব। তখন আমরা লাহোরে থাকি। এক বাঙালী-পরিবার কোন এক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। একটি ছোট মেয়ে আমার পাশে বসে রং-বেরংয়ের তাস নিয়ে খেলছিল। এই ধরণের ছবিওয়ালা রঙীন তাস তখন সিগারেটের প্যাকেটের সংগে একটি করে থাকত। বারবার ঝুঁকে দেখছি আর মতলব করছি, কিভাবে তাসকটি নিয়ে নেওয়া যায়। মা বুঝতে পেরেছিলেন আমার উদ্দেশ্য। কাউকে বুঝতে না দিয়ে শুধু এক পলকে চেয়ে দেখলেন আমার দিকে। আমিও বুঝলাম—ধরা পড়ে গেছি। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাকে সংবৃত করলাম। তবু ভাগ্যের কৃপায় একটি তাস পেয়েও গেলাম। মেয়েটি তাড়াতাড়িতে উঠে যাবার সময় ভুল করে ফেলে গেল একখানি ছবি এবং আমিও সেটিকে সংগে সংগে ভরে নিলাম পকেটে।

বাড়ীতে ফিরে শোবার আগে অন্য পোষাক পরে নিয়েছি। মা নিত্যকার মত বাইরে পরবার কোট প্যাণ্ট ব্রাস করে গুছিয়ে রাখছেন। এমন সময় আমার মনে পড়ে গেল ছবিটার কথা। জানতাম না ছবিটার সন্ধান নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন।

গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, 'মা—'। কিন্তু তখন যা হবার হয়ে গিয়েছে। কিছু না বলে মা পকেট থেকে ছবিটা বার করলেন, কিন্তু বাবা ঘরে ছিলেন বলে তখনি কিছু বললেন না। চোখ বন্ধ করে ঘুমের ভাণ করে বিছানায় শুয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে মা আস্তে আস্তে ডাকলেন—তিনি জানতেন আমি জেগেই আছি। কিন্তু ভয়ে আমি সাড়া দিলাম না।

মা বললেন, "পরের কোন কিছু না বলে নিলে চুরি করা হয়—একথা কি তুমি বইয়ে পড়নি ? ওদের না দেখিয়ে, না বলে, কেন তুমি ছবিটি এনেছ ? কত জায়গায় তো কত কী পড়ে থাকে—তুমি কি সেই সব কুড়িয়ে নেবে ? কোনদিন আর এমনটি করবে না ; মনে থাকবে ?"

চোখ না খুলেই ভয়ে ভয়ে আমি মাথা নাড়লাম। পিঠের শিরদাঁড়া দিয়ে কি যেন একটা বহে গেল। পরদিন সেই মেয়েটির মায়ের কাছে একথালা মিষ্টি আর ছবিটি পাঠিয়ে চিঠি লিখে আমার অপরাধের জন্য মা ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন : "আমার ছেলে খুব অন্যায় করেছে এজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থিনী।"

শ্রীরামপুরে ন'কাকা সারদাপ্রসাদের বাড়ীতে একবার আমরা কিছুদিন ছিলাম। সিঁড়ির সামনে দোতলার ঘরে আমরা থাকতাম। তারই একটু ওপাশে ডানদিকের ঘরে থাকতেন ন'কাকা। ছোট বলে সব ঘরেই ছিল আমার অবাধ গতি। ছোট ছেলে, তাই সব জিনিষ সম্বন্ধেই একটা স্বাভাবিক কৌতূহল ছিল এবং সেজন্য সামনে যা পেতাম তাই ঘাঁটাঘাঁটি করতাম। এমনি করে একদিন একটি শিশি ভেঙ্গে ফেললুম।

ন'কাকা ছিলেন শ্রীরামপুরের একজন নামডাকওয়ালা সরকারী উকিল। ভয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। কিছুক্ষণ পরে ন'কাকা ঘরে ঢুকে কাঁচের টুকরো পড়ে থাকতে দেখে চেঁচামেচি শুরু করলেন।

বাড়ীর অন্যদিকে ছিলেন মা—সোরগোল তাঁরও কানে গেল। আমার খোঁজ পড়ল। এদিকে আমি তো আমাদের ঘরের দরজার আড়ালে ভয়ে লুকিয়ে আছি। মা কিন্তু ঠিক খুঁজে বার করলেন আমাকে। একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভয় পেয়ে এই লুকিয়ে থাকাই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তুমি অন্যায় করেছ। আর ঠিক ঐ জন্যেই এখন কিছু বলছি না, কিন্তু ভবিষ্যতে কোনদিন যেন এমনটি না হয়, বুঝেছ ?"

তাঁর সেই কথাগুলি গভীরভাবে অন্তরে ঢুকে গিয়েছিল। শিশিটা ভাঙ্গা নিশ্চয়ই অন্যায় কাজ হয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও বড় অন্যায়—দোষ করে দোষ স্বীকার না করা। মা যদি সেদিন আমায় দু-চার ঘা মার দিতেন তাহলে কিন্তু ঘটনাটি আজ আমার মনে থাকত না।

মায়ের মৃত্যু

মেজদার যখন এগার বছর বয়স সেই সময় বাবা লাহোর থেকে বেরিলীতে* বদলী হয়ে যান। বড়দা অর্থাৎ অনন্তদার বিবাহের ব্যাপারে কোলকাতা যাবার পথে আমাদের দিল্লীতে থামতে হয়েছিল। বাবা আর মেজদা দিল্লী থেকেই বেরিলী রওনা হয়ে গেলেন। দিল্লীতে মেজ মামীমা তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্টেশনে এসেছিলেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে। তাঁর বড় ছেলে জ্ঞানদা আমাদের বড়দার সমবয়সী। সে কিছুতেই ছাড়বে না—আমাদের সংগে কোলকাতা আসবেই, কারণ শহরটা তার দেখা হয়নি।

কোলকাতায় পেঁছেই বিয়ের প্রস্তুতির কাজ বিরাট ভাবে শুরু হয়ে গেল। নানা জায়গা থেকে আত্মীয় স্বজনরা আসতে আরম্ভ করলেন। বর্তমানে যেখানে হিন্দু অ্যাকাডেমী স্কুল, সেই ৫০ নং আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের বাড়ীটি ভাড়া নেওয়া হলো। তখন অবশ্য সেখানে স্কুল ছিল না। বাড়ীটার ফটক দিয়ে ঢোকবার মুখেই মা যেন কেমন অমঙ্গলের গন্ধ পেলেন, বলে উঠলেন—বাড়ীটা যেন খেতে আসছে। অবশ্য যারা বিবাহ উৎসবের আয়োজন করছে তাদের কথা ভেবে তিনি আর কিছু বললেন না। চতুর্দোলা, রং-বেরংয়ের আলো, কাগজের বড় বড় হাতি, উট, ইংরেজী, স্কটিশ বাজনার সঙ্গে দেশী বাজিয়ে দলও ঠিক করা হলো।

ন' মাসিমাকে নিয়ে মা গেলেন কনের বাড়ী। তিনি বরাবর কলকাতা-বাসী—আধুনিকতায় খুবই রপ্ত। নিজের গহনাগুলি মাসিমাকে পরিয়ে মা নিজে পরলেন কালো পাড় একখানা সাধারণ তাঁতের শাড়ি। মায়ের গায়ে কোন গহনাও ছিল না। খুব স্বাভাবিক ভাবেই কনের বাড়ীর লোকেরা ন'মাসিমাকেই ছেলের মা ভেবে বেশি আদর যত্ন করলেন। পরে অবশ্য ভুল ভাঙলে তাঁরা খুবই লজ্জিত হয়েছিলেন। তাঁরা ভাবতেই পারেন নি—সাধারণ, নম্র, স্বল্পভাষিণী মহিলাটিই ছেলের মা।

পরদিন বড়দা আর জ্ঞানদা বিয়ের বাজার করতে বেরিয়েছিলেন। ফিরে যখন এলেন তখন জ্ঞানদা মারাত্মক ভাবে অসুস্থ। ফিটন থেকে কোন রকমে কোলপাঁজা করে জ্ঞানদাকে ওপরে নিয়ে যাওয়া হলো। মা নিজেই তার সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলেন। কিন্তু সব কিছু করেও জ্ঞানদাকে বাঁচানো গেল না—মারাত্মক এশিয়াটিক কলেরায় প্রাণত্যাগ করলেন।

সারাক্ষণ জ্ঞানদা'র কাছে থাকার ফলে মা'ও কলেরায় আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বড়দা বাবাকে জরুরী তার পাঠালেন। সেই রাতেই, বড়দার টেলিগ্রাম বেরিলীতে পেঁছবার আগেই, মেজদা স্বপ্নে দেখলেন মা যেন তাঁকে

* বাবা উত্তর প্রদেশের বেরিলীতে রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন রেলওয়ের গভর্ণমেন্ট সুপারিনটেণ্ডেন্ট অফ্ অ্যাকাউনট্স, এসটাব্লিসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-এ ডেপুটি একজামিনার হিসাবে সরকারীভাবে কর্মভার গ্রহণ করেন ২৬শে এপ্রিল, ১৯০৪ সালে। আর ঐ একই তারিখে আমাদের পরমপ্রিয় মাতৃদেবীরও জীবনাবসান হয়।

বলছেন—"মুকুন্দ ওঠো, তোমার বাবাকে জাগাও। আমাকে যদি জীবিত দেখতে চাও তো এক্ষুণি রওনা হও। আমার শরীর খুব খারাপ।" স্বপ্নের মধ্যেই মেজদা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যেতে বাবা মেজদাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনলেন, কিন্তু তিনি সেই স্বপ্নকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। বললেন ঃ 'স্বপ্ন তোমার মনের চিন্তার প্রতিফলন মাত্র। তোমার মা ভালই আছেন।'

মানসিক যন্ত্রণায়, ক্ষোভে রাগে ঐটুকু বয়সেই মেজদা বাবাকে বলেছিলেন, 'আমার ঐ স্বপ্ন যদি মিথ্যে না হয়, তবে কোনদিনই আমি আপনাকে ক্ষমা করতে পারবো না।"

পরদিন সকালেই বড়দার টেলিগ্রাম এসে পেঁছিল বেরিলীতে—"মা ভীষণ অসুস্থ। বিয়ে স্থগিত। এক্ষুণি রওনা হোন্।" এক জামা কাপড়ে কলকাতায় রওনা হলেন বাবা মেজদাকে নিয়ে। ওঁর স্বপ্নের সঙ্গে টেলিগ্রামের অদ্ভুত মিল দেখে বাবাও বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন।

মাকে কিন্তু ওঁরা শেষ সময়ে দেখতে পাননি। কলকাতায় পেঁছবার আগেই মা মারা গিয়েছিলেন। আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে পেঁছেই মেজদা যেন কেমন হয়ে গেলেন। "মা, মা—ওমা, আমরা এসে গেছি" বলেই আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন কোন ঘরে মা শুয়ে আছেন।

যাঁরা কাছাকাছি ছিলেন সকলেই কেঁদে উঠলেন। 'আমি আনব। মাকে আমি ফিরিয়ে আনবই। —তোমরা দেখো, মাকে আমি ফিরিয়ে আনবই।' উন্মাদের মত এই কথা বলতে বলতে মেজদা ছুটে রাস্তার দিকে যেতে চাইলেন। বড়দা তাঁকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে আটকে রাখলেন। 'না, না—আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও' বলে চীৎকার করতে করতে একসময় মেজদা নেতিয়ে পড়লেন।

বাবা কিন্তু কাউকে কিছু বললেন না—শুধু একভাবে মেজদার দিকে চেয়ে থেকে এক সময় চলে গেলেন। মায়ের আকস্মিক মৃত্যু এবং মেজদার সেই সম্বন্ধে পূর্বজ্ঞান তাঁকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।

মা দেহত্যাগ করেন ১৯০৪ সালের ২৬শে এপ্রিল মঙ্গলবার। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের যে ক্ষতি হলো, তা অপূরণীয়। তিনি ছিলেন আমাদের সবথেকে প্রিয় ও আদরের সঙ্গী। আমাদের শিশুবয়সে তাঁর স্নেহভরা, শান্ত সুন্দর চোখদুটি ছিল আমাদের সকল যন্ত্রণার একমাত্র মুক্তিদাতা। আর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরেও দেখেছি, অনেক আত্মীয় তাঁর নামে চোখের জল ফেলছেন। মায়ের যে রূপ দেখেছি, যেটুকু স্মৃতি এখনও স্মরণে আসে তাতে তাঁকে একজন জ্ঞানবতী, পুণ্যবতী, করুণাময়ী নারী বললে অত্যুক্তি করা হবে না। যখনই আমরা ইছাপুর গেছি, দেখেছি আগে তিনি আমাদের স্বল্পবিত্ত আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করেছেন। সাধ্য অনুযায়ী প্রয়োজনে সকলকে সাহায্য করেছেন। এ ব্যাপারে নিজেকে অদ্ভুত ভাবে প্রস্তুত রাখতেন তিনি। আজও বুঝিনা কেমন করে তিনি আগে থাকতেই অনুমান করতে পারতেন কার কি দরকার, কার দুঃখ কতটুকু।

মেজদার জন্য এক শুভ সংবাদ

মায়ের মৃত্যুর চৌদ্দ মাস পরে বড়দা, মেজদাকে একটা ছোট বাক্‌স দিয়েছিলেন। মেজদার জন্য মা যা বলে গিয়েছিলেন সেটি একটি কাগজে লিখে বড়দা সেই বাক্‌সতে রেখেছিলেন। মায়ের আদেশ ছিল কাগজ সমেত সেই বাক্‌সটা যেন এক বছরের মধ্যেই মেজদাকে দেওয়া হয়। কিন্তু অনন্তদার ভয় হয়েছিল—মায়ের সব কথা জানতে পারলে মেজদা হিমালয়ে চলে যাবেন। সেজন্য নিজের কাছে বাক্‌সটা রেখে দিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব জগত সম্বন্ধে মেজদার ধারণা বদলে যাবে এবং সংসার ত্যাগের কথা আর চিন্তা করবেন না। কিন্তু কলকাতাতেই আবার বড়দার বিয়ের আয়োজন হওয়াতে বড়দাকে কলকাতায় চলে যেতে হয়, আর সেইজন্যই যাবার আগে মেজদাকে মায়ের শেষ বাণী ও বাকসটি দিয়ে যেতে বাধ্য হন্। মায়ের শেষ সময়ে আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে বড়দাই সবচেয়ে কাছে ছিলেন। তাই মা ঐ গোপন সংবাদটি মেজদাকে দেবার ভার বড়দার ওপরই দিয়ে যান।

মা বলেছিলেন—

"মুকুন্দ, এ কথাগুলিই তোমায় আমার শেষ আশীর্বাদ। তুমি যেদিন আমার কোলজুড়ে এলে, তার বেশ কিছুদিন আগে আমি জানতে পারি ভবিষ্যৎ জীবনে তুমি কী হতে চলেছ। আমার গুরুদেব যোগীরাজ লাহিড়ী মহাশয় তোমাকে তাঁর কোলে বসিয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষাদানের ভঙ্গিতে তোমার কপালে হাত ছুঁইয়ে বলেছিলেন—'মা, তোমার এ ছেলে যোগী হবে। রেলগাড়ির ইঞ্জিনের মত মানুষকে ভগবানের নির্দেশিত পথে টেনে নিয়ে যাবে।'

"এরপর বাবা, একদিন রমা আর আমি তোমাকে বিছানায় নিশ্চলভাবে বসে থাকতে দেখি। তোমার শিশু মুখ ঐশ্বরিক প্রভায় প্রভাময়। শুনতে পেলাম, তাঁর সন্ধানে হিমালয় যাবার প্রতিজ্ঞায় তোমার দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

"বুঝতে অসুবিধা হলো না—পার্থিব স্নেহ, প্রেম, মায়া, কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত তুমি। এছাড়াও আমার জীবনের এক অসাধারণ ঘটনা এই বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করেছিল। সেই ঘটনার কথা তোমাকে বলে যাব বলেই আজ আমার এই শেষ বার্তা।

"লাহোরে সেই সাধুদর্শন আমার বিশ্বাসকে আরও জোরদার করেছিল। আমরা সবাই তখন লাহোরেই থাকি। একদিন সকালবেলায় একজন চাকর হন্তদন্ত হয়ে আমার ঘরে ঢুকে বলল ঃ

"মা, একজন সাধু এসেছেন ; বলছেন, মুকুন্দর মায়ের সংগে দেখা করব। আপনি কি যাবেন ?"

"সাধারণ এই কটি কথায় কিন্তু মনে হল যেন মনের সবকটি বীণার তার একসুরে বেজে উঠল। সাধুটিকে প্রণাম করতে আমার সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। বুঝতে পারলুম আমার সামনে দাঁড়িয়ে এক সিদ্ধ মহাপুরুষ।

"তিনি বললেন, 'মা, সিদ্ধজনেরা স্থির করেছেন এই পৃথিবীতে তোমার

আয়ু আর অল্পকাল মাত্র থাকবে। এর পরের অসুখেই তোমার মৃত্যু হবে।' তারপর দু জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলাম। সেই সময় আমি কিন্তু একটুও বিচলিত হই নি, বরঞ্চ অন্তরে একটা বিরাট প্রশান্তি অনুভব করছিলাম। তারপর তিনি আবার কথা বললেন—

"আমি তোমাকে গচ্ছিৎ রাখার জন্য একটা রূপোর কবচ দেব। তবে আজ নয়; আমার কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য কাল যখন তুমি ঠাকুর ঘরে পুজোয় বসবে, তখন আপনা থেকে তা নিজের হাতে পাবে। তোমার মৃত্যুর সময়ে মুকুন্দ তোমার কাছে থাকবে না। বড় ছেলে থাকবে। অনন্তকে বলবে সে যেন কবচটি এক বছর নিজের কাছে রাখে এবং তারপর মুকুন্দকে দিয়ে দেয়। কবচটির উদ্দেশ্য এবং অর্থ মহাপুরুষেরা মুকুন্দকে জানাবেন। পৃথিবীর সব আকর্ষণকে তুচ্ছ করে যখন সে মনে প্রাণে শুধু ভগবানকেই চাইবে তখনই কেবল কবচটি পাবে। তার কাছে কিছুদিন থাকার পর যখন কবচটির উদ্দেশ্য আর প্রয়োজন ফুরোবে, তখন তা আবার হারিয়ে যাবে। তাকে সবসময়ে গোপনীয় জায়গায় রাখলেও সে ঠিক নিজ স্থানে ফিরে যাবে।'

"সাধুটিকে কিছু ভিক্ষা দিতে চাইলাম কিন্তু তিনি তা নিলেন না। আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে তাঁকে প্রণাম করতে তিনি আমায় আশীর্বাদ করলেন। এরপর চোখ চেয়ে দেখি সাধুটি নেই। গেটের বাইরে এসে চারদিক লক্ষ্য করলুম—কোথাও তিনি নেই।

"পরদিন সন্ধ্যাবেলায় জোড়হাত করে ধ্যানে বসেছি এমন সময় সাধুটির কথামত হাতের মুঠোয় ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করলাম। খুলে দেখি একটি রূপোর কবচ। আজ দু বছরের বেশী হলো কবচটি আমার কাছে রয়েছে। এখন তা অনন্তকে দিয়ে গেলাম। আমার জন্য শোক কোরো না; মা জগদম্বা তোমায় রক্ষা করবেন।"

গোল অদ্ভুত ধরণের ঐ কবচটির গায়ে সংস্কৃতে কি যেন লেখা ছিল। যে অদৃশ্য শক্তি মেজদার জীবনকে চালিত করছিল বোধহয় তারই কিছু হদিশ তাতে ছিল। মেজদা সযত্নে সেই কবচ একটা গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখেছিলন। তা সত্বেও সাধুটির কথামত তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে কবচটি অদৃশ্য হয়ে যায়।

আজ বুঝতে পারি মেজদাকে লাহিড়ী মহাশয়ের আশীর্বাদ এবং তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনপথ সম্বন্ধে সেই ভবিষ্যদ্বাণী শুনেই বোধহয় মা সেদিন গোরক্ষপুরে অত যত্ন নিয়ে ঠাকুরঘরে বসে মেজদার জন্যে কালীমূর্তি গড়েছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন যে মেজদার সব রকম আধ্যাত্মিক অনুরাগকে পরিপুষ্ট করে তোলাই তাঁর ভগবৎদত্ত কর্তব্য।

৫ মায়ের মৃত্যু পরবর্তী আমাদের পারিবারিক জীবন

ঝিমা

ঝিমা ছিলেন আমাদের পরিবারের একজন অভিভাবিকার মত। ঠাকুরদাদা দেহত্যাগ করার পর আমাদের পরিবারে আর্থিক কষ্টের সঙ্গে একজন অভিজ্ঞ লোকেরও অভাব দেখা দিয়েছিল। অনেকেই সেদিন বাবা-কাকাদের অবস্থা জানতেন, তবু নিকট আত্মীয়দের মধ্যে কেউই এগিয়ে এলেন না সাহায্য করতে। ব্যতিক্রম শুধু একজন গরীব বিধবা মহিলা—যাঁর ত্রিভুবনে আপন বলতে কেউই নেই। যতদিন বেঁচে ছিলেন তিনি, আমাদের ছেড়ে যান্‌নি। মায়ের স্নেহ, প্রেম, মায়া-মমতা দিয়ে বাবা-কাকাদের যেমনটি বুকে ধরে রেখেছিলেন, মায়ের মৃত্যুর পর আমাদেরও তেমনি সযত্নে প্রতিপালন করেছেন। তাঁর আগমনে সংসারের ভাঙ্গা নৌকার ছেঁড়া পালে আবার যেন হাওয়া লেগেছে।

মাত্র তিন টাকা মাস মাহিনাতে পরিচারিকা হিসাবেই কাজ করতে এসেছিলেন ঝিমা। সংসারের যাবতীয় কাজই তিনি করতেন। বাবাদের ছোটবেলায় সংসারের আর্থিক অনটন দূর করতে তিনি ইছাপুরের বাগানের ফলমূল আর গরুর দুধ বাড়ী বাড়ী ঘুরে বিক্রি করতেন। ঠাকুরদা মারা যেতে সংসারের খরচ চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই জশড়া গ্রামে বাবার মামার বাড়ী থেকে দু মণ চাল আর মাসে নগদ দশ টাকা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। বাবার তখন ঐ চাল আনার জন্যে মুটে ভাড়া দেবার মত অবস্থাও ছিল না। ঐ ঝিমা-ই দফায় দফায় পিঠে করে সেই চাল আর টাকা নিয়ে আসতেন—কিন্তু কোনদিন তার জন্যে অতিরিক্ত মাইনে চান্‌ নি। বাবা সেদিন যে ছ জন লোকের সংসারের সমস্ত খরচ মিটিয়েছেন, ঝিমার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই তা সম্ভবপর হয়েছে।

পরবর্তীকালে মায়ের মৃত্যুর পর সাংসারিক কর্তব্যকর্মের সমস্ত ভার ঝিমার কাঁধে এসে পড়ে। বাড়ীর সব কাজেই তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের স্পর্শ থাকতো। এজন্যই তাঁকে আমরা 'ঝি-মা' বলতাম। মেজদা আর সকলকে ফাঁকি দিতে পারলেও ঝিমাকে এড়াতে পারতেন না। তাঁর আদেশ মত সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরতে বাধ্য হতেন।

এইভাবে অভিভাবিকার মত বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঝিমা দীর্ঘকাল আমাদের পরিবারের সেবা করে এসেছেন। কার্যোপলক্ষে বাবা যখনই যেখানে বদলী হয়েছেন, পরিবারের সঙ্গে ঝিমাও তখন সেখানে গেছেন। তাঁর এই সেবাপরায়ণতার গুণেই তিনি আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিলেন।

ঝিমা আমাদের এই ৪নং গড়পার রোডের বাড়ীতেই দেহত্যাগ করেন। বাবা যখন থেকে উপার্জনক্ষম হন তখন থেকেই ঝিমাকে হাত-খরচ হিসাবে কিছু কিছু টাকা দিতেন। ঝিমার খাওয়া-পরার কিছুই খরচ ছিল না ; তাই সেই টাকার প্রায় সবটাই জমাতে পেরেছিলেন। মৃত্যুর সময়ে তিনি একটা ভাল

অংকের টাকাই রেখে যান। মেজদা স্বাধীনচেতা ছিলেন বলে ঝিমার সঙ্গে প্রায়ই মনোমালিন্য হতো ; তা সত্বেও তিনি মেজদাকে খুবই ভালবাসতেন। মৃত্যুর পর পাওয়া তাঁর এক পত্রে তিনি এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যেন তাঁর জমানো সমস্ত টাকা মুকুন্দকে তার আধ্যাত্মিক কাজে ব্যয়ের জন্য দেওয়া হয়।

বাবার একনিষ্ঠ কর্মজীবন

মা মারা যাবার পর আমরা আবার সবাই বেরিলীতে ফিরে যাই। আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ কেউ বড়দাকে উপদেশ দিয়েছিল—বিয়েতে বাধা পড়েছে বলে যে মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা ঠিক হয়েছিল, তাকে যেন আর বিয়ে না করে। বড়দা কিন্তু বলেছিলেন—যে মেয়েকে মা নিজে দেখে পছন্দ করে গেছেন, তাকে ছাড়া আর কাউকেই সে বিয়ে করবে না। তারপর মায়ের মৃত্যুর জন্য এক বৎসর কালাশৌচ পালন করার পর বিয়ের উদ্দেশ্যে বড়দা, বাবা এবং মেজদার সঙ্গে শ্রীরামপুরে ন'কাকা সারদাপ্রসাদের বাড়ীতে চলে আসেন। আর আমরা অর্থাৎ বাকি ভাইবোনেরা সবাই বেরিলীতে থেকে যাই।

কলকাতায় শ্যামবাজারের মোড়ের কাছেই একটা ভাড়া বাড়ীতে বিয়ে হয়েছিল ; আর বৌভাত হয় শ্রীরামপুরে ন'কাকার বাড়ীতে। বিবাহের সকল অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পর বড়দা বৌদিকে নিয়ে বেরিলীতে চলে আসেন। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে বাবা চট্টগ্রামে বদলী হয়ে যাওয়াতে আমরাও সবাই তাঁর সঙ্গে চট্টগ্রামে চলে যাই। এর দুমাস পরেই বাবা আবার কলকাতায় বদলী হন, এবং তারপর থেকে আমরা সেখানেই স্থায়ীভাবে* বসবাস করতে শুরু করি।

আমরা তখন সবে কলকাতায় বসবাস আরম্ভ করেছি। বাবা একদিন রেলের হিসাব পরীক্ষা করতে গিয়ে অনেক গণ্ডগোল লক্ষ্য করেন। বাবা ঐ বিষয়টি সম্বন্ধে ম্যানেজারকে লিখে জানান এবং মন্তব্য করেন যে নিজেদের অসাবধানতার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর মোটা অংকের টাকা লোকসান দিয়ে চলেছে। বাবার রিপোর্ট নিয়ে অনুসন্ধান করা হয়। বি. এন. রেলের এজেন্ট ও জেনারেল ম্যানেজার বাবার অসাধারণ ক্ষমতা এবং কর্মনিষ্ঠতায় সন্তুষ্ট হয়ে

* অনন্তর ডাইরী থেকে জানা যায় যে ১৯০৬ সালের ৩রা এপ্রিল বেরিলী ত্যাগ করার পর ঘোষ পরিবার ১৯০৬ সালের ৩রা মে চট্টগ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন এবং ঐ বৎসরেরই ২রা জুলাই কলকাতায় ফিরে আসেন। বাবা জুলাই ১৯০৬ থেকে ১৯শে জুন ১৯০৭ সাল পর্যন্ত কলকাতায় বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের, গভর্ণমেন্ট একজামিনার অফ্ রেলওয়ে অ্যাকাউন্টস দফ্তরে কাজ করেন। ঐ সময়ে পি. ডব্লু. ডি বিভাগের অ্যাকাউন্টস্ এস্টাব্লিশমেন্টের অফিসার হিসাবে ভারত সরকারের চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিছুকাল অবসর যাপনের পর অবশ্য তিনি আবার একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে বেঙ্গল-নাগপুর রেলের এজেন্টের ব্যক্তিগত সহকারী হিসাবে কোম্পানীর কলকাতা অফিসে যোগদান করেন এবং ১৯২০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে এগার বছর সেখানে কাজ করেন।

লণ্ডন থেকে রেলওয়ে বোর্ডের নিয়োগপত্র আনিয়ে তাঁকে বি. এন. আর.-এর জেনারেল ম্যানেজারের দ্বিতীয় পি.এর পদে নিযুক্ত করেন।

বাবা ১৯০৭ সালে পেন্‌সন নিয়ে সরকারী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। পরে অবশ্য তিনি আবার একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে বেঙ্গল-নাগপুর রেলে যোগ দেন। রেল অফিসে কাজ করার সাথে সাথে আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ রেলওয়ে অফিসারের সহযোগিতায় বাবা আর্বান* ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা করেন। মধ্যবিত্ত কর্মীরা যাতে তাদের আয়ের অংশ বিশেষ সঞ্চয় করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে রেলওয়ে বোর্ডের পরামর্শমত এই ব্যাংক স্থাপন করা হয়। এই ব্যাংকের যাবতীয় নিয়মকানুন বাবা নিজে রচনা করেছিলেন। সবাই সমানভাবে ব্যাংকের সুযোগসুবিধা ভোগ করতে পারতেন। বাবা এই ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন কিন্তু তার জন্য কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নি।

অফিস আর ব্যাংকের কাজ তিনি সাড়ে এগার বছর একটানা করে গেছেন। এজন্যে কিন্তু এক মুহূর্তের তরেও তাঁকে ক্লান্ত বোধ করতে দেখিনি। তাঁর ধ্যানসাধনা এবং লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে শেখা প্রাণায়াম এ ব্যাপারে তাঁকে অনেক সাহায্য করেছে।

বাবা স্তাবকতাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন এবং সকল প্রশংসাকে এড়িয়ে চলতেন। সরকারীভাবে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন ১৯২০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। সেই সময় রেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে এক সভার আয়োজন করেন। একটা বড় রূপার থালা, গ্লাস এবং রূপোর পাতমোড়া বাঁশের রোলারে চাকরী জীবনের সুখ্যাতি করে এক মানপত্র উপহার হিসাবে দেওয়া হয়। সম্বর্ধনায় মুগ্ধ হলেও এত আয়োজন-অনুষ্ঠান বাবার কাছে অহেতুক বলে মনে হয়েছে। তাঁদের সেই সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি বলেছিলেন: "সত্য, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার সংগে কাজ করতে পেরেছি বলে আমি নিজেকে যথেষ্ট পুরস্কৃত জ্ঞান করছি। তারই জন্য আমি অন্তরে তৃপ্তি পেয়েছি এবং আপনাদেরও শুভেচ্ছালাভ করেছি। কাল থেকে আমি আর আপনাদের মধ্যে থাকব না। কিন্তু কাজ করার মধ্যে যে আনন্দ ও তৃপ্তি আছে, তা থেকে আপনাদের যেন কোনদিন নিজেদেরকে বঞ্চিত করতে না হয়।"

বি. এন. রেলের চাকরী থেকে অবসর নেবার আগে ঐ প্রতিষ্ঠানের এজেণ্ট ও জেনারেল ম্যানেজার একদিন বাবাকে বললেন, 'ভগবতী, তোমার তো অবসর নেবার সময় হয়ে এল। এতে তোমার আয় স্বাভাবিকভাবেই কমে যাবে। তোমার ছেলেকে নিয়ে এস ; আমি তাকে এ্যাসিসটেণ্ট ট্রাফিক সুপারিনটেণ্ডেণ্টের পদে বহাল করে দেব।' শৈশব, কৈশোর আর তরুণ বয়সের অভিজ্ঞতার পর বাবা আর কারুর কাছে অনুগ্রহ নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। গডফ্রে বাবাকে খুব স্নেহ

* বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ আর্বাণ ব্যাংক।

করতেন, ভালও বাসতেন। তাই বাবাকে বেশ কয়েকবার তাঁর প্রস্তাবের কথা মনে করিয়ে দেন। শেষপর্য্যন্ত বাবা মেজদার কাছে চাকরী নেবার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু মেজদা সরাসরি তা নাকচ করে দেন—কারণ তাঁর জীবন আরও উচ্চ কার্যসাধনে নিযুক্ত ছিল। শেষে চাকরীটি আমাদের এক খুড়তুতো ভাইকে দেওয়া হয়। সে আর এক কাহিনী। পরবর্তী কোন অধ্যায়ে তা নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

দেশীয় চিকিৎসা প্রণালীতে বাবার সহজাত জ্ঞান

ছেলেবেলায় একবার আমার খুব জ্বর হয়। সেদিন কোন আত্মীয়স্বজন বেড়াতে আসেনি, আর আমি যে সারাদিন ঘর থেকে বেরোয়নি বা কিছু খাই নি—সেটাও কেউ লক্ষ্য করেনি। বাবা যথারীতি অফিসে চলে গেছেন, এবং যখন ফিরে এসেছেন তখনও পর্য্যন্ত কেউ জানে না যে আমি জ্বরে শয্যাশায়ী।

মাঝরাতে সকলের অলক্ষ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম একটু মুক্ত বাতাস নিতে। ক্লান্ত বোধ হতে কিছুক্ষণ বাদে ঘরে ফিরতে গেছি—পা দুটো দুর্বলতায় এমন কাঁপতে লাগল আর মাথাটাও এমন ঘুরে উঠল যে আমি ঐ খানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। এরপর কি ঘটেছিল এবং কিভাবেই বা বাবা আমার অসুখের খবর জানতে পেরেছিলেন, তার কিছুই জানি না। আমার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার পর তিনি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কি আজ কিছু খেয়েছ?' বললাম: 'না, কেউ আমাকে কিছুই দেয়নি।

তিনি বললেন, 'একদম নড়াচড়া করবে না, আমি এক্ষুণি আসছি।' হঠাৎ নাকে কাগজ পোড়ার গন্ধ যেতে চেয়ে দেখি—তিনি সাগু ফোটাচ্ছেন। তাঁর মধ্যে আবিষ্কার করেছিলাম একজন চিকিৎসকের মনন। অনুভূতি আর বিশ্লেষণ ক্ষমতা—এসব যেন তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। সেই আধসেদ্ধ সাগু খেয়ে মনে হয়েছিল যেন প্রাণ ফিরে পেলুম। শীঘ্রই গাঢ় ঘুমে চোখ বুঁজে এল।

অভাব বলতে তখন আমাদের সংসারে কিছুই ছিল না। অন্য বাড়ীতে এমন অবস্থায় নিশ্চয়ই বড় বড় ডাক্তার ডাকা হোত—একটা হৈ চৈ পড়ে যেত। বাবা কিন্তু শুধু আমার অজ্ঞান হয়ে পড়ার কারণটুকু জেনেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

আর একবার আমাদের সেজ ভগ্নীপতি ডাক্তার পঞ্চানন বসু খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভীষণ জ্বর, সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। শরীরের একটা অংশ যেন ক্রমে অবশ হয়ে আসতে লাগল। কলকাতার নামী বড় বড় ডাক্তাররা রোজই দেখে যাচ্ছেন—কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, আর রোগও সারে না। বাবার সঙ্গে আমিও রোজ যেতুম ওদের বাড়ী। একদিন ঘুরতে ঘুরতে দোতলার বারান্দায় এসেছি—দেখি দু-চারজন ডাক্তার ভগ্নীপতির অসুখ নিয়ে নিজেদের

মধ্যে আলোচনা করছেন। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম ; ছোট বলে আমাকে তাঁরা বিশেষ গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। ও'রা বলছিলেন : 'একটা অমূল্য জীবন এভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে অথচ আমরা কিছুই করতে পারছি না।'

খুব ভয় পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি বাবাকে ও'দের সব কথা বললাম। কি যেন ভাবলেন তিনি। তারপর ডাক্তারদের বললেন, 'আপনাদের কি আর কিছুই তাহলে করবার নেই ? এবারে আমি কি আমার কিছু জানা উপায় কাজে লাগাতে পারি ?' অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে তাঁরা অনুমতি দিলেন। আমরা বাড়ী চলে এলাম। বাবা নিজের ঘরে বসে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে শেখা পাঁচন তৈরী করলেন, আর তাই খেয়ে ভগ্নীপতি কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠেন।

আমার এই ভগ্নীপতি অর্থাৎ ডাক্তার বোস নিজেই কিন্তু একসময় দেশীয় ওষুধপথ্যের নামে অবজ্ঞা প্রকাশ করতেন, এমনকি ঠাট্টাও করতেন। সুস্থ হবার পর দেখেছি তিনি বাবার কাছে সেই পাঁচন তৈরীর পদ্ধতি শিখে অনেক রুগীকে নিরাময় করছেন। এছাড়া আমাশয় রোগেরও একটা পাঁচন তিনি বাবার কাছে শিখেছিলেন যা দিয়ে বহু পুরানো রুগীকেও তিনি সুস্থ করে তোলেন।

আই. এ. পড়ার সময় আমি একবার ভীষণ জ্বরে কাবু হয়ে পড়ি। বুকে মাথায় সর্দি বসে যায়। গলার টনসিলও বড় হয়। সারা শরীরে এত যন্ত্রণা, মনে হতো যেন মাথার চুলগুলিও ব্যথায় টনটন করছে। ডাক্তারকে ডাকা হলো ; তিনি ভ্যাকসিন আর কিছু ওষুধের ব্যবস্থা দিয়ে গেলেন।

বাবা হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মলক্রিয়া ঠিকমতো হচ্ছে তো ?'

বললাম, 'না ; শুধু আম পড়ছে কয়েকদিন ধরে।' 'কেন ? কি খেতে ?'

'গলা ভীষণ ধরে গিয়েছিল ; তাই চায়ের দোকানে অনেক কাপ চা খেতাম আর গরম জলে গারগল্ করতাম।'

বাবা তখন ডাক্তারবাবুকে ডেকে বললেন—"ওসব আর কিছু করতে হবে না। পুরানো ঘি জলে ফেটিয়ে কপালে কাপড়ের ফেটি করে প্রলেপের মত লাগালে, আর মিছরী-মৌরীর সরবত খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সর্দি ওর বসে গেছে। তাছাড়া অতিরিক্ত চা-পানের ফলে পেটগরম হয়েছে। আর এই জন্যেই আমাশয়।" বাবার এই চিকিৎসার সুফল শীঘ্রই পেলাম। এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলাম।

মেজদা রোজ শ্রীযুক্তেশ্বরজীর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। পথে তিনি অসংখ্যবার চা পান করতেন। তাছাড়া তাঁর স্নান-খাওয়ার কোন ধরাবাঁধা সময় ছিল না। এইসব কারণে একবার তাঁর কঠিন পেটের রোগ হয় এবং তারজন্য একবার যন্ত্রণায় তাঁকে দুদিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল। সামান্য নারকেল

তেল জলে ফেটিয়ে মালিশের মত পেটে মাখিয়ে বাবা ওঁকে ভালো করে তুলেছিলেন। আমাদের বাড়ীতে চায়ের প্রচলন ছিল না বললেই চলে। মেজদার অসুখের পর থেকে তা একেবারেই উঠে যায়।

আর একবার আমাদের মেজদি অর্থাৎ উমাদির খুব অসুখ করে। সেকথা শুনে বাবা আর আমি তাঁকে দেখতে যাই। গিয়ে দেখি, মেজদি দুদিন ধরে অজ্ঞান হয়ে আছেন—কোন ডাক্তারই তাঁর জ্ঞান ফেরাতে পারছেন না। বাবা প্রথমেই মেজদির পেটে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে বুঝলেন যে, তাঁর পেট তখনও ফেঁপে রয়েছে। বাবা একবাটি নারকেল তেল আর ঠাণ্ডা জল আনিয়ে, একবার করে ঠাণ্ডা জল ও একবার করে তেল পেটে মালিশ করতে লাগলেন আধঘণ্টা ধরে। এর ফলে মেজদির পেটের বায়ু মুক্ত হওয়ায় তিনি চোখ মেলে চাইলেন। বাবা বুঝিয়ে দিলেন—বায়ু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরার ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে মেজদিকে অজ্ঞান করে দিয়েছে। পেটে এইভাবে তেলজল মালিশ করলে বায়ু বেরিয়ে যায় এবং রোগীর জ্ঞান ফিরে আসে। এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে পরবর্তীকালে আমিও অনেককে সুস্থ করতে সক্ষম হয়েছি।

বাবার নিজের একবার খুব চুলকানি রোগ হয় এবং সর্বাঙ্গ ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। ডাঃ পঞ্চানন বসু—আমার সেজ ভগ্নীপতি—অনেক ওষুধ দিলেন, কিন্তু কিছুই ফল হোল না। তারপর বাবা বিখ্যাত আয়ুর্বেদ চিকিৎসক শীতল কবিরাজের চিকিৎসাধীনে রইলেন। বাবার সঙ্গে আমি কবিরাজের বাড়ী যেতাম এবং ওষুধ ফুরালে আমিই তা আনতে যেতাম। শেষ পর্য্যন্ত কবিরাজ বলেছিলেন—"আসলে রোগটা কিছু নয়; বয়স বাড়ার সঙ্গে শরীরের কোষগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে বলেই ওরকম হয়েছে।" বাবা কিন্তু কবিরাজের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। বাড়ি ফিরে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে শেখা পাঁচন তৈরী করে খেতেই অল্প দিনের ভেতর গায়ের সব চুলকানি আর ফোলা ভাল হয়ে যায়।

স্বাভাবিকভাবেই কবিরাজের কাছ থেকে ওষুধ আনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। একদিন বাবা আর আমি কবিরাজ মশায়ের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছি, দেখি তিনি বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন। বাবাকে চলে বেড়াতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনার অসুখ সেরে গেছে?"

বাবা উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, সেরে গেছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর উনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন: "কি করে সারলো?"

বাবা বললেন: "বেল খেয়ে।"

কবিরাজ মশায় আর কিছু বললেন না। তাঁর নিজের সমস্ত চিকিৎসা ব্যর্থ হয়েছে—বাবার রোগ তিনি সারাতে পারেন নি। তাই বোধহয় এইরকম চিকিৎসা বিষয়ে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ না করার জন্যই তিনি আর কোন প্রশ্ন করেন নি।

বাবার উপদেশ

বাবা 'মোহ মুদ্গর'* থেকে সব শ্লোক মুখস্ত করতে বলতেন। বিশেষ করে নীচের শ্লোকগুলি তিনি সর্বদা আমাদের মনে করিয়ে দিতেন।

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোহয় মতীব বিচিত্রঃ।
কশ্য ত্বং বা কুত আয়াত
স্তত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতাঃ॥

অর্থাৎ কে তোমার স্ত্রী, কেই বা তোমার পুত্র। সংসার অত্যন্ত বিচিত্র। তুমি কে এবং কোথা থেকে এসেছ এই তত্ত্ব চিন্তা কর।

মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বং।

ধনদৌলত, লোকবল বা যৌবনের গর্ব করিবে না, কারণ মহাকাল নিমেষে সবকিছু হরণ করে নেয়।

নলিনী দলগত জল মতি তরলং
তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গাতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।

পদ্মপাতার উপর জলবিন্দুর ন্যায় জীবন ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণিকের সৎসঙ্গ বা সাধুসঙ্গ ভবসাগর পার হইবার একমাত্র উপায়।

বাবার আরও তিনটি অমূল্য উপদেশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) ওয়েষ্ট নট্ ; ওয়াণ্ট নট্

যে কখনও কোন কিছুর অপব্যয় করে না, তাহার জীবনে কখনও অভাব হয় না।

(২) এ ম্যান ইজ্ নোন্ বাই দি কম্প্যানী হি কিপ্স।

মানুষের সঙ্গী দেখিয়াই তাহার প্রকৃতি ও চরিত্র বুঝিতে পারা যায়।

(৩) দেহ রথ, আত্মা রথী
বুদ্ধি তাহে সারথি ;
দশ ইন্দ্রিয় দশ অশ্ব,
রাস-রজ্জু মন॥

প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ মানবদেহকে রথরূপে কল্পনা করেছেন। আত্মার বাস দেহের মধ্যে, তাই আত্মা হলো সেই রথের আরোহী বা রথী। এই রথের

* মোহ অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মাভিমান ; মুদ্গর হলো মুগুর, যষ্টিবিশেষ। স্বামী শংকরাচার্য্য লিখিত এই পুস্তকে জাগতিক মায়ার কথা বলা হয়েছে, যা জন্ম-জন্মান্তর ধরে মানুষকে স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করে থাকে।

অশ্ব দশটি ; আমাদের দশ ইন্দ্রিয় সেই দশটি অশ্ব। এই ইন্দ্রিয়গুলির প্রভাবেই মানুষ বিপথগামী হয়। আবার এই ইন্দ্রিয়গুলিকে আয়ত্তে রাখিয়া দেহ-রথটি কে সুপথে চালনা করিতে পারে? সৎ বুদ্ধিজাত প্রবল মানসিক শক্তির পক্ষেই তাহা সম্ভব। অতএব বুদ্ধি এখানে সারথি। সে মানসিক শক্তিরূপ বল্গার দ্বারা আমাদের দুর্দান্ত ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিয়া তাহাদের সুপথে চালায়।

বাবার প্রশান্ত নির্লিপ্ততা

আটত্রিশ বছর বাবা বিপত্নীক জীবন কাটিয়েছিলেন। তাঁর পুনর্বিবাহের আশায় অনেক ঘটক আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করলেও, তিনি কোনদিন তাদের প্রস্তাবকে বিন্দুমাত্র আমল দেন নি। বড়দার বিয়ে দিয়ে আমাদের হতশ্রী বাড়িতে কিছুটা শান্তশ্রী ফিরিয়ে আনতেই বরঞ্চ তিনি বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন। যে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সাংসারিক সমস্যার সঠিক মূল্যায়ন সেদিন তাঁকে করতে দেখেছি, সেকথা ভাবলে আজও বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে যাই।

অফিস থেকে ফিরে বাবা সোজা নিজের ঘরে চলে যেতেন। তারপর নির্জনে তিনি ধ্যান-সাধনা এবং গুরু লাহিড়ী মহাশয়ের কাছ থেকে শেখা 'ক্রিয়াযোগ প্রাণায়াম' অভ্যাস করতেন। বাবার নিরলস কর্ম এবং অনাড়ম্বর জীবন হয়তো তাঁর শরীরের ক্ষতিসাধন করতে পারে—এইকথা ভেবে মেজদা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। একটুখানি স্বাচ্ছন্দ্য, একটু আরাম, অন্ততঃ রোজকার কাজ থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য তাই তিনি একবার একজন বিদেশিনী নার্স রাখার প্রস্তাব করেছিলেন। বাবা কিন্তু তাতে সম্মত হন্ নি। মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে বাবা বলেছিলেন, "জীবনের এতগুলো বছর যার সেবাযত্নে, মমতায় আদরে নির্ভয়ে কেটেছে, তাকে ভুলে দ্বিতীয় কোন নারীর সাহচর্য্য কি করে নেই বল তো? যে মন্ত্র উচ্চারণ করে দুজনে দুজনকে স্বীকার করে নিয়েছিলাম, তাকে মিথ্যা করি কোন যুক্তিতে? সামান্যতম সেবার জন্যও জীবনে আমার আর কোন নারীর প্রয়োজন নেই।" এই অল্প কটি কথা থেকেই বোঝা যায় কত ভালবাসা দিয়েই না বাবার হৃদয়ে মায়ের আসনখানি পাতা ছিল।

মনে পড়ে, ছোটবেলায় মা আমাদের সব ভাইবোনকে সাজিয়ে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রাখতেন, অফিস-ফেরত বাবাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। এই-ভাবে মা স্বামীর প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। জীবনে উন্নতির পথে বাবা যখন সবে এগোতে শুরু করেছেন, ঠিক সেই সময় মা আমাদের সকলের মায়া কাটিয়ে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। মায়ের এই বিয়োগ ব্যথা বাবার মনে কতটা গভীরভাবে দাগ কেটেছিল তার পরিমাপ করা সম্ভব না হলেও, একথা নিশ্চিত করে বলা যায় মায়ের এই মৃত্যু বাবার আধ্যাত্মিক উন্নতি তরান্বিত করতে সাহায্যই করেছিল।

বাবাকে দেখেছি, প্রয়োজনীয় কাজ তিনি কখনও ভুলতেন না ; নিজেই আমাদের কাজ করে দেবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। মায়ের অভাব তিনি আমাদের বুঝতে দিতেন না। সময়মত আমাদের স্নান করানো, খাওয়ানো, জামা-কাপড় বদলানো, জামা প্যান্টের বোতাম সেলাই করে দেওয়া, ছেঁড়া ছাতা মেরামত করা, এমনকি বই খাতা গুছিয়ে রাখা—সব তিনি করতেন। সত্যি কথা বলতে কি, অনেক সময় আমরা বুঝতেই পারতাম না যে আমাদের মা নেই। মায়ের মতই আমাদের সব প্রয়োজন আগে থেকে বুঝে নিয়ে তা পূর্ণ করতে চেষ্টা করতেন। আমাদের মত শিশুদের প্রতি তাঁর এই সেবাযত্নের কথা ভাবলে এখনও আশ্চর্য্য হয়ে যাই।

বাবার মত লোকের পক্ষে সহজ সরল জীবনযাপন করা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু যে কৃচ্ছতা পালন করে তিনি সঞ্চয়ী হয়েছিলেন, সেই অর্থের প্রতি তাঁর নির্লিপ্ত মনোভাব, আমাদের মত তাঁর আত্মীয়-বন্ধুদেরও অবাক করেছে এবং আজও তা করে।

বাবার অবসর গ্রহণ করার পর লণ্ডন থেকে রেলওয়ে বোর্ডের একজন ডিরেক্টর উইনি সাহেব বেঙ্গল-নাগপুর রেল কোম্পানীর হিসাব পরীক্ষা করতে কলকাতায় আসেন। তিনি কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত রেকর্ডও ভাল করে দেখেন। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে আর্বাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পেছনে বাবার অবদান এবং তাঁর গভীর কর্তব্যপরায়ণতা দেখে তিনি চমৎকৃত হন। রেল কোম্পানীতে সাড়ে এগার বছরের কর্মজীবনে বাবা একদিনও ছুটি নেন নি। এমনকি বড়দার মৃত্যুর দিনও তিনি যথারীতি অফিস করেছেন।

চাকরীতে যদিও বাবার পদ ছিল এজেণ্টের দ্বিতীয় পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টেণ্ট, তবুও কেবল ভারতীয় হওয়ার অপরাধে তিনি তৃতীয় পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টেণ্টের চেয়েও কম বেতন পেতেন। অডিট করে উইনি সাহেব যখন দেখেন যে বাবা আর্বাণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান হয়েও কোন মাহিনা বা ভাতা নেন নি এবং তাঁর কাজের গুণগত মানও কত উঁচু, তখন তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়েতে বোনাস বাবদ যে টাকা বাবার প্রাপ্য ছিল, এবং যা তিনি কোনদিন দাবী করেন নি, সেই টাকা উইনি সাহেব মঞ্জুর করে যান। তখনকার দিনের বিচারে সে টাকার পরিমাণও বিশেষ কম ছিল না—এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। তবুও তাঁর মধ্যে আমরা কোন চাঞ্চল্য দেখিনি। বস্তুতঃ ঐ প্রসঙ্গে তিনি কোনদিন কিছু উল্লেখও করেন নি।

আমাদের ছোট ভাই বিষ্ণু অনেকদিন পরে ব্যাংকের হিসাব থেকে এই টাকার কথা জানতে পারে। ঐ টাকা সম্বন্ধে বাবাকে প্রশ্ন করাতে বাবা তাকে বলেছিলেন :

"পার্থিব লাভ-লোকসানে কোনদিন প্রভাবিত হয়ো না। সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ নিয়েই শুধু জগত নয় ; মানুষের চারিত্রিক গুণই বড় কথা। চিত্তকে অবিচলিত রেখে নির্বিকল্প পরমাত্মায় মনঃসংযোগ করতে হবে। সেই পরমানন্দ লাভ হলে মায়ার প্রভাব দূর হয়। ভগবদ্ সন্ধানে নিয়োজিত হলে

বিষয়-বাসনা আর থাকে না। মানুষ যেমন ভূমিষ্ঠ হবার সময় কিছুই সঙ্গে নিয়ে আসে না, তেমনি দেহান্তর ঘটার সময়েও কিছুই নিয়ে যায় না। ঈশ্বরকে জানার মধ্যে যে অনন্ত মাধুর্য্য তাই তোমার জীবনের লক্ষ্য হোক্। ধন-দৌলত, আত্মীয় পরিজন, শত্রু-বন্ধু—এরা সবই সাময়িক; সবই তাঁর চির-পরিবর্তনশীল নাটকের এক একটি চরিত্র। তুমি এখানে এসেছ তাঁর এই লীলা দেখতে। অজ্ঞানতার জন্যে বুঝতে পারনা, কোন্ কৌশলে তিনি তোমায় দিয়ে কি কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।"

বাবার ঐ টাকার আসল ইতিহাস শেষ পর্য্যন্ত আমরা জানতে পেরে-ছিলাম আমাদের ছোট বোন থামুর স্বামী ঁঅরিন্দম সরকারের (এম. এস্. সি) কাছ থেকে। তিনি যদি না এস্ট্যাব্লিসমেণ্ট বিভাগের প্রধান থাকতেন এবং রেলওয়ের এজেণ্ট ও জেনারেল ম্যানেজারের পার্সোন্যাল অ্যাসিসটেণ্ট হিসাবে বি. এন. রেলের হিসাব ও পে-রোল সংক্রান্ত বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত হতেন, তাহলে এই ঘটনা চিরদিন আমাদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যেত।

একটি ঘটনার কথা বলি। একবার দেখি বাবা কিসের হিসাব দেখছেন আর হাসছেন। তাঁর এরকম হাসি আমরা সচরাচর দেখতাম না। তাই ব্যাপারটি জানার ঔৎসুক্য নিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তিনি বললেন: "এই দেখ পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। ভালই হয়েছে। জান! ভগবান যখন কাউকে কৃপা করেন তখন তিনি তাকে সমস্ত পার্থিব হিসেব-নিকেশ থেকে মুক্তি দেন। এই যে বাড়ী কেনা আর বিষ্ণুর প্যাকার্ড গাড়ি কেনা—এরই মধ্যে দিয়ে আমার মুক্তি ঘটেছে। টাকাগুলো যদি খরচ না হোত, তাহলে এর পেছনে আমার কিছু সময় ব্যয় হোত, আর চিন্তার জগদ্দল পাথর আমার বুকে হাঁফ ধরাতো।"

সেই সময় বাবার শরীর খুব ভাল যাচ্ছিল না। একজন প্রবীণ আত্মীয় তাই তাঁকে দেখতে আসেন। কথাপ্রসঙ্গে বিষ্ণুর গাড়ি কেনার কথা ওঠে। আত্মীয়টি অভিযোগের সুরে বলেন—'বিষ্ণু করছে কি বলুন তো?' সত্যি কথা বলতে কি তখন আমাদের দু'খানা দামী মোটরগাড়ি আর তিনটে মোটর বাইক ছিল। তাই নতুন গাড়ি কেনার প্রয়োজন ছিল না। আর তাছাড়া বাবা নিজে কোনদিন মোটরগাড়ি চড়তেন না। বাবা সেই আত্মীয়টিকে বলে-ছিলেন: "দেখ, বিষ্ণুর এই যে নতুন প্যাকার্ড গাড়ি কেনার শখ হয়েছে, তুমি কি ভাবছ আমি টাকা না দিলে সেটা ওর কেনা হয়ে উঠবে না? ধর আজই যদি আমি মরে যাই তো কালই বিষ্ণু ওর বিষয়ের টাকা দিয়ে গাড়িটা কিনবে। তাছাড়া টাকার এই বোঝা বয়ে বেড়িয়েই বা কি পাবো বলতো? আমার প্রয়োজন ছিল সঞ্চয় করার, প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে ওদের সবাইকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়ার—তা আমি করেছি। যদি ওরা এর মূল্য না বোঝে তবে ভবিষ্যতে সমস্ত দায়-দায়িত্ব ওদেরকেই বহন করতে হবে; তখন তো অবস্থা সামাল দিতে আমি থাকব না। সে কাজ ওদেরকেই করতে হবে। সেজন্য যে যাতে আনন্দ পায় তাই তাকে করতে দেই—অবশ্য যদি না সে অন্যের ক্ষতি করে। ওদের আনন্দে আমিও আনন্দ পাই।" সেদিনের ঐ

ঘটনার মধ্যে দিয়ে বাবার কাছে যে শিক্ষা আমরা পেয়েছিলাম, তাই আজ আমাদের জীবনের পাথেয়।

এমনকি অনন্তদার মৃত্যুও বাবার এই নির্লিপ্ততা ভাঙ্গতে পারে নি। বড়দার অসুখের সময় খুব কাছে থেকেও আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি কখন তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বড়দার জ্বর খুব বেশি দেখে আমি সবে রান্নাঘর থেকে বরফ নিয়ে রোগীর ঘরে এসেছি, এমন সময় বাবা তাঁর নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বড়দার ঘরের দরজা খুলেই বললেন, 'সব শেষ'। তখন রাত দুটো।

বাবা অল্পক্ষণ অনন্তদার প্রাণহীন দেহটার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে, যাবার সময় শুধু বলে গেলেন, "মৃতদেহ খাটে শুইয়ে রাখতে নেই মেঝেতে নামিয়ে রাখ।" এক অজানা আকর্ষণে আমি ওঁর পেছন পেছন গিয়ে দেখি—নিজের ঘরে ফিরে তিনি আবার 'ক্রিয়াযোগ' সাধনায় বসেছেন।

সেইদিন বেলাতে, শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে সকলেই যাতে অনন্তদাকে শেষবারের মত দেখতে পায়, সেজন্য নীচে গেটের সামনে ফুটপাতে খাটের ওপর মৃতদেহ রাখা হয়েছিল। বাবা দোতলার বারান্দা থেকে ঝুঁকে বললেন, 'একটু দাঁড়াও'। তারপর নীচে নেমে এসে আমাদের বললেন অনন্তদার মুখ থেকে ঢাকাটা সরিয়ে দিতে। তিলে তিলে নিজের সমস্ত স্নেহ ভালবাসা দিয়ে যে অনন্তদাকে তিনি বড় করে তুলেছিলেন, তারই দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

বাবা বড়দার ওপর অনেকখানি নির্ভর করতেন এবং কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে তাঁর মতামত নিতেন। সেজন্য প্রিয়জনের মৃত্যু মনে যে প্রতিক্রিয়া আনে, তাই আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম বাবার কাছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—কোন চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা তাঁর মধ্যে দেখতে পাই নি। যথারীতি অফিস গেছেন, এসেছেন—স্বাভাবিক ভাবেই রোজকার মত অন্য কাজও করেছেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত ও অবিচলিত ভাবের কোন পরিবর্তন দেখিনি সেদিন। সেদিনও যেমন তাঁর স্থিরভাবের ব্যাখ্যা করতে পারিনি, আজও তেমনি বলতে পারি না কোন সে শক্তি, যা আয়ত্ত করে তিনি এমন নির্লিপ্ত থাকতে পেরেছিলেন, এমন মানসিক স্থৈর্য্য বজায় রেখেছিলেন। শুধু এটুকুই বুঝেছি—মা আর অনন্তদার মৃত্যু দেখে বাবা মর্মে মর্মে পৃথিবীতে মানুষের অনিত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন এবং একথাও বুঝেছিলেন যে মনপ্রাণ দিয়ে বিধিনির্দিষ্ট কাজ করে যাওয়াই তাঁর ইহজীবনের একমাত্র শ্রেয় ও কর্তব্য।

বাবার ঘরে আমরা কোনদিন কোন আয়না দেখিনি। তিনি বলতেন, "নিজের কায়াকে দেখলে মায়া বাড়বে। সহজভাবে এবং যেমন করে ও যত তাড়াতাড়ি মায়াকে দূর করা যায়, মুক্তি ততই এগিয়ে আসে। অন্যথায় মৃত্যু মুক্তি নিয়ে আসার আগে, মায়ার বশে অনেক কষ্ট পেতে হয়।"

বাবার এই নির্জনতার প্রতি আকর্ষণ এবং নিস্পৃহ মনোভাবের আরও প্রকাশ দেখতে পাই বিষ্ণুর বিবাহের সময়। উৎসব আনন্দের দিন, তাই দূর-দূরান্ত থেকে অনেক আত্মীয় পরিজন এসেছেন। সকলের মনেই আহ্লাদ,

তাই কথাবার্তাও উঁচু স্বরেই হচ্ছিল। বাবা বোধ করি অসুবিধে বোধ করছিলেন, নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একবার যেন কিছু বলতেও গিয়েছিলেন, কিন্তু সকলকে আনন্দে মেতে থাকতে দেখে শেষ পর্য্যন্ত কাউকে কিছু না বলেই নিঃশব্দে নিজের নির্জনতার মধ্যে ফিরে গিয়েছিলেন। বিষ্ণুর বিবাহের ব্যাপারে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন ; ঘরের মধ্যে যোগসাধনায় মগ্ন ছিলেন। শুধু বিয়ের দিন বাড়ীর সকলের অনেক অনুরোধে, একবার ঘরের বাইরে এসে, অতিথিদের সমাদর ও বিষ্ণুকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন।

বড়দার বেলায় যেমন, ঠিক তেমনি বড়দিও যখন কয়েক বছর বাদে মারা যান তখনও দেখেছি, বাবার সেই এক নিরাসক্ত নিস্পৃহ ভাব। বড়দি হঠাৎ-ই এক রাত্রে* মারা যান। জামাইবাবু টেলিফোনে আমাদের এই দুঃসংবাদ দেন। বিষ্ণু আর আমি তাঁদের বাড়ী যাই। সেখানে যেতে বড় জামাইবাবু বললেন : যার মেয়ে অর্থাৎ আমার বাবাকে না দেখিয়ে দেহ দাহ করতে শ্মশানে নিয়ে যেতে দেব না। যাই হোক্, রমাদির বাড়ী থেকে আমাদের বেরোতে বেরোতে প্রায় ভোর হয়ে গেল। পথেই সেজদি অর্থাৎ নলিনীদির বাড়ী। তাকে গিয়ে বললাম—বাবাকে খবরটা জানাতে হবে, তুমি চল।

বাবার ভোরবেলায় ওঠার অভ্যেস। তাই তাঁকে বিরক্ত না করে তাঁর ঘরের দরজা খোলার অপেক্ষায় সকলে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবা ঘর থেকে বেরিয়েই সেজদিকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে।

তখন সব কথা তাঁকে জানান হলো। একটুও বিচলিত না হয়ে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করলেন কখন মারা গেছে। আমরা বললাম—রাত সাড়ে এগারটায়। তখন বললেন, 'দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তো?" আমরা জামাইবাবুর কথা উল্লেখ করে বললাম, "তোমাকে একবার না দেখিয়ে দাহ করে কি করে?"

বাবা শুনে বললেন, "কি নির্বোধ! আমি মৃতদেহ দেখে কি করব? ইট ইজ নাথিং টু মি নাউ, নাথিং টু হার। যত শীঘ্র পার সতীশকে ফোন করে দাহ করতে বলে দাও।"—এই বলে যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাবে চলে গেলেন।

আমরা তো অবাক্! যে বাবা আমাদের কারও সামান্য অসুখ হলে কত চিন্তিত হতেন, কত ব্যবস্থা ও উপদেশ দিতেন, তিনিই এমন নির্বিকার! বড়দা মারা যাবার পরও কখন দাদার কথা বাবার মুখে শুনিনি বা দুঃখ করতে দেখিনি। তাঁর কাছে জীবনের আর পাঁচটা সাধারণ ঘটনার মত মৃত্যুও এক সম্ভাব্য এবং সাধারণ ঘটনা বই আর কিছুই নয়।

---

* যেদিন বড়দি মারা যান সেদিন সকালে তিনি কনে সাজে সেজেছিলেন, আর জামাইবাবুকে বলেছিলেন: "দেখ, এ'জগতে তোমাকে আমার সেবা করার আজই শেষ দিন।" সেইদিন বেলার দিকে যখন তাঁর হার্ট অ্যাটাক্ হয়, তখন তাঁর ছেলে ডাক্তার ডাকতে চাইলে তিনি বারণ করেন এবং তার কিছুক্ষণ পরেই মারা যান। (পরিশিষ্টে রমাদির জীবনী দ্রষ্টব্য। তাছাড়া 'যোগি কথামৃতে'র 'পাষাণ দেবতার হৃদয়' পরিচ্ছেদটিও স্মর্তব্য। —প্রকাশকের মন্তব্য)

ঋষিতুল্য আত্মসংযম

জীবনের শুরু থেকে যে সহজ সরল আহারে ও আচারে বাবা নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলেছিলেন, তা থেকে, যতদিন বেঁচেছিলেন এক মুহূর্তের জন্যও কোনদিন বিচ্যুত হন নি। বলতেন—ছোটবেলা থেকেই এতে অভ্যেস হয়ে গিয়েছে, তাই এখন আর বদলাবার কোন প্রয়োজন দেখিনে। তিনি অফিসে টিফিন করতেন ভিজানো সাগু আর এক টুকরো মিছরি দিয়ে। কখনও মনে পড়ে না বাবাকে আমরা কোনদিন কোন নেমন্তন্ন বাড়ীতে কিছু খেতে দেখেছি বলে। খাওয়ার কথা বললে তিনি বিনীত ভাবে হয় বলতেন—শরীর খারাপ, অথবা সারাদিন অফিসে কাজ করার পর শরীর ক্লান্ত।

এক সময়ে বাবা যে টাকা রোজগার করতেন তা দিয়ে খুব সহজেই একটি মোটর গাড়ি কেনা যেত। কিন্তু চিরদিনই তিনি মনে করেছেন এসব বিলাসিতা, আর সব বিলাসিতাকেই তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। প্রতিদিন আমাদের গড়পার রোডের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আপার সারকুলার রোড (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) হয়ে সুকিয়া ষ্ট্রিট্ (এখন মহেন্দ্র শ্রীমানী ষ্ট্রীট্ ও কৈলাশ বসু ষ্ট্রীট্) এবং তারপর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ (বর্তমান বিধান সরণী) পর্য্যন্ত হেঁটে গিয়ে সেখান থেকে হাইকোর্টের ট্রাম ধরতেন। তারপর হাইকোর্টের কাছ থেকে বি. এন. রেলের অফিস লঞ্চে চড়ে গার্ডেন রীচ অফিসে যেতেন। ফেরার সময়েও ঐ একই পথে বাড়ি ফিরতেন।

গ্রীষ্মকালে বাবার পোষাক ছিল মোটা সাধারণ কাপড়ের দু খানি সার্ট, দুখানা ছিটের গলাবন্ধ কোট, দুটি প্যান্ট আর একটি হিন্দুস্তানী টুপি। শীতের সময় এরই উপর নেভি-ব্লু রংয়ের ডোরাকাটা গলাবন্ধ একখানি কোট ব্যবহার করতেন। পায়ে দিতেন মীরাটের তিন টাকা দামের সু। সারাক্ষণ ফিতে বাঁধা জুতো পরে থাকলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় বলে তিনি অফিসে একজোড়া কমদামী চপ্পল ব্যবহার করতেন।

মোটা মাইনের একজন চাকুরের পক্ষে একটি সাধারণ স্টীল ফ্রেমের চশমা পরা ঠিক নয় বলে, মা সখ করে বাবাকে সোনার ফ্রেমের একটি চশমা করিয়ে দিয়েছিলেন। বাবা কিন্তু সেটি কোনদিনই ব্যবহার করেন নি। স্টীলেরটিই বরাবর পরতেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলে বলতেন: "তোমাদের ছোটকাকা কিছুদিনের জন্য ইছাপুর ডাকঘরে কাজ করেছিলেন। আমারটি দেখে ও একটা সোনার ফ্রেমের চশমা করিয়েছিল। একদিন খেয়ালবশে চশমাটি টেবিলের ওপর রেখে কী একটা কাজে ভেতরে যায়। ফিরে এসে দেখে সেটি উধাও। স্বাভাবিক ভাবেই তার মনে অনুশোচনা, অনুতাপ হয়েছিল। তাই কাজ কি আমার ও সমস্ত ব্যবহার করে? তাছাড়া ওই সব দামী জিনিষ পরে নিজেকে আলাদাভাবে সতর্ক রাখতে হয়। যেচে আনা এই উৎকণ্ঠায় নিজেকে জড়িয়ে রাখার কোন সার্থকতা নেই—বরং তাতে লোক দেখানো একটি পরিচয় ফুটে ওঠে।" বাবার সেই সোনার ফ্রেমের চশমাটি এখনও আমার কাছে আছে।

বাবা নিজের ঘরে কখনও বিজলী আলো ব্যবহার করতে দেননি। রাত্রে তিনি রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালাতেন। জীবনে কোনদিন সিনেমা থিয়েটার দেখেন নি—বলতেন, ওতে চোখের ক্ষতি হয়, মনের ওপর অযথা চাপের সৃষ্টি হয় আর বন্ধ ঘরে অত লোকের নিঃশ্বাসে স্বাস্থ্যেরও হানি ঘটে।

বাবা অবসর সময়টা নিঃসঙ্গে কাটাতে পছন্দ করতেন। কোন কিছুই তাঁর এই জীবনযাত্রা প্রণালীকে পরিবর্তন করতে পারেনি। তাই দেখতুম, প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম সেরে নিজের ঘরে বসে শাস্ত্রপাঠ এবং লাহিড়ী মহাশয় নির্দেশিত ধ্যান সাধনা করে সময় কাটাতেন।

বাবা জীবনে কোনদিন ঋণ করেন নি। ছেলেবেলায় আমার ঠাকুরদা কৃত ঋণের অভিজ্ঞতা চিরদিন তাঁর স্মৃতিতে জাগরূক ছিল। নিজে সারাজীবন কৃচ্ছ্রসাধন করে কাটালেও অপরের ক্ষেত্রে তিনি সদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। মায়ের মানসিকতা এ ব্যাপারে বাবাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। মায়ের মৃত্যুর পর আত্মীয় বন্ধু, চেনা পরিচিত—যে কেউই প্রয়োজনে বাবার কাছে সাহায্য চাইতেন, তিনি তাঁদের সম্ভাব্য সবরকম সাহায্যই করতেন। কাউকেই শূন্যহাতে ফেরাতেন না।

আমাদের পূজনীয় পিতৃদেব ১৮৫৩ সালের ১২ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪২ সালের ১লা অগ্যাষ্ট উন-নব্বই বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। মায়ের মৃত্যুর পর জীবনে কখনও কারোর সাহায্য গ্রহণ করেন নি। বাড়ীর প্রত্যেক ছেলেমেয়ের দেখাশোনার জন্য আলাদা লোক ছিল, কিন্তু বাবা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সমস্ত কাজ নিজে হাতে করে গেছেন।

৬ বেরিলীর দিনগুলি

মায়ের মৃত্যুতে শোকাতুর মেজদা

মায়ের মৃত্যুর পর বহুদিন পর্য্যন্ত মেজদা সেই শোক ভুলতে পারেন নি। বেরিলীতে আমাদের বাংলোর পাশের মাঠটায় একটা মস্ত শিউলি ফুলের গাছ ছিল। অনেক সময় মেজদা এই গাছটার তলায় বসে মায়ের কথা, মা ভগবতীর কথা ভাবতেন। ভগবানকে মনে মনে ডেকে বলতেন, 'কবে আমি মায়ের মত তোমার কাছে যাবো।'

মেজদার সেই বিষণ্ণভাব দেখে বাবা খুব চিন্তায় পড়লেন। তাঁর এই ভাবনা থেকে মনটাকে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবা মেজদাকে বেরিলীর একটা ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন। সেই সময় আমাদের মাসতুতো ভাই ধীরাজদা, কিছুদিন থাকার জন্য ওখানে আসেন। তিনি বড়দার চেয়ে বয়সে কিছুটা বড়, তাছাড়া হিমালয়ে ঘুরতে ঘুরতে তিনি অনেক মুনি-ঋষি এবং যোগী পুরুষের সাক্ষাতলাভও করেছিলেন। তাঁর মুখ থেকে হিমালয়ের আধ্যাত্মিক পরিবেশ এবং সাধু-সন্তদের বিচিত্র কাহিনী শুনে মেজদার মনে হিমালয়ে যাবার একটা দুর্নিবার বাসনা জেগে ওঠে। মনে মনে ঠিক করলেন হিমালয়ে পালিয়ে যাবেন এবং সেখানকার যোগীদের কাছ থেকে জেনে নেবেন কেমন করে ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়। এই সব চিন্তা করে এত বেশি চঞ্চল হয়ে উঠলেন যে, উৎসাহের আতিশয্যে একদিন সব কথা বাড়ীওয়ালার ছেলে এবং আমাদের বন্ধু দ্বারকাপ্রসাদকে সব বলে ফেল্লেন। দ্বারকাপ্রসাদ মেজদাকে মোটেই উৎসাহিত করলেন না, বরঞ্চ সব কথা বড়দাকে জানিয়ে দিলেন। তারপর থেকে বড়দা মেজদার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে শুরু করলেন। তিনি মেজদাকে ব্যঙ্গ করে 'বালখিল্য' বলতেন। দ্বারকা প্রসাদও এ ব্যাপারে মেজদাকে নিয়ে অনেক ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতো। তাদের এই ঠাট্টা-তামাসা মেজদাকে নিরুৎসাহিত না করে, বরঞ্চ হিমালয়ের নির্জনতায় ঈশ্বর সন্ধানের বাসনাকে আরও সুতীব্র করে তুলেছিল। সুপ্রাচীন কাল ধরে ভারতের সাধু সন্ন্যাসীদের পরিধেয় গৈরিক বসনই হয়ে উঠল মেজদার কাছে জীবনের একান্ত কাম্য বস্তু।

বড়দা বুঝতে পেরেছিলেন যে মেজ ভাইটি মনে মনে বাড়ী থেকে পালাবার চেষ্টা আর সুযোগ খুঁজছে। তাই তিনি সর্বদা সতর্ক থাকতেন। সেদিন বিকেলে মেজদা যখন কাউকে কিছু না বলে, বাড়ী থেকে উধাও হবার জন্যে বেরোলেন, তখন বড়দাও দূর থেকে তাঁর অনুসরণ করলেন। শেষ পর্য্যন্ত নৈনীতাল থেকে ওঁকে ফিরতে হলো বড়দার সঙ্গে।

ব্যর্থ, ভারাক্রান্ত মনে রোজ সকাল সন্ধ্যায় মেজদা বসে থাকেন সেই শিউলি গাছের নীচে। প্রায়ই দেখতাম তিনি ধ্যানে নিমগ্ন—আসপাশের কথা একেবারেই ভুলে গেছেন। তাঁর মন তখন পরমাত্মার সাথে মিলনের জন্যে অনন্তের পথে উড়ে চলেছে। সেই রকম অবস্থায় দেখেছি, মা ভগবতীর

কথা ভেবে তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ছে। অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা জানিয়ে বলছেন, "মা মাগো, এরা আমাকে তোমার কাছে আসতে দেয় না।" ওঁর ঐ আকুল কান্না দেখে আমারও চোখে জল আসতো। প্রচণ্ড রাগ হতো বড়দার ওপর। কেন, কেন বড়দা এমন করেন?

অহিংসার* পূজারী

দ্বারকাপ্রসাদের মেজো ভাই মাধোপ্রসাদ ছিল একজন মস্ত শিকারী। আমরা তাঁর অদ্ভুত পোষাক দেখে কৌতূহল অনুভব করতাম। মনে মনে ইচ্ছে হতো—বড় হয়ে আমিও ওঁর মত একজন বড় শিকারী হব। সারা পৃথিবী আমাকে চিনবে। বনের জন্তু জানোয়ার আমার গন্ধ পেয়েই ভয়ে পালিয়ে যাবে। মাধোপ্রসাদের সঙ্গে বড়দার বন্ধুত্ব ছিল। তাই নানারকম পাখি শিকার করে আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিতেন। মেজদা ছাড়া আর সকলেই সে মাংস রান্না করে বেশ আস্বাদ করেই খেতাম। আমরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসলেও মেজদা কেবল ভাত আর নিরামিষ তরকারী খেতেন। তাঁকে রাগাবার জন্য বড়দা আমার থালায় সুস্বাদু মুরগীর মাংস দিয়ে মেজদার পাশে বসিয়ে দিতেন। কারুর সংগে কোন কথা না বলে মেজদা তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে চলে যেতেন।

আমাকে একলা পেলেই লোভী বলে বিদ্রূপ করতেন। বলতেন: "নিরীহ পাখিগুলোকে গুলি করে মারা পাপ; আর যারা ওদের মাংস খায়, সে পাপের অংশী তারাও। এ পৃথিবীতে পাপ সঞ্চয় করা খুব সহজ, কিন্তু অণুসমান পুণ্য সঞ্চয় করাও ভীষণ কঠিন। মৃত্যুর পর সকলকেই এ জীবনের প্রতিটি কাজের কৈফিয়ৎ দিতে হয়। তাই কিছু করার আগে চিন্তা করে নেওয়া দরকার। উচিৎ অনুচিত, ন্যায় অন্যায়, বিচার অবিচার অত্যাচারের পার্থক্য যে করতে পারে না, তাকে আর যাই বলা যাক্—মানুষ নামে ডাকা যায় না।"

* মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর 'যোগসূত্রে' (সমাধিপাদ, ৩৫) লিখেছেন, 'যে মানুষের মধ্যে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁর সন্নিধানে সর্বপ্রাণী নির্বৈর হয়'। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজী বলেছেন, "পতঞ্জলির মতে অহিংসা হ'ল প্রাণবধের 'ইচ্ছা' পর্য্যন্ত ত্যাগ। পৃথিবীতে অহিংসা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার অসুবিধা অনেক। মানুষ অবশ্য হিংস্রপ্রাণিদের বিনাশ সাধন করতে বাধ্য হতে পারে। কিন্তু সে ক্রোধ বা দ্বেষ পোষণ করতে অনুরূপভাবে বাধ্য নয়। জীবনের বিভিন্ন রূপে একই মায়ার অভিব্যক্তি। যে সাধু ব্যক্তি সৃষ্টি রহস্য ভেদ করতে সমর্থ, তিনি প্রকৃতির সংখ্যাতীত বিচিত্র প্রকাশের সংগে একাত্মীভূত। অন্তরে প্রাণিহিংসা দমন করতে পারলে সকল লোকই এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে।"—শ্রীশ্রীপরমহংস যোগানন্দ কৃত 'যোগিকথামৃত' গ্রন্থে 'আমার গুরুর আশ্রমে বহু বৎসর' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। (প্রকাশকের মন্তব্য)

সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা

আমাদের বড় ভাই—মানে অনন্তদা—ছিলেন কঠিন নিয়ম শৃংখলার মানুষ। কোন অন্যায় তিনি নিজে যেমন করতেন না, তেমনি অন্য কেউ করলেও সহ্য করতেন না। অনেক ক্ষেত্রে বিচারে তাঁর ভুল হয়েছে, আবার কখনো বা তাঁর মতামতে পক্ষপাতদুষ্টতা ঘটেছে। তা সত্ত্বেও বড়দার চরিত্রের অনমনীয়তা আমাদের সকলের, বিশেষ করে মেজদার ওপর যথেষ্ট ছাপ ফেলেছিল। যদিও মেজদা বড়দাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন, তবুও বড়দা বা অন্য যে কেউ অন্যায় করলে, সত্য এবং ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে তাঁকে কখনও দ্বিধা করতে দেখিনি।

আমাদের এক বিধবা আত্মীয়া মানুদি,* আমাদের সকলকে দেখাশোনা করার জন্য এসেছিলেন। আমাদের শাসনে রাখার জন্য তিনি অনেকভাবে চেষ্টা করতেন, যার অনেকগুলিই বিশেষ ন্যায়সঙ্গত নয়। স্নান, খাওয়া শোয়ার ব্যাপারে জুটতো অহেতুক লাঞ্ছনা গঞ্জনা। দৃঢ়চেতা মেজদা নির্বিবাদে সব মেনে নিতে মোটেই রাজী ছিলেন না। ওঁর মনে হতো সব কিছু মেনে নেওয়ার মানেই হলো অন্যায়কে স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু মানুদিও বড় সহজ ছিলেন না। যেনতেন প্রকারেণ নিজ প্রভুত্ব খাটাতে তিনি ছিলেন অতি মাত্রায় উৎসাহী। স্বাভাবিক কারণে মুখর প্রতিবাদ আসতো মেজদার কাছ থেকে। তিনি যা বলতেন মেজদা ঠিক উল্টোটি করতেন। শেষ পর্য্যন্ত যখন তিনি দেখলেন মেজদাকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না, তখন তিনি মেজদার নামে বড়দার কাছে এক মিথ্যা অভিযোগ আনলেন। বড়দা সরল বিশ্বাসে গুরুজন স্থানীয়া আত্মীয়াটির কথায় বিশ্বাস করে মেজদাকে বললেন তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে। মেজদা বললেন, "কেন? আমি তো কোন অন্যায় করি নি? মিছামিছি ক্ষমা চেয়ে কেন নিজের ভেতর যে ভগবান আছেন তাঁকে ছোট করব বা নিজেকেও ছোট করব?"

মেজদার কথাগুলি বড়দার কাছে ঔদ্ধত্য বলেই মনে হয়েছিল। তিনি বললেন, "ক্ষমা তোমাকে চাইতেই হবে। বাড়ীর মধ্যে একমাত্র তুমিই সত্যবাদী নও। সুতরাং যা বলছি সেভাবে গুরুজনদের শ্রদ্ধা সম্মান করতে শেখ।"

মেজদাও ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। বড়দা আর রাগ সামলাতে না পেরে কাঠের একটি রুল দিয়ে মারতে শুরু করলেন। তাঁর সারা গায়ে সেই দাগ ফুলে ফুলে ফুটে উঠলো। পাশে দাঁড়িয়ে আমি ভয়ে কাঁদছি আর কাঁদছি। ভাবছি, 'মেজদা কি বোকা! কথার কথা হিসাবে একবার ক্ষমা চেয়ে নিলেই তো সব মিটে যায়—এত মার খেতে হয় না।' অত মেরেও বড়দা কিন্তু মেজদাকে দিয়ে ক্ষমা চাওয়াতে পারেন নি; বরঞ্চ তাঁর মারের মাত্রা যত বেড়েছে, মেজদার মুখে চোখেও ফুটে উঠেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দৃপ্ত ভাব।

* মানুদি হলেন আমাদের এক আত্মীয় যতীনদার বড় বোন। তাঁদের বাবা অর্থাৎ শ্রী ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন আমার বাবার এক খুড়তুতো ভাই।

অশ্রুবিহীন নীরব সেই প্রতিবাদ ইস্পাতের মতই কঠিন আর অনমনীয়। শেষ পর্য্যন্ত কাঠের রুলটাই ভেঙে গেল। রাগে, দুঃখে অপমানে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন বড়দা। মেজদা তখনও দেবদারু গাছের মত স্থির দাঁড়িয়ে।

সেই দিনই অধিক রাতে বড়দা সেজদিকে (নলিনী) বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা শুনে বুঝতে পারলেন যে আত্মীয়াটি মিথ্যা কথা বলেছেন। তাঁর মনে ভীষণ দুঃখ আর অনুতাপ হলো—বুঝতে পারলেন মেজদার নিঃশব্দ প্রতিবাদের জোর এবং দৃঢ় প্রকৃতির কথা। এই দৃঢ়তা আসে সত্যের প্রতি নির্ভরশীলতা থেকে। মেজদার ঘরে ঢুকে বড়দা তাঁকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে অনেক আদর করলেন—নির্য্যাতন করার জন্য ছোট ভাইয়ের কাছে, এমনকি ক্ষমাও চাইলেন। তারপর মেজদাকে সঙ্গে নিয়ে মানুদির ঘরে গিয়ে তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, "দেখো ভবিষ্যতে যেন এরকম কিছু আর না ঘটে।"

মানুদি আড়াল থেকে বড়দার শাসনের স্বরূপ দেখেছিলেন। সেজন্য পরে একদিন কাঁদতে কাঁদতে মেজদাকে বলেছিলেন. 'এই ঘৃণ্য মেয়ে মানুষটিকে ক্ষমা করে দিস ভাই। আমি তোকে চিনতে পারিনি মুকুন। আমার পাপের শেষ নেই। তাই তুই যদি না ক্ষমা করিস্ তবে আমার আর মুক্তি নেই। বল না ভাই, ক্ষমা করেছিস তো? বল না ভাই, বল না?"—বলে সে কি কান্না মানুদির। মেজদা আর আমি দুজনে মিলে থামাতে পারি না। শেষে অনেক সান্ত্বনা অনেক ভাল কথা বলে তবে থামান গেল।

এরপর মেজদা ওঁর দিকে একভাবে কিছু ক্ষণ চেয়ে থেকে শুধু হাসলেন আর বললেন—"আমি ক্ষমা করার কে? আপনি ভগবানের কাছে ক্ষমা চান, তিনিই আপনাকে ক্ষমা করবেন।"

বেরিলীতে থাকতেই মেজদা একদিন আমাকে বললেন যে মায়ের হাতে গড়া মা কালী মূর্তিটি নিরঞ্জন করবেন।* আমি তাতে প্রবল প্রতিবাদ জানাই। গোড়ার দিকে মেজদা তাঁর এই সিদ্ধান্তের কারণ সম্বন্ধে কিছুই বলতে চাইতেন না। শেষে আমার ঔৎসুক্য মেটাতে বললেনঃ "আমার স্বপ্নাদেশ হয়েছেরে, সুতরাং আর তো আটকে রাখা যায় না।" তাঁর উত্তরটা খুব হেঁয়ালীপূর্ণ হলেও আমি ঐ 'স্বপ্নাদেশ' নিয়ে আর কোন প্রশ্ন তুলিনি। এই প্রতিমাটিই ছিল মায়ের নিজের হাতে গড়া শেষ কালীমূর্তি।

* মূর্তি—পরমেশ্বর পরমাত্মার কেবল প্রতিরূপ মাত্র। প্রতীকী অর্থেঃ ভক্ত ঐ মূর্তিতে অধিষ্ঠিত হবার জন্য পরমেশ্বরকে আবাহন করে, কেননা ভক্ত চায় তার অভীষ্ট রূপে পরব্রহ্মকে পূজা করতে। সাধারণতঃ এইসব মূর্তি মাটি দিয়েই তৈরী করা হয়, যাতে পূজার পর সেগুলিকে নদী বা পুষ্করিণীর জলে বিসর্জন দেওয়া যায়। এইভাবে মূর্তিগুলি যে উপাদানে গড়া সেই উপাদানে আবার মিশে যায়, যাকে আমরা প্রতীকী অর্থে বলতে পারি—আত্মার সাকার থেকে নিরাকার রূপে পরিবর্তন। এইভাবে ঈশ্বরকে নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট এবং লৌকিক ও অলৌকিক—এই উভয়রূপেই পূজা করা হয়। (প্রকাশকের মন্তব্য)

৭ চট্টগ্রাম

একটি স্মরণীয় সাক্ষাৎ

বড়দার ডাইরী অনুসারে আমরা বেরিলী থেকে চট্টগ্রামে চলে আসি ১৯০৬ সালের ৩রা মে তারিখে। এখানে আসার পর মেজদা আমাকে নিয়ে রোজ দুপুরবেলা এবাড়ী-ওবাড়ীর গাছ থেকে লেবু, কামরাঙ্গা, আঁশফল ইত্যাদি পাড়তে বেরোতেন। এমনি একজনের বাড়ীতে বেশ ক'টি বড় রাজহাঁস ছিল। মেজদা চেয়েছিলেন রাজহাঁসের পালক দিয়ে কলম বানাবেন। ঐ রকম একটা কলম তিনি বানিয়েও ছিলেন। ব্যাপারটি কিন্তু চাপা রইল না—সেই বাড়ীর ভদ্রলোক বড়দার কাছে নালিশ করলেন। বড়দা দেখলেন, মেজদার দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হলে দুপুরবেলা ওকে আটকাবার ব্যবস্থা করা দরকার। তাই নিজে সঙ্গে করে আমাদের নিয়ে গিয়ে স্থানীয় একটা স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। মেজদা পরীক্ষায় খুব ভাল রেজাল্ট করলেন, আর আমি কোনক্রমে পাশ নম্বরটি তুলেছিলুম।

বড়দা চিরটাকাল নানারকম নিষেধের গণ্ডিতে আমাদের বাঁধতে চেয়েছেন ; যেমন—"এটা কোরো না, ওটা করতে নেই। ওখানে যাবে না, লোকে নিন্দে করবে" ইত্যাদি। আমাদের চট্টগ্রামে অবস্থানের দিনগুলোও এইরকম নিষেধের গণ্ডিবন্ধনে বাঁধা ছিল। আর ঠিক এই কারণেই মেজদা কিছুটা অবাধ্য হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই ছিল সমস্ত অন্যায় বাধা-বন্ধকে অগ্রাহ্য করে নিজের অভিলষিত বস্তু জয় করার জন্য দুর্দম প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া।

একদিন বাড়ীর বড়রা মেজদা আর আমাকে ডেকে বললেন : "বন্দরের দিকে কখনও যাবে না, মোহনার দিকেও নয়।"

মনে মনে বললাম, "হুঁ, মেজদা সেই পাত্র কিনা ! তোমাদের কথা শুনতে ওঁর ভারী দায় পড়েছে।" ঠিক তাই ; মেজদা সকলকে লুকিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসতেন মোহনার ধারে।

বড়দার আদেশ ছিল সন্ধ্যার আগে সকলকে বাড়ী ফিরতে হবে এবং হাত-মুখ ধুয়ে সাড়ে ছ'টার মধ্যে পড়তে বসতে হবে। আমাদের বাড়ী থেকে চট্টগ্রাম বন্দর প্রায় চার কিলোমিটার দূরে। সুতরাং স্কুল থেকে ফিরে প্রায় ৮ কিলোমিটার পথ হেঁটে পরিক্রমা করে নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ী ফিরে আসা, একেবারেই অসম্ভব ছিল। তাই স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে টিফিন করেই আমরা ছুটতাম বন্দরের দিকে, আর বাড়ীও ফিরতাম দৌড়ে। ছোট বয়স থেকে এ'-রকম দৌড়ঝাঁপ করার জন্যেই মেজদা পরে একজন ভাল অ্যাথলেট হতে পেরে-ছিলেন। আমি তাঁর মত অত ভাল না হলেও খেলাধুলায় মোটামুটি ভালই ছিলাম।

মোহনার দিকে যাবার যে রাস্তা সেটা ছোট ছোট পাহাড়ের কোল ঘেঁসে চলে গিয়েছে। পথের দুধারে গাছ থেকে ঝুলতো থরে থরে লিচু, জাম

আরো কত ফল। মেজদা একদিন বললেন, 'শোন্, সন্ধ্যেবেলায় ফেরার সময় কিছু লিচু নিয়ে যেতে হবে। অল্প আলোতে কেউ টের পাবে না।'

'যেমন কথা তেমন কাজ!' মেজদা যখন রসাল মিষ্টি লিচু পাড়তে ব্যস্ত, তখন শুনতে পেলেন কে যেন খুব কাছ থেকে তাঁর নাম ধরে ডাকছে। চমকে উঠে তিনি পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সমস্ত অ্যাডভেঞ্চার যেন হঠাৎ ইতি হয়ে গেল! যে দিক্ থেকে গলার স্বর ভেসে এসেছিল সেই দিকে পা টিপে টিপে এগোতে লাগলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, তাই স্বাভাবিক-ভাবেই আমরা অনক দূরের জিনিষ দেখতে পাচ্ছিলাম না। তারপর হঠাৎ একজন সাদা পোষাকপরা মানুষ দেখলাম। আমাদের দু'জনের চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠায়, তিনি বন্ধুর মত হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। ভাবলাম—প্রহরীই যদি হয় তবে মেজদার নাম জানবে কি করে?

যাই হোক্, ভয়ে ভয়ে সেই সৌম্যদর্শন মানুষটির দিকে এগিয়ে গেলাম। তিনি স্মিত হাসলেন। মনে হলো তাঁর দেহ থেকে যেন এক অত্যাশ্চর্য্য জ্যোতি বেরোচ্ছে। আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম কোত্থেকে সেই আলো আসছে। তারপর হঠাৎ দেখি মেজদা নীচু হয়ে সেই সাধুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছেন। সাধুটি মেজদাকে বুকে টেনে নিয়ে মাথায় চুম্বন করলেন। আমিও তাড়াতাড়ি প্রণাম করলাম। তারপর তিনি 'জয়স্তু' বলে আমাদের আশীর্বাদ করলেন এবং মেজদাকে বললেন, "মুকুন্দ, ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে আজ আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তোমাকে আমি গুটি কয়েক কথা বলব। এগুলো তুমি জীবনে ভুলো না। পৃথিবীতে তুমি এসেছ তাঁর ইচ্ছাপূরণ করতে। মনে রেখো, তোমার এ দেহ তাঁরই মন্ত্রপূত আধার। তুমি তাঁরই প্রতিভূ হয়ে আপাত-সুখের লালসায় মত্ত হয়ে ছুটে বেড়িও না। মূর্খ মানুষকে সত্যকারের সুখসোপান দেখাবে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাহায্যে মুক্তি যজ্ঞের সম্পাদন করবে। ভুলে যেওনা তুমি সেই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষেরই অংশ। ক্ষণিকের জন্যও যেন তোমার দেহ, মন প্রাণ তাঁর চিন্তা থেকে বিচ্যুত না হয়। তোমার ওপরে রয়েছে অনাদি অনন্ত পিতার আশীর্বাদ। তাঁর প্রতি তোমার আস্থা যেন কখনো না ভাঙ্গে। সমস্ত বিপদ-আপদে তিনিই তোমাকে রক্ষা করবেন। মনে রেখো, এ জগতে একমাত্র তিনিই নিত্য, আর সবই অনিত্য। একদিন তোমারই যোগাদর্শে বিশ্ববাসী উদ্বুদ্ধ হবে, অতএব এগিয়ে চল।"

আমি উস্খুস করছিলাম, কেননা সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে উঠছে। বাড়ী পেঁছুতে তখনও অনেক পথ বাকি। আজ নির্ঘাত বাবার কাছে বকুনি আর বড়দার কাছে পিটুনি আছে। সাধুটি বোধহয় আমার মনের কথা জানতে পেরেছিলেন। বললেন—"ভয় নেই যাও, বাড়ীতে কেউ কিছু বলবে না।"

যাই হোক্ বাড়ীর দিকে এগোতে লাগলাম। কিছুটা পথ যাবার পর পিছন ফিরে দেখি, তিনি আমাদের হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন। তারপরই কেমন যেন হঠাৎ মিলিয়ে গেলেন শূন্যে। মেজদাকে ডেকে বলতে চাইলাম

ব্যাপারটা—শুনতে পেলেন না যেন। মাথা নীচু করে হাঁটতে হাঁটতে কি যেন ভাবছিলেন তিনি। বাড়ী ফিরে মেজদা সোজা ঠাকুর ঘরে চলে গেলেন, আর আমি লুকিয়ে খোঁজ করতে লাগলাম বাবা এবং বড়দা কোথায়। শুনতে পেলাম—বড়দা গেছেন এক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে, আর বাবা একটা জরুরী মিটিং থাকায় তখনও অফিস থেকে ফেরেন নি। উঃ! কি আনন্দ; কেউই আজ জানতে পারবে না আমাদের দেরী করে বাড়ী ফেরার কথা। ছুটলাম ঠাকুর ঘরের দিকে, মেজদাকে খবরটা দিতে হবে।

মেজদাও বোধহয় আমাকেই সেই সময় ডাকতে আসছিলেন। বাঁ হাতটি ধরে ঘরের দেয়ালে টাঙানো একখানা ফটোর সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমাকে বললেন, "চিনতে পারিস—ভাল করে লক্ষ্য করে দেখ তো ইনিই তিনি কিনা, যিনি কিছুক্ষণ আগে বনেতে আমাদের সংগে কথা বলছিলেন?"

ছবির দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। হ্যাঁ, এই তো তিনি—হুবহু একরকম দেখতে, সেই হাঁসি! কিন্তু উনি তো বহুকাল গত হয়েছেন—তাহলে কেমন করে আমাদের দেখা দিলেন? আমরাই বা কি করে একটি বিগত দেহের সংগে কথা বল্লাম? তিনি তো আমাদের ভয় দেখালেন না, বরঞ্চ আশীর্বাদ করলেন—মেজদাকে বুকে টেনে নিয়ে মাথায় চুমু খেলেন। এক অজানিত শংকায় আমার গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরোল না—শুধু অপলকে মেজদার দিকে তাকিয়ে রইলুম। সেদিন সেই আলো-আঁধারের ফাঁকে আমি ও মেজদা যাঁকে স্বচক্ষে দেখেছি, এমনকি কথাও বলেছি—তিনি যে লাহিড়ী মশাই তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। ইনিই সেই অলোকসামান্য মহাপুরুষ যাঁর শিষ্য বা শিষ্যা হবার জন্যে কাতারে কাতারে সাধারণ মানুষ, সাধু এবং যোগীদের আনাগোনা চলেছিল। ইনিই একদিন অবিভক্ত ভারতের দূর-দুরান্তের মানুষের হৃদয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। আমি মেজদার সঙ্গে সেই যোগাবতারকে স্বচক্ষে দেখেছি, কথা বলেছি। সেদিনের সেই ঘটনার স্মৃতি যখন মানস নেত্রে ভেসে ওঠে তখন আমার মন পুলকে নৃত্য করে ওঠে। আমার স্মৃতিপটে সেই অভিজ্ঞতা চিরদিনই অমলিন হয়ে থাকবে। বাস্তবিকই ভাগ্যবান আমি, আমার ওপর অসীম তাঁর করুণা—আমি কৃতার্থ, আমি ধন্য।

দুষ্টের দমন

এখানে মেজদার সংগে ষণ্ডা গোছের একটা ছেলে পড়তো। বয়সেও সে সকলের চেয়ে বড় ছিল। স্কুলের ভেতর সুযোগ পেলেই ছোট ছোট ছেলেদের দিয়ে নানা ফাই-ফরমাস খাটাতো। কেউ রাজী না হলে মারধোর করে নিজের শক্তি জাহির করতো।

একদিন সে ভরত নামে ছোটখাট দেখতে এক সহপাঠীকে মারধোর করাতে মেজদা খুব রেগে যান। ষণ্ডা ছেলেটির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই, এই

শোন্, তোমার যদি মারামারি করার খুব সখ হয়ে থাকে, তবে এস—আমার সংগে লড়। দেখাই যাক্ না, কার কত শক্তি আছে।'

কাছাকাছি দাঁড়ানো অন্য সব ছেলেরা মেজদার সাহস দেখে তো অবাক। ভাবখানা—মুকুন্দ বলে কি? ষণ্ডাটি যে ওকে মেরেই ফেলবে। ষণ্ডা ছেলেটা ইতিমধ্যে মেজদার কাছে এগিয়ে এসেছে। খুব তাচ্ছিল্য করে সে বললে, 'কি রে চুনোপুঁটি, এত লাফালাফি করছিস্ কেন? আমাকে চিনিস্?'—বলেই অনেকটা গুলি খাওয়া বাঘের মত মেজদার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হয়ে গেল ঝটাপটি গড়াগড়ি। হঠাৎ ছেলেটি মেজদাকে শূন্যে তুলে মাটিতে এক আছাড় দিল। এমন শব্দ হ'ল, যেন মনে হল মেজদার পিঠের শির-দাঁড়াই ভেঙ্গে গেল। আমি ভীড় ঠেলে এগোবার চেষ্টা করেও এগোতে পারলুম না—চারপাঁচজন আমাকে জাপটে ধরে রইল। আমার চোখ দিয়ে তখন জল বেরিয়ে পড়েছে। মেজদা এমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ভয় হচ্ছে বুঝি মরে যাবে। আমি বেশ শব্দ করেই কাঁদতে লাগলুম।

ষণ্ডা ছেলেটা আবার নীচু হয়ে মেজদাকে তুলে ধরতে চেষ্টা করতেই মেজদা সমস্ত শক্তি দিয়ে দুহাতে ওর গলা টিপে ধরলেন। ছেলেটা এই আচমকা আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। মেজদার হাত ছাড়াবার অনেক চেষ্টা করল, মাথা ঠুকে দিল মাটিতে কয়েকবার—তবুও মেজদা ওর গলা ছাড়লেন না। দেখতে পেলাম ছেলেটি দুর্বল হয়ে পড়েছে—মুখ লাল, জিব খানিকটা বেরিয়ে এসেছে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা শব্দের মত স্বরে মেজদা বললেন, 'বল, আর কোনদিন এমন করব না, তবে ছাড়বো।'

নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলেও ছেলেটি মেজদাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দিয়ে, মরিয়া হয়ে শেষবারের মত আরও দুবার মেজদার মাথা মাটিতে ঠুকে দিল। চোখে অন্ধকার দেখলেও মেজদা আবার বললেন, "যতক্ষণ না স্বীকার করছো আমার কাছে হেরে গেছ, ততক্ষণ আমি তোমায় ছাড়ছি না।"

ছেলেটা তখন বাঁচার জন্যে হাঁকুপাঁকু করছে। তার মনে হচ্ছিল মুকুন্দ যদি আর কিছুক্ষণ ঐ রকম সাঁড়াশি চাপ রাখে, তবে তার নির্ঘাত মৃত্যু। তাই একরমক বাধ্য হয়েই সে হার স্বীকার করে নিল।

মেজদা এরপর ছেলেটির গলা ছেড়ে দিলেন। দুজনেই উঠে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে থাকে। তাড়াতাড়ি আমি মেজদার কাছে গিয়ে দেখি ওঁর মাথার পিছন দিকে বেশ কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে, একটা জায়গায় ফেটে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। কিন্তু তারজন্যে মেজদার মনে কোন দুঃখ নেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি আজ জয়লাভ করেছেন।

ষণ্ডা ছেলেটা কিন্তু অত সহজে পরাজয় মেনে নিতে রাজী ছিল না। হঠাৎ সে আবার মেজদার ওপর লাফিয়ে পড়তে অন্য ছেলেরা একসঙ্গে রুখে বলে উঠল, "দেখো, মুকুন্দর কাছে তুমি হেরে গেছ। আবার যদি তুমি কিছু কর তবে আমরা সকলে মিলে এমন মার দেবো যে সারাজীবনে আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না।" এতগুলো ছেলেকে একজোট হতে দেখে ঐ ছেলেটা

ঘাবড়ে গিয়ে একপা একপা করে পেছতে পেছতে পালিয়ে গেল। আর মেজদা হয়ে উঠলেন দুর্বলের রক্ষক।

পরে কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া বিচার করে মেজদা অনেক অনুশোচনা করেছেন। যখন তাঁর মনে হয়েছে যে তিনি ক্রোধের বশীভূত হয়ে পড়েছিলেন, তখন শরীরের ব্যথা ভুলে বিবেকের দংশনে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিলেন। ভগবানে যে বিশ্বাস রাখে কোন অবস্থাতেই তার রাগ করা চলে না। তাতে একমনে ভগবানের স্মরণে বাধা আসে। তাই প্রতিজ্ঞা করলেন ঃ জীবনের কোন অবস্থাতেই ক্রোধকে প্রশ্রয় দেবেন না। পরেও দেখেছি—অনেকে তাঁকে নানাভাবে আঘাত করেছে, কিন্তু তার জন্যে তিনি বিন্দুমাত্র রাগ বা ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি। সঙ্গী সাথীরা অন্যায় করলে বকেছেন, কিন্তু শান্ত সৌম্য রূপটি হারান নি।

কাগজের নৌকা ও একটি ঝড়ের অবসান

আমরা প্রায় দু'মাস ছিলাম চট্টগ্রামে। এরপর বাবা কলকাতায় বদলী হয়ে আসেন। কলকাতায় আমরা এসেছিলুম এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে —মাত্র সাতদিনের নোটিশে। আমাদের চলে আসার আগে ঐ অঞ্চলের ওপর দিয়ে এক প্রবল ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। সঙ্গে ছিল প্রচণ্ড বর্ষণ। স্থানীয় বাসিন্দারা বললেন—পনেরো দিনের আগে এ ঝড় থামবে না। খবরের কাগজেও আবহাওয়া সম্বন্ধে ঐ একই রকম মন্তব্য বেরোল। আশংকা হলো নির্দিষ্ট সময়ে বোধহয় আর কলকাতায় পেঁছান হবে না।

এদিকে মেজদা প্রায়ই বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আর কতদিন আমরা এখানে থাকব? কবে আমরা চট্টগ্রাম থেকে যাব?" বাবাকেও যখন বেশ চিন্তিত দেখা গেল, তখন মেজদা সেজদিকে বললেন, 'তোমরা সবাই এত ভয় পাচ্ছ কেন? দেখ না, আমি এ'বৃষ্টি থামিয়ে দিচ্ছ।" ওঁর কথা শুনে বাড়ির সবাই তো হেঁসেই খুন। পাগলের প্রলাপও বুঝি এত বে-আক্কেলে হয় না।

যাই হোক্, মেজদা মনস্থির করে রান্নাঘরে ঢুকে উঠোনের দিকের দরজা খুলে সেখানে বসে আমাকে বললেন, "কিছু কাগজ নিয়ে আয় তো।" আমাকে কাগজ জড়ো করতে দেখে সেজদিও লুকিয়ে কাগজ জড়ো করতে লাগল। রান্নাঘরে একটা ছোটখাটো কাগজের পাহাড় তৈরী হয়ে গেল। এই কাগজ দিয়ে মেজদা কি করে তাই দেখার জন্যে আমরা উৎসুক হয়ে উঠলাম।

মেজদা সেই কাগজ দিয়ে ভেলা তৈরী করে উঠানের জলে একটা করে ফেলছেন, আর বিড়বিড় করে কি সব যেন বলছেন। অনেকক্ষণ ধরে এরকম চলতে থাকল।

আধঘণ্টার ওপর সময় কেটে যেতে আমরা নিজেরা বলাবলি করেছিলাম, "হুঁ, মেজদা যেন কি, ভগবানের ওপরে হাত লাগাবে। এ হয় নাকি" মেজদা

শুধু একবার চেয়ে দেখলেন আমাদের দিকে—কিছু বললেন না। একভাবে সেই ভেলা তৈরী করা আর বিড়বিড় করে কি সব বলে সেগুলিকে জলে ছুঁড়ে ফেলা চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভাবতেও অবাক লাগে বৃষ্টি সত্যিই থামল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল—চারদিকে ছড়িয়ে দিল গোধূলির সোনালী আলো। বাড়ীর বড়রা এমন অবাক কাণ্ড আগে আর কখনও দেখেন নি। সবাই বোবা বিস্ময়ে মেজদাকে দেখতে থাকেন। পরের দিনই আমরা কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

আমরা যখন বড় স্টিমারে চড়ে পদ্মা পার হচ্ছি সেই সময় মেজদা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর কিসে চড়তে ভাল লাগে বল তো?' স্টিমার আমার কোনদিনই ভাল লাগে না; তাই বললাম—ট্রেনে চড়তেই ভাল লাগে।

মেজদা বললেন, "আমার কিন্তু জাহাজে, স্টিমারে চড়তে ভাল লাগে। কেমন দুলে দুলে চলে, কত লোক ওলোট্ পালোট্ খায়, ভিরমি যায়। দেখবি, একদিন আমি বহুদূর দেশে যাব—জাহাজেই যাব।" আমেরিকায় মেজদা জাহাজে চড়েই গেছলেন।

আমরা ১৯০৬ সালের ২রা জুলাই চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় এসে পেঁছাই।

৮ কলকাতায় গোড়ার দিনগুলি

ক্রীড়া ও মল্লবিদ্ মুকুন্দ

কলকাতায় এসে প্রথমে আমরা সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে এক পিসির বাড়ীতে উঠি এবং তারপর চাঁপাতলায় বছর খানেক একটা ভাড়া বাড়ীতে থাকি। সেখান থেকে বাবা আমাদের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের কাছে সুবিধা মত ভাল একটি বাড়ীর (৪নং গড়পার রোড) খোঁজ পেয়ে ওখানে চলে আসেন। তখন বাড়ীটার ভাড়া ছিল মাসে চল্লিশ টাকা। পরে ঐ বাড়ীর মালিক বাড়ীটি বিক্রয় করা স্থির করলে বাবা ১৯১৯ সালের ২৫শে জুলাই সতেরো হাজার টাকায় বাড়ীটি কিনে নেন। তখন বাড়ীটা দোতলা ছিল ; পরে আমি বহু পরিশ্রমে তিনতলা করি। আজকের গড়পার রোড সেদিন ছিল একটা সরু গলি মাত্র। পাশাপাশি দু'খানা গাড়ী চালান ছিল কল্পনারও অতীত। আজকের মত সেদিনও কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়টি ছিল আমাদের বাড়ীর ঠিক্ উল্টোদিকে, রাস্তার ধারে, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

চাঁপাতলায় থাকতেই মেজদা আর আমাকে হিন্দু স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। মেজদা ভর্তি হয়েছিলেন ক্লাশ এইট্ আর আমি ক্লাশ থ্রিতে। আমরা দু'জনেই এই স্কুল থেকে পাশ করি। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এবং ভারতের জাতীয় অধ্যাপক* সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন মেজদার সহপাঠী। সত্যেন্দ্রদা আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের এক সুন্দর হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। অনেক সময় তিনি ও মেজদা বারান্দায় বসে গল্প করে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে দিতেন।

মেজদা খেলাধুলা বরাবরই ভালবাসতেন। তিনি ওয়াই. এম্. সি. এ-র কলেজ ষ্ট্রীট্ শাখার সভ্য হন্। তখন ওয়াই. এম. সি. এ-র চাঁদা ছিল মাত্র চার আনা (বর্তমান ২৫ পয়সা)। যে কোন বয়সী ছেলে সেখানকার সভ্য হতে পারত। মূক-বধির স্কুলের মাঠে যে সব খেলা হত, আমরা আমাদের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে'সব দেখতাম। এরপর ঐ স্কুলের আরও একটা তলা যখন যোগ হলো, তখন আমাদের খেলাদেখা বন্ধ হয়ে গেল। সেই সময়েই মূক-বধির বিদ্যালয়ের অন্যতম এক প্রতিষ্ঠাতার ছেলে মনোমোহন মজুমদারের সঙ্গে মেজদার পরিচয় হয়। এই মনোমোহনদা'ই পরে মেজদার কাছে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষা নিয়ে স্বামী সত্যানন্দ নামে পরিচিত হন। মনোমোহনদা অনেক সময় মেজদা আর আমাকে ওঁদের স্কুলের মাঠে নিয়ে যেতেন এবং সেখানকার ছেলেদের সংগে অনুশীলনের সুবিধে করে দিতেন। এর ফলে স্কুলের অনেক

* বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে ভারত সরকার অবসরপ্রাপ্ত বরেণ্য অধ্যাপক-দের এই সম্মানে ভূষিত করেন। সম্মানসূচক খেতাব ছাড়াও তাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের জন্য বৃত্তি-ও পেয়ে থাকেন। ভারত স্বাধীন হবার পর থেকেই এই ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। বৃটিশ রাজত্বে সম্মানীয় অধ্যাপকদের 'নাইট' উপাধি দান করা হত। 'জাতীয় অধ্যাপক' এই রকমই এক সম্মানজনক উপাধি।

প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আমরা অনেক ভাল ভাল পুরস্কার লাভের সুযোগ পেয়েছিলাম।

আমাদের বাড়ীর কাছে এখন যে লেডিজ্ পার্কটি রয়েছে তখন তার নাম ছিল গ্রীয়ার পার্ক। ঐ মাঠের পাশেই, লক্ষ্মীবিলাস তেল প্রস্তুতকারকের বাড়ীতে ছিল গ্রীয়ার ক্লাব। ক্লাবের খেলা হয়ে যাবার পর মেজদা আরও অনেকের সংগে আমাকেও দৌড় আর অন্যান্য রেসের অনুশীলন করাতেন। তারপর দম বাড়াবার জন্যে মাঠের ধার ধরে ১০/১৫ বার ঘুরতেন এবং আমরা ছোটরাও কয়েকপাক ঘুরতাম।

এছাড়া মেজদা মার্কাস স্কোয়ারে ওয়াই. এম. সি. এ আয়োজিত কয়েকটি দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে অনেকগুলি পুরস্কার লাভ করেন। একটা ঘটনার কথা আজও আমার বেশ মনে আছে। আমি তখন মেজদার জামা আর জুতো নিয়ে মাঠের ধারে বসে খেলা দেখছি। অন্যান্য প্রতিযোগীরা কিছুটা ছোটাছুটি করে শরীর গরম করে নিচ্ছে। তারা সকলেই রানিং স্যু আর সর্টস পরেছিল। মেজদার গায়ে ছিল গেঞ্জি আর পরনের ধুতিটা মালকোঁচা দিয়ে হাঁটু পর্য্যন্ত তোলা। পায়ে কোন জুতো ছিল না।

মেজদা মাত্র দুটি বিষয়ে নাম দিয়েছিলেন—৪৪০ ও ৮৮০ গজ দৌড়। সকলকে অবাক্ করে তিনি ৪৪০ গজ দৌড়ে প্রথম হয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ৮৮০ গজ দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হলো। প্রথমে মেজদা তিন চার-জনের পেছনে ছুটছিলেন। কিন্তু তারপর প্রতিপাক শেষে এক একজনকে পেছনে ফেলে রেখে শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হলেন।

হাততালি আর হাততালি—সবার মুখেই বাহবা। সকলেরই প্রশ্ন—কে এই ছেলেটি? প্রতিযোগিতার উদ্যোগীদের মুখে অবাক বিস্ময়ের ছাপ। মেজদা আমার দিকে চেয়ে স্মিত হাসলেন। অন্যান্য বারের চ্যাম্পিয়ানদের মন বিস্ময়ে বিহ্বল আর হতাশায় ভারী। কি করে এই অজানা অখ্যাত ছেলেটি ওদের এমন করে বোকা বানাল? ৪৪০ গজ দৌড়ে প্রথম হওয়ার জন্য মেজদা পুরস্কার স্বরূপ একটা এয়ার গান্ এবং আধ মাইল দৌড়ের বিজয়ীর পুরস্কার হিসাবে কাট্‌গ্লাসের দোয়াতদান উপহার পান। (পরে একদিন ঐ এয়ার গান্ নিয়ে নিশানা প্র্যাকটিস্ করতে গিয়ে তিনি অজান্তে একটা চড়াই পাখি মেরে ফেলেন। ক্ষোভে দুঃখে মেজদা ঐ বন্দুকটাকে ভেঙ্গে ফেলেন। বিষ্ণু আর আমি অনেক অনুরোধ করেছিলাম বন্দুকটা আমাদের দিয়ে দিতে, কিন্তু মেজদা দেন নি—কারণ তিনি নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন ঐ বন্দুক থেকে কখনও যেন কারোর ক্ষতি না হয়।)

এই এক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েই মেজদা রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। কিন্তু অনেকেরই তা সহ্য হলো না। অন্যান্যবারের নাম করা চ্যাম্পিয়নরা এই গ্রীয়ার পার্কেই আর একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন—উদ্দেশ্য মেজদাকে হারান। সেদিন আমার মত ছোট ছেলের কাছেও ওদের ঐ প্রচেষ্টা হাস্যকর বলে মনে হয়েছিল। প্রত্যেকটি বিষয়েই মেজদার কাছে ওঁরা আগের বারের চেয়েও অনেক বেশী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন।

দুঃখের কথা এই যে, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা খেলোয়াড়ি মনোভাব ছাড়াই খেলোয়াড় হতে চেয়েছিলেন।

মেজদার সেদিনকার সাফল্য ছোট ভাই বিষ্ণু এবং আমার মনে খেলাধুলার দিকে ঝোঁক বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারই ফলে প্রতি বছর হিন্দু স্কুলের বার্ষিক খেলাধুলা প্রতিযোগিতায় আমরা এত পুরস্কার পেতাম যে সেই সব বয়ে নিয়ে আসার জন্যে বাড়ী থেকে একজন চাকর নিয়ে যেতে হতো।

মেজদা একবার নিজেই উদ্যোগী হয়ে গ্রীয়ার পার্কে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। প্রতিযোগিতার পরিচালন ব্যবস্থা ছিল সুসংবদ্ধ ও নিখুঁত। সমস্ত বিষয়েই আগাগোড়া এক নিরপেক্ষ আবহাওয়া বজায় ছিল। খেলায় ছোট, মাঝারী এবং বড়দের তিনটি বিভাগ ছিল। প্রতিযোগী এবং দর্শক—সকলেই মেজদার ব্যবস্থাপনা দেখে খুশী হয়েছিলেন।

অনেকেই মেজদাকে প্রতি বছর ঐ রকম প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে অনুরোধ করেছিলেন। প্রতি বছর দৃষ্টান্তকারী এ রকম প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করার কথা তিনিও মনে মনে ভেবেছিলেন। কিন্তু তিনি পারেন নি, কারণ খেলাধুলার প্রতিযোগিতা আয়োজনকারী কিছু কিছু প্রতিষ্ঠিত সংস্থা তাঁর সংগে অসহযোগিতা এবং অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল। একটা অহেতুক জেদাজেদির প্রশ্ন যেন সামনে এসে দাঁড়াল। তাছাড়া তিনি মনে খুব দুঃখও পেয়েছিলেন ; সত্যকারের ক্রীড়ানুরাগীরা নিঃস্বার্থ মানসিকতা নিয়ে কেউই সেদিন তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান নি। তিনি ওঁদের সঙ্গে কোন রকম ঝগড়া-ঝাঁটিতে জড়িয়ে পড়্‌তে চান নি ব্‌লে নিজেই সব কিছু থেকে সরে দাঁড়ালেন।

ইতিমধ্যে হঠাৎ মেজদা স্থির করলেন কুস্তি শিখবেন। গড়পার রোডের উপরেই এথিনিয়াম স্কুলের এক বিশালদেহী দারোয়ানের একটি কুস্তির আখড়া ছিল। নানান্ জায়গা থেকে অনেকে এসে সেখানে কুস্তি অভ্যাস করতো। মেজদা আমাদের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে রোজ সকালে আখড়ায় যেতেন। অবাক্ বিস্ময়ে আমরা কুস্তি দেখতাম। লড়তে গিয়ে যে পালোয়ান অসুবিধায় পড়েছে, মেজদা তাকে মাঝে মাঝে এমন সব প্যাঁচের কথা বলে দিতেন যে, সেই কায়দা কাজে লাগিয়ে সে জিতে যেতো। তারপর লড়াই শেষ হলে তারা মেজদাকে কাছে বসিয়ে ভেজা ছোলা আর গরম জিলিপি একরকম জোর করেই খাওয়াতো। পরিচয় ঘনিষ্ট হলে মেজদা একদিন ওদের বললেন, 'আমাকে আপনাদের কুস্তি শেখাবেন ?'

ওরা তো অবাক। ভাবতেই পারে না ভদ্রলোকের ছেলে কুস্তি শিখবে কেন। ছেলেটি মস্করা করছে না তো ? মেজদা তাদের আশ্বস্ত করে বলেন যে বাস্তবিকই তিনি শিখতে ইচ্ছুক। তখন একজন আধা হিন্দী আধা বাংলা মিশিয়ে বলল, "একি তুম হি বলছে খোকাবাবু ? তুমহি তো বহুত রোজ হামাদের এ করো ও করো বোলকে জিতা দিয়া—নেহি বাবা তোম্ হামাদের সাথ দিল্লাগি কোরছো।" মেজদা যত বলেন কুস্তির তিনি কিছুই জানেন না ওরা ততই বলে—তাহলে তিনি কি করে প্যাঁচ বলে দিতেন, শেখাতেন।

যাই হোক্‌ অনেক কষ্টে শেষে মেজদা ওদের বোঝাতে পারেন যে কুস্তির ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হঠাৎ হঠাৎ প্যাঁচগুলির কথা মনে হত আর তিনিও দুমদাম্‌ তা বলে দিতেন। ওরা শেষ পর্য্যন্ত রাজী হয় ওঁকে শেখাতে। একদিন তিনি আমাকেও কুস্তি শেখবার জন্য আখড়ায় নিয়ে গেলেন।

এর বোধহয় দিন পনেরো পরে শিশির নামে মেজদার এক বন্ধু তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত। বাতের যন্ত্রণায় তিনি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন। মেজদার কাছে আসার আগে শিশিরদা নাকি বহু চিকিৎসা করিয়েছিলেন ; কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। যেদিন মেজদার সংগে দেখা করতে আসেন তার আগের রাতে তিনি স্বপ্নের ঘোরে শুনতে পান কে যেন বলছেন, "কালই তুমি মুকুন্দর সংগে দেখা কর। ওই পারে তোমাকে সম্পূর্ণ ভাল করে তুলতে।" মেজদা প্রথমে তাঁকে বাবার কাছে শেখা লাহিড়ী মহাশয় নির্দ্দেশিত ক্রিয়াযোগ পদ্ধতি শেখান এবং নিয়মিত অনুশীলন করতে বলেন। ক্রমশঃ শিশিরদার অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। তারপর মেজদা তাঁকে আখড়ায় নিয়ে আসেন এবং শরীরের পেশী সঞ্চালনের মাধ্যমে শিরা উপশিরা দিয়ে রক্ত চলাচল যাতে স্বাভাবিক হতে পারে তারজন্য বিশেষ পদ্ধতি শেখান। কয়েক মাসের মধ্যেই শিশিরদা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

শিশিরদা পরে বলেছিলেন, "মুকুন্দ, সেদিন রাতে যদি তোমাকে স্বপ্নে না দেখতাম ও সেই কথাগুলি শুনতাম, তবে আমার কাছে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর অন্য কোন পথ খোলা থাকত না। কারণ পঙ্গু এবং অপরের ভার হয়ে জীবনে বেঁচে থাকাটা আমার কাছে একটা অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

অধ্যাত্মপথের নতুন সাথী

নভেম্বর মাসের শেষাশেষি হবে। যেদিনকার কথা বলছি সেদিন মেজদাদের ক্লাবের একটা ফুটবল ম্যাচ ছিল। বিকেল চারটে বেজে গেছে। ফুটবল ব্লাডারে হাওয়া ভরতে গিয়ে আমাদের পাম্পটা হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়। তাতে সবাই খুব মুশকিলে পড়ে যাই। দলের একজন সভ্য হিসেবে মেজদা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ফুটবলের পাম্প আছে কাছাকাছি এমন কারুর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে কি না। যে দু একজনের সঙ্গে পরিচয় ছিল তাদের সঙ্গে দেখা করে চাইলাম—কিন্তু কেউই দিল না। মেজদার মতে ওরা ভাল ছেলে নয় বলে আমাদের দলে ওদের স্থান হয়নি। কাছাকাছি আবার কোন সাইকেলের দোকানও ছিল না।

মনোমোহনদা তখন স্কুলের ছাত্র। তাঁর এক বন্ধু ছিল নাম কালীনাথ সরকার। তিনি থাকতেন সায়েন্স কলেজের পাশে পার্শীবাগান লেনে। কালী-

নাথদার সঙ্গে মেজদারও পরিচয় ছিল। তিনিও আমাদের টিমের একজন সভ্য ছিলেন।

কালীনাথদা বললেন, "দূর, চল তো মনোমোহনের কাছে যাই। ওদের স্কুলের পাম্পটা দিয়ে এখনকার মত কাজ চালিয়ে নি, পরে দেখা যাবে।" আমরা দল বেঁধে হাজির হলাম ডেফ্ এণ্ড ডাম্ব স্কুলের গেটে। মনোমোহনদা দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। কালীনাথদা ওঁকে বললেন, "এই যে ভাই মনো, তোমাকে বাইরেই পেয়ে গেলাম, ভালই হল।"

মনোমোহনদা জিজ্ঞাসা করলেন, "এই রোদ্দুরে দল বেঁধে চলেছ কোথায়, খেলতে নাকি?"

কালীনাথদা বললেন, "আর ভাই বলো কেন!" তারপর মেজদাকে দেখিয়ে বললেন, "এর নাম মুকুন্দ—মুকুন্দলাল ঘোষ—আমাদের ক্যাপটেন। সুকিয়া ষ্ট্রীটের ছেলেরা ওকে চ্যালেঞ্জ করেছে—আমাদের হারাবেই। মুকুন্দও বলে এসেছে—'তোমাদের জার্সি খুলে নেব, তবেই আমার নাম।"

মনোমোহনদা মেজদার মুখের দিকে অপলকে চেয়ে রইলেন—মনে হল, দু'জনেই যেন দু'জনের প্রতি এক অভিনব আকর্ষণ অনুভব করছেন। এ আকর্ষণ বয়সের বাধা মানে না বড় ছোট প্রভেদ স্বীকার করে না। এই আকর্ষণ নিষ্কলুষ নিষ্পাপ দুটি হৃদয়ের নিবিড় একাত্মতার আকর্ষণ।

কালীনাথদা দু'জনকে একটুখানি লক্ষ্য করে তারপরে বললেন, "আমাদের পাম্পটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেছে—কিছুতেই হাওয়া বেরোচ্ছে না। তোমাদের স্কুলেরটি একবার দিতে পার? তা না হলে আর মান-ইজ্জত থাকবে না—কাউকে মুখ দেখাতেও পারব না।"

মেজদার দিকে তাকিয়ে মনোমোহনদা বললেন, "তার মানে? এঁর কথার নড়চড় হবে? তা হতেই পারে না। এস...." বলে মেজদা আর কালীনাথদাকে স্কুলের ভেতরে নিয়ে গেলেন। আমিও সঙ্গে গেলুম।

সেই থেকে মনোমোহনদা আর মেজদা হয়ে উঠলেন দুই ঘনিষ্ট বন্ধু। একদিন সন্ধ্যেবেলা খেলার পর বন্ধুরা সব যে যার চলে গেলেন। শুধু মনো-মোহনদা ওঁর মেজ ভাই মুকুল, মেজদা আর আমি হাঁটতে হাঁটতে ফিরছি। তখন আপার সার্কুলার রোডের পূব দিকের ফুটপাতটা ছিল রেল লাইনের ধার ঘেঁসে। কোলকাতা করপোরেশনের জঞ্জালের ট্রেন চলত। সূর্য্যাস্তের শেষ আলোয় পশ্চিম আকাশে রঙয়ের মাখামাখি। টুকরো টুকরো মেঘগুলিকে দেখাচ্ছিল যেন এক একটা পাহাড় বা সমুদ্রের বেলাভূমি কিম্বা জন্তু জানোয়ারের মত। মেজদার মন কিন্তু তখন চলে গিয়েছে অনেক দূরে হিমালয়ের দিকে। মনোমোহনদাকে বললেন, "একবার মনে মনে কল্পনা করতো হিমালয়ের কথা যেখানে সাধু সন্ন্যাসীরা গুহায় গুহায় তপস্যায় নিমগ্ন হয়ে আছেন। যুগ যুগান্ত ধরে চলেছে মানুষের মুক্তির জন্য তাঁদের ধ্যান ও তপস্যা। আমি দেখতে পাচ্ছি হিমালয়ের ঐ আধ্যাত্মিক ভাব বাড়তে বাড়তে অনন্তের পথে

ওম্*-কারে মিশে যাচ্ছে। মনে হয় নাগাধিরাজ যেন তাঁর ভুবনমোহন রূপ নিয়ে আমাকে ডাকছেন।"

তারপর একটু থেমে মেজদা আবার বললেন, "এসো, আমরা তাঁদের পথ অনুসরণ করি। আমি তোমাকে সেই 'সাধন' শিখিয়ে দেব। কিন্তু এ পথে বাধা অনেক। অনেকের অনেক কটূক্তি শুনতে হবে, অনেকের সঙ্গে অহেতুক মন কষাকষিও হবে। বাড়ীর মায়াও একদিন ছাড়তে হবে।"

পরদিন থেকেই মেজদা মনোমোহনদাকে শেখাতে লাগলেন পবিত্র ওম্-কার ধ্বনি শোনা এবং জ্যোতি দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব। মনোমোহনদা মনে মনে মেজদাকে গুরু রূপে বরণ করে নিলেন। এরপর আমাদের গড়পাড় রোডের বাড়ীতে, দক্ষিণেশ্বরেরর কালী মন্দিরে, বেলুড় মঠে, অমাবস্যার রাতে শ্মশানে দুজনে একসঙ্গে ধ্যানসাধনায় মেতে উঠলেন।

আমরা তিনজনে মা কালীর একটা মূর্তি গড়েছিলাম। মূক-বধির বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ কামিনী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং স্কুলের মাঠে পূজার আয়োজন করেন। পূজা শেষে সব দর্শনার্থীদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মেজদার উৎসাহ ও সমর্থন নিয়ে মনোমোহনদা এবং আমি স্কুল চত্বরের মধ্যে পুকুরের ধারে একটা সাধনগুহা গড়ে তুলি। কাজটা করতে বেশ ক'দিন সময় লেগেছিল, কারণ স্কুলের ছেলেদের খেলাধুলো হয়ে গেলে সকলের অলক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হোত। অবশেষে হিমালয়ের সন্ন্যাসীদের সাধন গুহার মত আমাদেরও সাধন গুহা তৈরী হয়ে গেল। সকলের অজান্তে আমরা সেখানে আরাধনাও করতাম। বেশীদিন কিন্তু এ'রকম চললো না—স্কুল কর্তৃপক্ষ একদিন জানতে পেরে সব কিছু বন্ধ করে দিলেন।

হিমালয়ে পলায়ণ

এদিকে মেজদা যে গুরুর সন্ধানে এবং সাধুসন্তদের সাহচর্য্য পাবার আশায় হিমালয়ে পালাবার ফন্দি আঁটছেন—সেকথা একদম বুঝতে পারি নি। অত্যন্ত সঙ্গোপনে তিনি পালাবার ব্যবস্থা পাকা করছিলেন। শরীর খারাপের অজুহাতে বেশ কয়েকদিন স্কুলে যাচ্ছিলেন না। বেশীর ভাগ সময় নিজের উপাসনা ঘরে থাকতেন। হঠাৎ একদিন বেলা তিনটে নাগাদ বুঝতে পারলাম মেজদা পালিয়েছেন।

সন্ধ্যের দিকে বড়দা ওঁর বন্ধু বান্ধবদের বাড়ীতে খোঁজ করতে আরম্ভ করলেন। প্রথম গেলেন অমরদার বাড়ীতে। সেখানে বাড়ীর বড়দের কাছে শুনলেন যে অমরদাও সেদিন স্কুল থেকে ফেরেনি। পরদিন সকালে বড়দা আবার অমরদার বাড়ী গেলেন। বোধ করি অমরদার বাবা বড়দাকে একটি টাইম

* মহাজাগতিক সৃষ্টির অনুরণন; খ্রীষ্টীয় বাইবেল গ্রন্থে একেই 'আমেন' এবং 'দি ওয়ার্ড' বা 'শব্দ' বলা হয়েছে।

টেবিল দেখিয়েছিলেন—সেখানে বিশেষ কয়েকটি জায়গায় দাগ দেওয়া রয়েছে। হিমালয়ের পাদদেশে পবিত্র তীর্থ হরিদ্বারে পেঁছিতে যে সব জায়গায় ট্রেন বদল করতে হয়, সেগুলি টাইম টেবিলে দাগ দেওয়া রয়েছে। অমরদার বাবা রোজ ঘোড়ার গাড়ীতে অফিস যাবার সময় অমরদাকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে যেতেন। সেদিন অমরদাকে না দেখে কোচোয়ান বললেন, "খোকা বাবু কোথায়? স্কুলে যাবে না?" তখন অমরদার বাবা তাকে বললেন—অমর পালিয়েছে। তাতে সেই কোচোয়ান বলল যে গতকাল আর একজন গাড়োয়ান তাকে বলেছিল যে ছোট সাহেবের সঙ্গে আরও দু'জন সাহেবকে সে হাওড়া স্টেশনে পেঁছে দিয়েছে। তিনটি সূত্র বড়দা পেলেন—এক, মেজদারা দলে তিনজন, দুই-তারা সাহেবী পোষাক পরেছে আর তিন, টাইম টেবিলে চিহ্নিত জায়গা।

তারপর বড়দা বাড়ী এসে টাইম টেবিলে চিহ্নিত জায়গাতে পুলিশ কর্তৃপক্ষ আর স্টেশন মাস্টারের কাছে টেলিগ্রাম করলেন। টেলিগ্রামটা ছিল এই রকম—মোগলসরাই হয়ে হরিদ্বারের দিকে সাহেবী পোষাকে তিনজন বাঙালী ছেলে পালাচ্ছে। তাদের আটকে রাখুন। উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে। বেরিলীতে বন্ধু দ্বারকাপ্রসাদকেও টেলিগ্রামে খবরটা জানান হলো।

তিনজন পলাতকের মধ্যে দু'জনের খবর জানা গেল, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তিটি কে? আত্মীয়দের বাড়ী বাড়ী খোঁজ নিয়ে জানা গেল—যতীনদা এক রাত বাড়ীর বাইরে থেকে পরদিন সকালে সাহেবী পোষাকে ফিরেছেন। যতীন ঘোষ আত্মীয় হিসাবে আমাদের খুড়তুতো দাদা। ওঁর কাছ থেকে সব খবর পাবার আশায় বড়দা ওঁকে দুপুরে আমাদের বাড়ীতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে এলেন।

দুপুরে যতীনদা এলে বড়দা নিজে তদারক করে লোভনীয় সব খাবার তৈরী করালেন। ঐ সব খাবারের চিন্তা করতে গিয়ে নিকট ভবিষ্যতে যে কোন-রকম বিপদের সম্ভাবনা থাকতে পারে সেকথা যতীনদার মনেই এল না। একবার ভেবেও দেখলেন না যে বড়দা কখনো নিজ প্রকৃতির বাইরে এভাবে, এমন অস্বাভাবিকভাবে, মেলামেশা করেন না।

খাওয়া শেষ হলে বড়দা যতীনদাকে বললেন, 'চলো, একটু ঘুরে আসি'; যতীনদাও কোন সন্দেহ না করেই রাজী হয়ে গেলেন। এমন কি তিনি লক্ষ্যও করলেন না যে বড়দা তাঁকে থানায় যাবার রাস্তা দিয়ে নিয়ে চলেছেন। এরপর যখন সব কিছু বুঝতে পারলেন তখন আর করার কিছু ছিল না। থানায় বড়দা আগে থেকেই বাঘা বাঘা দেখতে কিছু অফিসারকে বেছে রেখেছিলেন। পুলিশের ধমকের দাপটে যতীনদা আগাগোড়া সব স্বীকার করলেন।

"একটি আধ্যাত্মিক প্রেরণায় সত্যিকারের গুরুর সন্ধানে আমাদের হিমালয় যাত্রা। যাবার দিন অমর একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে মুকুন্দের বাড়ীর কাছে অপেক্ষা করতে থাকে। গাড়ির শব্দ শুনে মুকুন্দ ওর কম্বল, খড়ম, লাহিড়ী মশায়ের ছবি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, জপের মালা আর দুটো কৌপীন, পুঁটলি করে ছাদের ছোট পুজার ঘর থেকে জানলা দিয়ে পুব পাশের গলিতে ফেলে দেয় এবং তারপর গাড়িতে এসে ওঠে। অমর আর মুকুন্দ তারপর

স্টেশনে যাবার পথে আমাকে গাড়িতে তুলে নেয়। প্রথমে ওরা চাঁদনী চকের একটা দোকানে যায় ক্যাম্বিসের জুতো কিনতে—কেননা চামড়ার তৈরী সব কিছু জিনিষ বর্জন করতে হবে। ছদ্মবেশ হিসেবে সাহেবী পোষাক পরে নিই। এরপর হাওড়া স্টেশনে পেঁছাই। ঠিক হোল—বর্ধমানে নেমে হরিদ্বারের ট্রেন ধরব।

"গাড়িতে বসে মুকুন্দ বললো, 'ভাব দেখি, গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার পর আমরা কেমন ব্রহ্মানন্দ ভোগ করব। আমাদের মধ্যে এমন শক্তির সৃষ্টি হবে যার তেজে হিমালয়ের সমস্ত পশু আমাদের বশে এসে যাবে। বাঘগুলো হয়ে যাবে পোষা বেড়াল!"

"মুকুন্দর কথায় অমর উল্লসিত হলেও আমার কিন্তু ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেছল। ভাবলাম সেরকম না হয়ে বাঘগুলি যদি অন্য রকম ব্যবহার করে—মনে হচ্ছিল যেন দেখতে পাচ্ছি একটি বাঘ কি ভয়ানক আর বিশ্রীভাবে আমাকে খাচ্ছে। গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে মুখ বার করে খোলা বাতাসে প্রাণের হদিশ পেতে চাইলুম। চুপচাপ বসে থাকাতে ভয় আমার গলাটি টিপে ধরল। ঠিক করলুম—ওদের সঙ্গে আমার যাওয়া চলবে না।"

"তার কিছুক্ষণ পরে বললুম, 'দেখো, সব টাকা আমার কাছে না রেখে তিনজনের মধ্যে ভাগ করে রাখা উচিত। তাছাড়া বর্ধমানে যাবার পর আমার মনে হয় যে যার নিজের টিকিট কেনা উচিত—কারণ কেউ যাতে আমাদের লক্ষ্য না করে সেদিকে সকলকেই খেয়াল রাখতে হবে। ওরা রাজী হলো। তারপর বর্ধমানে নেমে আমি হরিদ্বারের বদলে কলকাতা ফেরার টিকিট কিনে বাড়ী ফিরে এলুম।"

পরের ঘটনাটি মেজদার মুখে শোনা: "বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেল। তবুও যতীনদাকে আসতে না দেখে আমরা প্ল্যাটফর্ম ও স্টেশনের বাইরে খোঁজাখুঁজি করলুম। আমার মনে হয়েছিল সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। অমরকে বললুম যতীনদার ফিরে না আসাটা যেন কিসের এক অমঙ্গল ইঙ্গিত করছে। আমাদের এ যাত্রা সফল হবে না—তারচেয়ে বরঞ্চ কলকাতায় ফিরে যাওয়া যাক্। অমর কিন্তু অত সহজে হার স্বীকার করার পাত্র নয়। তার আশ্বাস শুনে আর সাহস দেখে মনে করলুম—এটিও ভগবানের এক পরীক্ষা।

"ইতিমধ্যে ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল; উঠে পড়লুম গাড়িতে। অমর আমাকে কারুর সাথে কথা বলতে বারণ করল। বলল—কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে সেই উত্তর দেবে। মিনিট দুয়েক বাদে একজন ইংরেজ রেল কর্মচারী ছুটতে ছুটতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন—হাতে একটি টেলিগ্রাম। কয়েক মুহূর্ত আমাদের দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আমরা পালাচ্ছি কি না। আমরা না বলাতে বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করছিলেন আর একজন যে ছিল সে কোথায় গেছে। তারপর আমাদের নাম জিজ্ঞেস করলেন। মুখে যা এল অমর তাই বলে দিল। অমর আমাদের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলে পরিচয় দেওয়াতে এবং তার হাবভাব দেখে ইংরেজ ভদ্রলোক ভাবলেন ছেলেটি বোধহয় সত্যি কথাই

বলছে। বললেন—'এস আমার সঙ্গে'। গেলাম পিছু পিছু। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ—ইউরোপীয়ানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কামরাটিতে আমাদের বসিয়ে দিয়ে চলে গেলেন এবং যাবার সময় বলে গেলেন ঃ 'ভয় নেই, তোমরা বোসো। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে আমার নাম বলবে। আমি এক্ষুণি আসছি।"

"মজার ব্যাপার হলো তখনও পর্য্যন্ত আমরা তাঁর নাম জানি না এবং তিনিও নিজের নাম বলেন নি বা আর আসেনও নি। তাই গাড়ি ছাড়লে ফাঁকা কামরায় আমরা দুজনে বাংলায় আবার কথা বলতে লাগলুম। আমি অমরকে বললুম, 'কেন তুমি দাগ দেওয়া টাইম টেবিলটা বাড়ীতে রেখে এলে ? বড়দা তোমাদের বাড়ী আসবেনই আর টাইম টেবল হাতে পড়লে ঠিক বুঝে নেবেন আমরা কোথায় যাচ্ছি।

"যাই হোক্ বেরিলী এলাম। প্ল্যাটফর্মে দেখি দ্বারকাপ্রসাদ দাঁড়িয়ে। বুঝতে পারলুম বড়দা ওকে জানিয়েছেন আমাদের কথা। আমি ওকে আমাদের সঙ্গী হতে বললাম। সে কি ভেবেছিল জানি না, আমাদের অন্ততঃ পুলিশের হাতে তুলে দিল না। শুধু বলল—বাড়ী যাও মুকুন্দ, বাড়ীতে সকলে চিন্তা করছেন।' কোন উত্তর না দিয়ে আমি কামরায় উঠে পড়লুম। কি করে বড়দার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে হরিদ্বারে এসে পেঁছিলুম। আমরা বুঝতে পারলুম হরিদ্বারেও বড়দার টেলিগ্রাম এসে পেঁাচেছে। ঠিক হলো হৃষীকেশের দিকে যাব। কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম—একজন পুলিশ কর্মচারী একরকম জোর করেই নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ী। কোন উপায় নেই—সবই বড়দার কলকাঠি।

"ঠিক তিনদিন পরে বড়দা আর অমরের দাদা গিয়ে হাজির। বড়দা ভ্রূ-ভঙ্গী করে বললেন—'সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ যদি তোমার ভাল লাগে তো যাও এমন লোকের কাছে যে কিছু জানে। তোমার আসল উদ্দেশ্য আমি যে জানি না তা নয়। কিন্তু এভাবে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়া মানে আত্মীয় স্বজনকে ব্যতিব্যস্ত করা, তাদের আহার নিদ্রা ঘুচিয়ে দেওয়া। মনে হচ্ছে আমরা সকলে যেন তোমার কাছে গরু চুরির দায়ে ধরা পড়েছি।"

"তোমরা গুরুর খোঁজে হিমালয় ঘুরে বেড়াচ্ছ কিন্তু আমি কাশীতে এমন একজনকে জানি যিনি তোমার দিব্য তৃষ্ণা মেটাতে পারেন। ফিরতি পথে তোমাকে কাশীতে তাঁর কাছে নিয়ে যাব। তিনি সাক্ষাত ভগবান ; তাঁর কাছেই জানতে পারবে কোথায় কিভাবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।"*

* মুকুন্দকে সন্ন্যাস জীবনের পথ থেকে সরিয়ে আনার জন্য অনন্ত বেনারসের এক পণ্ডিতের সঙ্গে ফন্দি এ'টেছিলেন, সেকথা পরমহংস যোগানন্দজী তাঁর 'Autobiography of a Yogi' বা 'যোগিকথামৃত' গ্রন্থে লিখেছেন। কিন্তু এখানে লেখক সনন্দলাল ঘোষ যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন সেটি স্বতন্ত্র। অনন্ত তাঁর উৎসাহী ভাইকে গৃহত্যাগে যতভাবে পারেন বাধাদানের চেষ্টা করেছেন। "মেজদা"-র ভূমিকায় আমরা জানতে পারি যে পরমহংসজী ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর আত্মচরিতে নিজের সম্পর্কে অনেক কথাই অনুল্লেখ রেখেছেন।" (প্রকাশকের মন্তব্য)

কাশীতে নেমে বড়দা মেজদাকে নিয়ে গেলেন সেই সাধুর কাছে। ভক্ত আর শিষ্যরা সাধুটিকে ঘিরে বসে আছেন। তাঁর কণামাত্র দাক্ষিণ্য, তাঁর সামান্য চরণধূলির জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব। ঘরখানা দামী ধূপের গন্ধে ভরপুর; তাছাড়া ঘরের চারকোণে বড় বড় পেতলের ফুলদানীতে রয়েছে আতর জল। সাধুর সামনেও বসান রয়েছে একটা পেতলের জলপাত্র—সুগন্ধি মেশানো জলে সেটি ভরা। ভক্ত ও শিষ্যরা তাঁর সেই পাদোদক ভক্তিভরে পান করছেন, মাথায় রাখছেন। সাধু মহারাজ কিন্তু নিমীলিত চোখে গৈরিক রংয়ের রেশমের ঢাকনার ওপর রুপালী জরির পাড় আর চুমকি বসানো তাকিয়াতে ঠেসান দিয়ে আধশোয়া ভঙ্গিতে রয়েছেন। পরণেও তাঁর দামী পোষাক। তিনি যেন পৃথিবী থেকে দূরে, বহু দূরে কোন উচ্চ মার্গে অবস্থান করছেন। মাঝে মাঝে রাঙা চোখ খুলে উল্লসিত ভক্তবৃন্দকে ভর্ৎসনা করছেন—তাঁর ঈশ্বর সাধনায় ব্যাঘাত ঘটছে বলে।

ঈশ্বর যেমন ভক্তবৃন্দের কাছ থেকে নির্লিপ্ত হয়ে দূরে সরে থাকতে পারেন না, তেমনি তিনিও কাউকে চলে যেতে বলছেন না। শুধু বলছেন—"তোমরা আমার সেবা করতে যদি আগ্রহী হয়ে থাক, তবে সেবা কর। কিন্তু কাড়াকাড়ি চেঁচামিচি কোরো না। আমি তো তোমাদের মাঝেই অবস্থান করছি। সময় হলেই আমার করুণা তোমরা পাবে।"

মেজদাকে নিয়ে বড়দা সাধুটির খুব কাছে যাবার চেষ্টা করাতে শিষ্যরা সকলে আপত্তি জানিয়ে ওঠেন। "করছেন কি? দেখছেন না উনি একটু বিশ্রাম করছেন? বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটলে মহারাজ ভীষণ চটে যান।"

বড়দার সরল মন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে, সংশয় জাগে। তবু এতদূর এগিয়ে আর ফিরে যেতে চান্ না। মেজদার হাত নিজের মুঠোয় ধরে জোর করে এগিয়ে যান বড়দা। প্রথমবারে যারা বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, মেজদার দিকে চেয়ে তারাই জায়গা করে দেন। সাধুটির একেবারে কাছে গিয়ে বসলেন ওঁরা দুজনে।

খুব শ্রদ্ধাভরে মোলায়েম সুরে বড়দা বললেন, "মহারাজ, একটু চেয়ে দেখুন; আপনার আশীর্বাদের আশায় ভাইটিকে নিয়ে এসেছি—একবার দেখুন।" মেজদা নত হয়ে প্রণাম করলেন। সাধুটি চোখ খুলে কয়েক মুহূর্ত শান্ত সৌম্য মেজদাকে লক্ষ্য করলেন।

সাধুর শিষ্য আর ভক্তেরা সব অবাক। ভাবখানা যেন—'ছেলেটি তো সবেমাত্র এলো আর এরই মধ্যে বাবার করুণা পেয়ে গেল! আমরা এতদিন ধরে রোজ কত কী দিয়ে সেবা করে চলেছি। আমাদের কারুর জন্যে বাবা কণামাত্র করুণা করলেন না। কি আছে এই পুঁচকে ছোঁড়ার মধ্যে? কি দিয়েছে ও বাবাকে? শুধু একবার একটু প্রণামেই সব দেওয়া হয়ে গেল?'

এমন সময় সাধুটি বাজখাঁই গলায় বলে উঠলেন: "কি হে ছোক্‌রা, তুমি নাকি ভগবান খুঁজে বেড়াচ্ছ? তুমি অন্ধ? দেখতে পাচ্ছ না, এই আমিই সেই ভগবান? আর চিনবেই বা কী করে? তোমার মধ্যে এখনো যে ঘরের টান রয়েছে।"

মেজদার মুখে বিস্ময়ের ছাপ। তবু স্মিত হেঁসে বললেন, "সন্ন্যাসী মহারাজ, একথা আর কখনো বলবেন না যে আপনিই ভগবান।"

মুহূর্ত মধ্যে সাধুর মুখখানা কালো কদাকার হয়ে উঠল। মনে হ'ল কে যেন এক শিশি কালি সাধুর গায়ে ঢেলে দিয়েছে। ছেলেটির ঔদ্ধত্য দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত গতিতে চলতে থাকে।

হঠাৎ মেজদা নিজের ঝোলা থেকে ছোট একটা আয়না বার করে সাধুটির মুখের সামনে ধরে বলে ওঠেনঃ "দেখুন, চেয়ে দেখুন—আপনার এই বিকৃত ক্রুদ্ধ মুখ কি ভগবানের রূপ ধরে রাখতে পারে? যে ঈশ্বরকে আমি প্রতি মুহূর্ত, দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা, মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি—তাঁর অবয়ব কি এমনটি হতে পারে? না, তা কখনই হতে পারে না। তিনি নির্লোভ; তিনি তাঁর ভক্তদের এমন ক'রে প্রবঞ্চনা করেন না। তিনি তাদের লোভকে আরও তুঙ্গ করে তোলেন না। তিনি তাদের আত্মিক জীবনের উন্নতির পথ দেখান। শঠতা, বঞ্চনা দিয়ে আর যাই মিলুক—সত্য মেলে না, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। নিজের অহং-ভাব ত্যাগ না করলে মুক্তি মেলে না।

"নিজের এবং এঁদের অহং-বোধকে বাড়িয়ে তুলে আর ভক্ত ও শিষ্যদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে আপনি আরও তাদের অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দেবেন না। যদি সম্ভব হয় তবে আপনি ওদের আলোয় ফিরে আসার পথ দেখান—মুক্তির আনন্দ অনুভব করার বুদ্ধি দিন। বোঝান ওদের—এই পৃথিবীতে ওদের জীবন অনিত্য; একমাত্র ঈশ্বরই নিত্য ও সত্য। আমরা তাঁরই ইচ্ছাতে মাত্র কদিনের জন্য, ক'টি মুহূর্তের জন্য নতুন পোষাকে খেলা ভাঙার খেলা করে চলেছি। আমরা নিরাবরণ হয়ে এসেছি, নিরাবরণ হয়েই তাঁর বিরাটত্বে বিলীন হয়ে যাব। আমাদের নিজস্ব বলে কোন বস্তু নেই—সবই তিনি, সবই তাঁর এবং আমরাও তাঁর-ই। ওদের বোঝান—যা কিছু আমার আমার বলে ঝগড়া করছি, মারামারি কাটাকাটি করছি, সব বৃথা—সব তাঁর পায়ে নিবেদন করে দিতে হবে। অন্তরের অন্তঃস্থলে যে আত্মাকে আমরা রিপুর তাড়নায় খাঁচায় বন্দী করে রেখেছি, দিনরাত আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধছি, কষে কষে—তা থেকে কেমন করে, কীভাবে মুক্তি পেতে পারি, সে জ্ঞানে ওদের চোখ খুলে দিন—জ্ঞানী করুন। ওদের বোঝান—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, আকাশ, মাটি, জল, দিনরাত, জন্ম-মৃত্যু—সবই তাঁর ইচ্ছা মতো চলছে।

"তাই আমরা যেন একে অন্যের ব্যথা বেদনা, জ্বালা যন্ত্রণার কারণ না হয়ে বরঞ্চ এক মন এক আত্মা হয়ে তাঁর কাছে পার্থিব সব কিছু নিবেদন করার ক্ষমতা অর্জ্জন করতে পারি। তিনিই একমাত্র সত্য আর সেই সত্যের জন্য আমাদের সব ত্যাগ করতে হবে। কারণ অন্য কোন কিছু তাঁর বিনিময় মূল্য হতে পারে না। সেই জ্ঞান পেতে হলে তাঁরই নির্দেশ মত জীবনে পথ চলতে হবে। আর যিনি ঐপথ দেখাতে পারেন, পরম লোভনীয় সেই জ্ঞান দিতে প্যারেন, তিনিই তো প্রকৃত গুরু।"

এই বলে মেজদা উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পা বাড়ালেন। বড়দাও তাঁকে অনুসরণ করলেন।

সাধুটি বজ্রাহতের মত নির্বাক, নিশ্চল। ভূমিকম্পও বুঝি মানুষের মনে এতখানি বিপর্যয় আনে না। মেজদার কথাগুলি তাঁর নিজের সম্বন্ধে ধ্যানধারণাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়িয়ে দিল। একই সঙ্গে বিস্ময় আর আনন্দে তাঁর মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মেজদারা ঘর থেকে বেরোবার আগেই সাধুটি 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' বলে ছুটে এলেন। মেজদার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট হলেও আমি আজ ধন্য। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তুমি আমার অজ্ঞানতাকে দূর করে জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছ।"

"হৃদয় আপনার সত্যিই মহান্, সাধুজী", মেজদা বললেন ; "তা না হলে এত ভক্ত শিষ্যের সামনে কেউ নিজের দুর্বলতা এমনভাবে স্বীকার করতে পারে না। শুধু আর কখনো নিজেকে ভগবানের সঙ্গে তুলনা করবেন না। সাগরের ঢেউ কখনও বলতে পারে না 'আমিই সাগর'। সে শুধু বলতে পারে 'সাগরই ঢেউ'। ভগবান এক বিরাট আলোক সমুদ্র, আর আমরা সেই সমুদ্রের এক একটি তরঙ্গ। মানুষ কেমন করে তার ক্ষুদ্র দেহগণ্ডির মধ্যে সেই বিরাটত্বকে উপলব্ধি করবে? আমাদের সাধ্য কি সেই ক্ষুদ্র জ্ঞানে তাঁর মহিমা বোঝা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণুপরমাণুতে তিনি লীলায়িত। ধ্যানে জ্ঞানে যখন আমরা সেই পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারব, তখনই আমরা পাঁচজনকে সে কথা বলার অধিকার পাব।"

মেজদা পরে আমাদের বলেছিলেন যে বাস্তবিকই তারপর থেকে সাধুটি অহংকারের মোহমুক্ত হয়ে একজন সত্যকারের ঋষিপুরুষ হয়েছিলেন।

স্বামী কেবলানন্দ—মেজদার সংস্কৃত শিক্ষক

মেজদা তাঁর ভবঘুরে স্বভাব, সদ্‌গুরু সন্ধানে অদম্য আগ্রহ, সৎসঙ্গ লাভ ও পবিত্র তীর্থস্থান ঘুরে সময় কাটানোর জন্য পড়াশুনায় খুবই ঢিলেমি দিচ্ছিলেন। বাবা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং এ সম্বন্ধে বড়দার সঙ্গে পরামর্শও করেন। তাঁরা ঠিক করলেন একজন গৃহশিক্ষক নিয়োগ করবেন যিনি মেজদাকে পাঠ্য বিষয় শেখানর সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক তৃষ্ণাও মেটাতে পারবেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে এইভাবে মেজদার মনে হিমালয়ের আকর্ষণ ক্রমে ক্রমে কমে আসবে। সেইজন্য বাবা সংস্কৃত ভাষার সত্যিকারের একজন পণ্ডিত শ্রী আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে মেজদার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করলেন। সকলেই তাঁকে শাস্ত্রী মশায় বলে সম্বোধন করতেন। শাস্ত্রী মশায় শুধু একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতই নন—তিনি ছিলেন লাহিড়ী মশায়ের একজন প্রিয় ও উন্নত শিষ্য। বাবা অবশ্য সেকথা জানতেন না। লাহিড়ী মশায় নিজেও শাস্ত্রী মশায়কে 'ঋষি' বলে সম্বোধন করতেন। পরে যখন বাবা তাঁর প্রকৃত

পরিচয় জানতে পারেন তখন নিজ অজ্ঞতার জন্য তাঁর কাছে অনুতাপ প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে নেন।

প্রথম থেকেই শাস্ত্রী মশায় ও মেজদা মনে মনে পরস্পরের প্রতি আত্মিক সম্বন্ধ উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা পরস্পর নিজেদের সাধন প্রক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা করতেন। মেজদা শাস্ত্রীজীকে তাঁর শব্দ ও জ্যোতি ধ্যানের কথাও বলেছিলেন। তাছাড়া তাঁরা বেদ পুরাণের মত প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের বিষয়ে কথা বলতেন। শাস্ত্রী মশায় তাঁর জানা ভারতের মহা ঋষিদের কাহিনী মেজদাকে শোনাতেন এবং সেইসব মহাজন নির্দেশিত পথ অনুসরণ করার জন্য মেজদাকে উৎসাহিত করতেন। সকলের অজ্ঞাতে পড়ার ঘরে (বর্তমান অ্যাটিক রুম) উভয়ের ক্রিয়াযোগ' সাধনা এগিয়ে চলতে থাকল। লাহিড়ী মশায় নির্দেশিত ক্রিয়াযোগ (মহামুদ্রা, জ্যোতি মুদ্রা সহ) অভ্যাস করার ব্যাপারে তিনি মেজদাকে সাহায্য করতেন। মেজদা ঐ সব মুদ্রা বাবার কাছ থেকে আগেই শিখেছিলেন। ঋষিপ্রতিম শাস্ত্রী মশায় 'প্রাণায়াম' সম্বন্ধে মেজদার জ্ঞান আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়া প্রাণ ও চৈতন্যকে গভীর ধ্যান সাধনার সময় কি করে ইন্দ্রিয়, শিরা উপশিরা ও মেরুদণ্ড থেকে 'সুষুম্না' কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হয়—সে শিক্ষাও তিনি দিয়েছিলেন।

শ্বাস ও প্রাণের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক তাই হলো 'ক্রিয়াযোগ' সাধনার মূল ভিত্তি। 'ক্রিয়া' অভ্যাসের ফলে শ্বাসের ওপর নিয়ন্ত্রণ আসে যা তাকে সূক্ষ্ম প্রাণবায়ুতে রূপান্তরিত করে মনুষ্যকে দেহধারণে শক্তি যোগায়। এই প্রাণশক্তির অভাব মানেই অবধারিত মৃত্যু। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই প্রাণশক্তি স্বভাবতই অসংযমী ; তা শ্বাসক্রিয়া ও সংখ্যাতীত ইন্দ্রিয়ানুভূতির সংগে জড়িত। 'ক্রিয়া' অভ্যাসের সাহায্যে স্বাভাবিক উপায়ে প্রাণশক্তি ও মনকে স্থিরতায় আনার দক্ষতা অর্জন করা যায়। এর ফলে এক সময় শ্বাস-প্রশ্বাসকে স্তব্ধও করা যায়—যা অতীব আধ্যাত্মিক আনন্দদায়ক। এই স্থিরতার নামই যোগ অর্থাৎ, আত্মা ও পরমাত্মার মিলন। এই 'যোগ' থেকেই আসে শান্তম, শিবম্ এবং অদ্বৈত ভাব।

এই শান্তম অবস্থাই মনেতে জাগিয়ে তোলে অনাবিল আনন্দ। তবে মনে রাখতে হবে এই আনন্দের মধ্যে পার্থিব সুখের উত্তেজনা নেই। দেহ ও মনকে বিশ্বাত্মার উপলব্ধি লাভের উপযুক্ত আধার করে গড়ে তোলার জন্য 'ক্রিয়াযোগে'র মত সাধন প্রক্রিয়া দরকার। তাতে সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ হয়। গুরুই সেই পরমানন্দ লাভের দিশারী হতে পারেন।

এই ঐশ্বরিক প্রেমলাভ হলে পর সর্বভূতে প্রেমানুভূতি জাগে—মরণ শমনের ভয় দূর হয়। জীবনে আসে শান্তি, আসে আনন্দ, স্ফূর্তি। তাই ক্রিয়াযোগ স্নায়ুর ওপরে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে শারীরিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্থিরতাও আনে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মত মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা ও সাহচর্য্য লাভ করে মেজদার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও উন্নতি ত্বরান্বিত হয়েছিল। এর কয়েক বছর পরে শাস্ত্রীজী সন্ন্যাস গ্রহণ করে 'স্বামী' সম্প্রদায়ভুক্ত হন এবং স্বামী কেবলানন্দ নামে খ্যাতিলাভ করেন।

শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়—একটি কাহিনী

যাঁরা মহামুনি মহাঋষি, তাঁরা সব সময়ে তাঁদের সাধন শক্তিকে গোপন করে রাখেন, কেননা সেই মহাশক্তি স্থূল বস্তুজগতের কাজে প্রয়োগ করা হলে তা বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। লাহিড়ী মশায়ের জীবনের একটা ঘটনার কথা শাস্ত্রী মশায় একবার আমাকে বলেছিলেন। ঘটনাটি এই রকম ঃ

একবার কাশীতে শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়িতে শাস্ত্রী মশায় খাওয়ার নিমন্ত্রণ পান। একটি কাঠের পিঁড়িতে লাহিড়ী মহাশয় বসে আছেন, আর সামনের সারিতে খাচ্ছেন শ্রীযুক্তেশ্বরজী, শাস্ত্রী মশাই ও লাহিড়ী মহাশয়ের দুই ছেলে তিনকড়ি ও দুকড়ি লাহিড়ী। ঐ সময় বাড়ীর একটা বিড়াল অল্প-দূরে লাহিড়ী মহাশয়ের ডানদিকে বসে ছিল। সে কেবল তাঁর পাতের কাছে আসবার চেষ্টা করছিল। লাহিড়ী মহাশয় অন্যমনস্ক ভাবে হাত নেড়ে বেড়াল-টাকে সরে যেতে বললেন। বেড়ালটা যদিও লাহিড়ী মহাশয়ের কাছ থেকে একহাত তফাতে ছিল তবুও লাহিড়ী মহাশয় শুধু হাত বাড়াতেই বেড়ালটা ছিট্‌কে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। সকলেই অবাক হয়ে গেলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা লাহিড়ী মহাশয় তাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নি!

যাই হোক্, লাহিড়ী মহাশয় কিছু দুধ নিজের পাতে ঢেলে নিয়ে দুধের বাটিতে কিছু ভাত মেখে উঠে গিয়ে বেড়ালের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেই তার সংজ্ঞা ফিরে এল। তখন লাহিড়ী মহাশয় তাকে দুধভাত খাওয়াতে লাগলেন। বিড়ালের খাওয়া শেষ হলে আবার তিনি খেতে বসলেন।

সামনের সারিতে বসা সকলেই তাঁর শক্তির পরিচয় পেয়ে অবাক। লাহিড়ী মহাশয় নিজে কিন্তু মাথা নিচু করে চুপচাপ খেতে লাগলেন—মনে হতে লাগল যেন কত অন্যায় করে ফেলেছেন।

সঙ্গীত প্রেমী মেজদা

যে কোন গান মেজদা অনায়াসে নিজের গলায় তুলে নিতে পারতেন। তিনি সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন এবং গান গাইতে ভালবাসতেন। বন্ধু-বান্ধবকে অনেক সময় বলতে শুনেছি—'এই মুকুন্দ গান শোনাও না ভাই" ; মেজদাও তখন দরাজ গলায় গাইতেন কালী-কীর্তন, নয়ত শ্যামা সঙ্গীত কিংবা ভজন অথবা রবীন্দ্র সঙ্গীত।

মেজদার গান শুনে বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ বলতো "আরে বাবা, ক'দিন আর বাঁচব! এখন থেকেই যদি মা, মা করতে থাকি তবে কবে আর সুন্দর জিনিষগুলো উপভোগ করব!"

এদের কথা শুনে মেজদা হাসতেন ; তবে সেই সঙ্গে তাদের মনের অজ্ঞতা দেখে উনি দুঃখও পেতেন। তাই বলতেন, "অন্ধকার থেকে হঠাৎ বাইরে এলে

আলোর ঝলকানি যেমন চোখে ধাঁধা লাগায়, তেমনি আসল সৌন্দর্য্যের মাঝে কিছু ঝিলিক লাগানো পার্থিব সম্পদ তোমাদের মনে বিভ্রম আনছে।"

সমস্বরে ওরা প্রতিবাদ করে বলতেন: "দেখ মুকুন্দ, তোমার ওই জ্ঞানের কচ্‌কচানি একটু থামাও।"

আবার মেজদা হেসে বলতেন: "ঠিক আছে ভাই, তবে শুধু এটুকু বলছি—দূর থেকে যাকে খুব সুন্দর মনে হয়, কাছে গিয়ে দেখলে বুঝতে পারবে পার্থিব ঐ সৌন্দর্যের সত্যিকারে কানাকড়িও দাম নেই। ব্যাপারটি পরখ্ করে নিতে ভুলো না যেন।"

একদিন বন্ধুরা মেজদাকে বলেছিলেন: "দেখো মুকুন্দ, তুমি কোন ওস্তাদের কাছে রেওয়াজ কর। মনে হয় তাহলে তুমি একদিন উঁচু দরের সঙ্গীত শিল্পী হতে পারবে—আর আমরাও আরো ভাল গান শুনতে পাব।

মেজদার মনে হলো, "সত্যিই তো, মহামায়ার ক'খানা গানই বা আমি জানি। আরও অনেক শিখতে হবে—আরো সুন্দর করে গাইতে হবে।" একদিন দেখলুম মেজদা ভাল একটি এস্‌রাজ, হারমোনিয়াম এবং তবলা কিনে আনলেন। এখানকার এক ওস্তাদজীও আসতে লাগলেন পরদিন থেকে।

বন্ধুদের উৎসাহ এবং মেজদার নিষ্ঠা যে ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ ভবিষ্যৎ জীবনে করা তাঁর গানের রেকর্ডগুলি। মেজদার প্রিয় সংগীতগুলির মধ্যে একটি হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'মন্দিরে মম কে'—এই গানখানি। পশ্চিমী ছাত্রদের সুবিধার জন্য পরে তিনি গানখানি ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন। এই বিশেষ গানটি আমিই মেজদাকে শিখিয়েছিলাম এবং আমি নিজে শিখেছি আমার এক স্কুলের বন্ধু, প্রয়াত সঙ্গীতজ্ঞ লালচাঁদ বড়াল মশায়ের বড় ছেলে কিষেণচাঁদ বড়ালের কাছ থেকে। যে কোন গানে সুরের মূর্ছনার সংগে ভাবযোগ না হলে কোন সৌন্দর্য্য ফোটে না। মেজদার ভজন গানের মধ্যে সুর ব্যঞ্জনার সংগে ভাব ব্যঞ্জনার একাত্মতাই শ্রোতাদের মুগ্ধ বিস্ময়ে পুলকিত করত।

মেজদা যখন রেওয়াজ করতেন তখন আমি তাঁর পাশে বসে মনে মনে সুরগুলি ভাঁজতুম। ছেলে মানুষ আমি, ঠিকমত বাজাতে পারব না—কখন কোনটি নষ্ট করে ফেলব, এই ভেবে তিনি হারমোনিয়মে তালা ঝুলিয়ে রাখতেন। একদিন বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন তালা লাগাতে। আমিও ঐ সুযোগে মেজদার ফেরার সময় আন্দাজ করে, হারমোনিয়ামটি বাক্‌স থেকে বার করে কোলের কাছে টেনে নিয়ে ওস্তাদি কায়দায় চোখ বুঁজে মেজাজে গলা সাধছি—বুঝতেই পারিনি মেজদা কখন পেছনে এসে চুপটি করে সব লক্ষ্য করছেন। হঠাৎ ওঁর গলা খাঁকারি শুনে চমকে উঠি। তিনি গলার স্বর খুব গম্ভীর করে বললেন: "কার কাছে হারমোনিয়াম বাজাতে শিখলে?"

আমি বললুম, "তুমি যখন গৎ সাধতে তখন পাশে বসে লক্ষ্য করতুম রিডগুলি কিভাবে সাজানো। তারপর সকলের আড়ালে একখানা কাগজে রিডগুলি এঁকে নিয়ে তাতে আঙুল বসিয়ে বসিয়ে গলা সাধতুম।"

আমার ঐকান্তিক সাধনার তারিফ করে মেজদা বলেছিলেন : "তোমার গলায় সুর আছে। এক কাজ করি এসো—কাল সকাল থেকে আমরা দু'ভায়ে একসঙ্গে মিলে গলা সাধব।" মেজদার উৎসাহ আর আমার চেষ্টা ও সাধনার ফলে ভক্তিমূলক সঙ্গীতে পারদর্শিতা অর্জন করি এবং এখনও পর্যন্ত ঐ ধরণের গান করে আনন্দ পাই।

একদিন মেজদার ওস্তাদের ভাই এলো আমাদের বাড়ী। মেজদা তখন বাড়ী ছিলেন না। ছেলেটি বললো : "শোন, তোমার মেজদা গানের আসরে রয়েছেন—আসতে পারছেন না। সকলে মিলে ওঁকে ধরেছেন মায়ের নামগান শোনাতে হবে। তাই আমাকে এস্‌রাজটি নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন।"

বোকার মতন সরল বিশ্বাসে আমিও কিছু না জেনে বা কাউকে জিজ্ঞাসা না করে ছেলেটিকে এস্‌রাজটি দিয়েদিলুম। বাড়ী ফিরে সমস্ত ব্যাপার শুনে মেজদা তো 'থ'। ছুটে গেলেন ওস্তাদের বাড়ী। কিন্তু কোথায় সেই ভাই? কথায় কথায় ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে কিছুটা মন কষাকষিও হয়ে গেল। মুখ বেজার করে ফিরে এলেন মেজদা,—একবার চেয়ে দেখলেন আমার দিকে। তারপর সোজা চলে গেলেন নিজের উপাসনা ঘরে।

বড়দা শুনে আমাকে তো একচোট খুব বকুনি দিলেন। কি করব, উপায় নেই—যে ভুল করে ফেলেছি তার তো আর প্রতিকার নেই।

বোধহয় দিন দশেক পরে হবে। সুকিয়া ষ্ট্রীট্ আর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের (বর্তমান বিধান সরণী) সংযোগ স্থলে বোস ফার্মেসী থেকে বাড়ীর জন্যে কিছু ওষুধ কিনতে যাচ্ছিলুম। কারণ তখন আমাদের এদিকে ঐটি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন অ্যালপ্যাথি ওষুধের দোকান ছিল না। ওষুধ নিয়ে ফেরার সময় দেখি—রাস্তার ধারে একটি রোয়াকে বসে একজন লোক এসরাজ বাজাচ্ছেন। কিছু ছেলে তাকে ঘিরে বাজনা শুনছে। আমিও দাঁড়িয়ে পড়লুম। এসরাজটা দেখে বিস্ময়ে আমার চক্ষু স্থির। এ যে মেজদার সেই হারানো এসরাজ।

হারানো জিনিষ ফিরে পাওয়ার আনন্দ আর উত্তেজনায় ছুটতে ছুটতে চলে এলাম বাড়ীতে। হাঁফাতে হাঁফাতে কোন রকমে বড়দাকে, মেজদাকে সব কথা বললাম। তারপর গেলাম তিনজনে সেখানে। একটু ভয় দেখাতে লোকটি এবং ওর বন্ধুরা যা বললেন তাতে বোঝা গেল—মেজদার গানের ওস্তাদজীর ভাই মাত্র দশ টাকায় ওটিকে বাঁধা রেখেছেন। তক্ষুণি মেজদা বাড়ী এসে বাবার কাছ থেকে দশটা টাকা নিয়ে এসরাজটি ছাড়ালেন। কপালে ঠেকিয়ে বেশ শব্দ করেই একবার চুমু খেলেন। লোকটি ও তার বন্ধুদের দুটো টাকা দিলেন মিষ্টি খেতে। তখন দু'টাকায় অনেক মিষ্টি পাওয়া যেতো।

অকুতোভয় মেজদা

একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা ইছাপুরে আমাদের দেশের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। সব কিছু কেমন যেন নতুন লাগছিল। দেখতে পেলাম

পরিবর্তনের ছোঁয়া আমাদের গাঁয়েও এসেছে। মেজদার শান্ত সৌম্য চেহারা অনেক ছেলেকেই তাঁর দিকে আকৃষ্ট করল, আবার কেউ কেউ ভাবল—ও যেন উড়ে এসে জুড়ে বসতে চায়। মেজদা বুঝতে পারলেন চট্টগ্রামের মত এখানেও কোন ঘটনা ঘটতে পারে। তাই যারা বেশির ভাগ সময় ওঁকে ঘিরে থাকতেন, তাদের একদিন বললেন: "দেখ ভাই, তোমরা যদি তোমাদের পুরোনো বন্ধুদের ছেড়ে সব সময় আমার সঙ্গেই কাটাও তাহলে ওদের রাগ হতেই পারে। ভাববে, আমি তোমাদের বারণ করেছি মিশতে। ওদের সঙ্গ একেবারে ত্যাগ কোরোনা।"

ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ বলতো: "তুমি ছাড় তো ওদের কথা ; ওরা কি কোনদিন আমাদের বন্ধু ছিল নাকি ? ওদের কাজই হল খালি নষ্টামি করে বেড়ানো। ওদের রাগ কেন জান ? ওদের দলের ছেলে ক্রমশঃ কমছে আর তোমার এবং আমাদের দল বড় হচ্ছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ ওরা কোন ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তারচেয়ে চল ঐ গাছটার নীচে আমরা বসি আর তুমি গল্প বল।" মেজদা এক একদিন ওদের গল্প শোনাতেন আর ওরাও খুব উৎসাহ নিয়ে শুনতো। মজার মজার প্রশ্ন করত, আর সে সবের উত্তর শুনে আনন্দে হাসতে হাসতে ওদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত।

আমরা ইছাপুরে আসার সপ্তাহ তিনেক আগে একটা কালবৈশাখীর ঝড় হয়—তারপর থেকেই চলছে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ। খাল বিল, খানা খন্দ—সব শুকিয়ে গেছে। মাঠের দুর্বাঘাসও রোদে পুড়ে কেমন যেন ফ্যাকাশে হলদে হয়ে গেছে। গরু মোষ—যারা আনন্দে মাঠে মাঠে চরে বেড়িয়ে ঘাস খেত, তারাই রোদের তাপ থেকে বাঁচার জন্যে যেখানে একটু কাদাজল আছে সেখানে ভিড় করে গুঁতোগুঁতি করছে। সবেতেই কেমন যেন একটা ক্লান্তির সুস্পষ্ট ছাপ।

আমরা দুপুরে ঘর ছেড়ে বেরোতাম না—বেরোলে মনে হত যেন সারা শরীর ঝলসে গেল। মেজদার কিন্তু এসবে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ভাবেন 'বাইরে বসেই ঈশ্বরের ধ্যান করব—দেখব সূর্যের এই খরতাপের মধ্যেও ঈশ্বরের প্রতি আমার মন নিশ্চল থাকে কিনা।' বেরিয়ে পড়েন ঘর ছেড়ে খোলা মাঠে। সকলে যখন বলতেন 'ওরে যাস্‌নে, অসুখ করবে', মেজদা যেন তখন হাসি-মুখে বলতেন—'আমারে যে যেতে হবে বারে বারে, দুঃখ-শোক পাথেয় করে ওদের মাঝারে।'

ধ্যানে বসে পড়েন মেজদা খোলা মাঠে—সূর্যকে মাথার ওপর রেখে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়—তারপরে আসে সন্ধ্যা, আনে রাত। ওঁর মনের তেজে প্রকৃতির রুদ্র খেয়াল তুচ্ছ হয়ে যায়। কখন প্রহরের পরিবর্তন হয়, প্রকৃতি রং বদলায়—মেজদা কিছুই বুঝতে পারেন না। অবশেষে আসন ছেড়ে যখন উঠে দাঁড়ান দেখেন, দূরে ঐ চরে বেড়ানো গরুটি ছাড়া চারপাশে আর কেউই নেই। ভাললাগে ওঁর রাতের শান্ত পরশ। মন যেন মিশে যেতে চায় তারাভরা ঐ খোলা আকাশে। ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে পা বাড়ান মেজদা।

হঠাৎ ওঁর মনে হয় কারা যেন দল বেঁধে এগিয়ে আসছে। ওরা কাছে আসতে চিনতে পারলেন সেই ছেলের দল, যারা সুযোগ খুঁজছে ওঁকে হেনস্তা করার জন্যে। ওদের চোখে শিকারকে ফাঁদে পাওয়ার দৃষ্টি। ওদের মধ্যে কে যেন বলে ওঠে, 'এই যে সোনার চাঁদ মাণিক আমাদের—এবারে যাবে কোথায়? তেনারাই বা গেলেন কোথায়? এখন বাঁচাক দেখি।"

আর একজন বলে, "দেখ্ দেখ্, কী রকম পিট্‌পিট্ করে দেখছে দেখ্। যেই ব্যাটা বুঝতে পেরেছে আজ আমরা একটা হেস্তনেস্ত করব, অমনি সুড়ুৎ করে কাপুরুষের মত এখানে পালিয়ে এসেছে। আর একজন বিদ্রূপ করে, "ব্যাটার বুদ্ধি আছে বল?"

শান্ত গলায় মেজদা বললেন, 'তোমরা আমাকে কাপুরুষ বলছ কেন? দলে তো তোমরা অনেকজন আর আমি একা।"

দলের মাতব্বর ছেলেটি বলে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ রয়েছি তো। জানিস্ তোকে আমরা এখানে পুঁতে ফেললেও শিবের বাবাটি পর্য্যন্ত টের পাবে না? "—বলে ছেলেটি মেজদাকে ধাক্কা দেয়।

একটুও নড়লেন না মেজদা! অনড় পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখে তাঁর আগুণ ঝরছিল যেন। সিংহের মত গর্জন করে বললেন, 'বেশ কে এগোবে আগে, এসো।' কিন্তু মেজদার ঐ দুর্জয় সাহস আর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে কেউই আর এগিয়ে আসতে সাহস করে না।

দলের নেতাটি দূরে দাঁড়িয়েই বলল, "আরে, তুমি এটা সত্যি বলে ভেবেছ নাকি? আমরা শুধু মজা করছিলাম। এসো, আজ থেকে আমরা বন্ধু।"

মেজদা সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে সমস্ত তিক্ততা মুছে ফেলে বললেন: "বেশ তবে চলো আমাদের বাড়ী। সকলে মিষ্টি খাব পেট পুরে।"

এইভাবে দৃঢ় তেজে মেজদা চিরদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন। সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, এবং অন্তরের দিব্য শক্তি, তাঁর বাণীর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়ে একদিন বিশ্বজনকে আধ্যাত্মিক পিপাসা মেটাতে সমর্থ হয়েছিল। মেজদার বাণী ছিল! "অতি বড় অহিংসবাদীরও প্রয়োজনে ফোঁস করা উচিত। ন্যায়ের পক্ষ সব সময় অবশ্যই গ্রহণ করবে তবে একথাও মনে রাখবে যে, সৃষ্টি কার্যে সব চেয়ে বড় শক্তি হলো ভালবাসা।"*

মেজদার পরদুঃখ কাতরতা

উপাসনা করার জন্য মেজদা সর্বদা একটা শান্ত, নির্জন আর মনোরম স্থানের খোঁজ করতেন। একদিন তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন নব বিধান

* শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ বাণী।

ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে। এখানেই পরিচয় হয় স্বগীয় জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মশায়ের সঙ্গে। সেই পরিচয় পরে আরও ঘনিষ্ট হয়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজ মন্দির ছাড়াও আমরা যেতুম গৌরীবেড়িয়ার পরেশনাথ মন্দিরে আর ইডেন গার্ডেনের প্যাগোডায়। উপাসনার জন্য মনোমোহনদা'ও অনেক সময় আমাদের সঙ্গে যেতেন। একদিন ওঁরা ঠিক করলেন একটি দরিদ্র ভাণ্ডার খুলবেন। যে কটা পয়সা এতে জমা হবে, 'অর্ধোদয়যোগে'র দিন কালীঘাটে গিয়ে দরিদ্র নারায়ণদের তা দান করবেন।

ঐ যোগের দিনে আমিও ওঁদের সঙ্গে কালীঘাট মন্দিরে গেছলাম। পরহিতে কিছু দান করতে পারায় আমাদের সকলেরই মন খুব উৎফুল্ল ছিল! ট্রামে চড়ে বাড়ি ফিরব বলে আসছি, দেখি ক'জন কুষ্ঠরোগী ভিখারী খুব করুণভাবে আমাদের কাছে পয়সা চাইছে। গাড়ি ভাড়ার পয়সা ক'টি ছাড়া আমাদের আর সম্বল বলতে তখন কিছুই ছিল না। মেজদা কিন্তু সেই সবকটা পয়সা ওদের দান করেছিলেন। আমরা প্রায় সেই দশ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটেই ফিরেছিলাম। ১৯০৮ সালের সেদিনটিতে দু'জন কিশোরের সঙ্গে, অনেক ছোট হলেও আমি বীর সৈনিকের মত হেঁটে এসেছি—শ্রান্তি বলে কিছু অনুভব করিনি।

আর একটা ঘটনার কথা বলছি। তখন পৌষ মাস—বেশ শীত। রাত আট্‌টা বাজে। বাবা তাঁর ঘরের সামনে চৌকো বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছেন। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল। বাবা বললেন, "মুকুন আসছে মনে হয়।" সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, সত্যি সত্যি মেজদা ওপরে উঠে আসছেন—কিন্তু সম্পূর্ণ খালি গায়ে। পায়ে অবশ্য জুতো মোজা রয়েছে। অবাক কাণ্ড, গায়ে কোট জামা বলতে কিছুই নাই।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "একি! তোমার গা খালি কেন? শীতের রাত, বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া—তুমি খালি গায়ে বেরিয়েছ কেন?"

মেজদা ছেলেমানুষের মত বললেন, "দেখলুম একজন বুড়ো মানুষ রাস্তায় শুয়ে পড়ে কষ্ট পাচ্ছে, শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। গায়ে শুধু একটুকরো ছেঁড়া কাপড়। মনে হলো—আমাদের পয়সা আছে, শীত নিবারণের উপায় আছে, কিন্তু এই বেচারার তা নেই। তাই আমার জামা-কোটগুলো দিয়ে ওকে একটু আরামের সুযোগ দিলুম। আমারও খালি গায়ে শীতের অভিজ্ঞতা হয়ে গেল।"

বাবা মেজদাকে বকতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন। বললেন, "বেশ তো, লোকটিকে সার্ট কোর্ট দিতে পারতে--কিন্তু তুমি গেঞ্জীটাও দিয়ে এলে। এখন যদি ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করে?"

মেজদা হেঁসে বললেন, "কিচ্ছু হবে না বাবা। আপনার আশীর্বাদে সব ঠিক থাকবে।"

বাবা জানতেন, মেজদাকে যে পরামর্শই এখন দেওয়া হোক্ না কেন, তিনি তার একটা যথাযথ জবাব দেবেনই। অনেক যুক্তি দেখাবেন। তাই

শম্ভু বললেন, "বেশ হয়েছে, এখন যাও তাড়াতাড়ি গিয়ে অন্য একটি জামা গায়ে দাও। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে।"

"রামা হো!" গান

ডেফ্ এণ্ড ডাম্ব স্কুলের কিছু উত্তরপ্রদেশীয় বেয়ারা ও দারোয়ানদের দল শ্যামাপূজা থেকে আরম্ভ করে দোল পূর্ণিমার দিন পর্য্যন্ত সন্ধ্যেবেলায় এক বিচিত্র গানের আসর বসাত। এই গানের গায়কেরা অনেকটা বাঙালী কীর্তনীয়া দলের মত। মূল গায়েন একজন, বাকীরা সকলে ধুয়ো দেয়। গানের সঙ্গে সঙ্গতের জন্য থাকত ঢোলক আর কয়েক জোড়া খঞ্জনী। গানের সুরের সঙ্গে গায়কদের দেহও দুলতে থাকে। মূল গায়েন যেমন সুরের মধ্যে তাঁর দেহের সমস্ত শক্তিকে মিলিয়ে দেন, বাজনদাররাও তেমনি গায়কের কণ্ঠস্বরকে ডুবিয়ে দেবার জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে থাকেন।

গানের আসর ভাঙতে ভাঙতে মাঝ রাত পেরিয়ে যায়। আসপাশের প্রত্যেকটি লোক ভীষণ বিরক্ত হলেও গায়কদল তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ করে না, কারণ অনেকেই তখন দেশী মদ পান করে ভগবান রামচন্দ্রের ভজনায় সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে। সবচেয়ে মজার কথা হলো, এরা খুবই সরল। বুঝতেই পারে না যে তাদের গান সুর না হয়ে অ-সুর হচ্ছে। কেউ আপত্তি জানালে বিরক্ত হয়ে উত্তর দেয়, 'আপনারা নিজের কাজ করুন, আমরা আমাদেরটা বুঝবো।' স্কুলের ছেলেমেয়েরা শ্রবণশক্তি থেকে বঞ্চিত বলে তাদের কোনও অসুবিধা হতো না।

এদিকে দোল উৎসব যত এগিয়ে আসছে 'রামা হো' গায়েনদের আসুরিক চীৎকার অত্যাচারের সামিল হয়ে উঠছে। এক একদিন তাদের গান ভোর হলে তবে থামে। পল্লীবাসীরা অকারণে রাত জাগতে বাধ্য হয়। অবশেষে অসহ্য হওয়াতে আমাদের বাড়ী থেকে তিন চারটি পরের বাড়ীর এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একদিন সকালে মেজদাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে গায়েন দলটিকে বললেন, "ওহে বাপুরা, তোমাদের রাত ভোর রামা হো রামা হো গান যে আমাদের দফারফা করে দিচ্ছে। বেশ তো ছিলে বাবা, রাত এগারটা সাড়ে এগারটায় ক্ষান্ত দিচ্ছিলে ; তা রামজী এমন জরুরী কী তলব জানালেন যে একেবারে একদমে রাত কাবার করে দিচ্ছ?"

গায়েনদের একজন বলল, "আমাদের চারপাশে রোজ কত লোক কত ভাবে মরছে। তাদের অনেকেরই মুক্তি মিলছে না। ওরা সকলেই আমাদের চারধারে ঘুরছে। রাতেই তো ওদের আনাগোনা।"

পাশ দিয়ে এক ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। কথাটা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, "তা যা বলেছ ; তোমাদের চীৎকারে মরা মানুষও বেঁচে উঠতে পারে!" গায়েনটি চলে যেতেই মেজদা আনন্দ উচ্ছ্বাসে বলে ফেললেন, "পেয়েছি! পেয়েছি!"

দ্বিতীয় ভদ্রলোক একটু অবাক্ হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার! কি পেয়েছ!"

মেজদা বললেন, "ভূতের ভয় ওদের বড্ড বেশী। তাছাড়া অনেক কু-সংস্কারও আছে। আপনি বাড়ী গিয়ে অনুপকে বলবেন, ও যেন এক্ষুণি আমাদের সঙ্গে দেখা করে।" অনুপ ঐ ভদ্রলোকেরই ছেলে।

এরপর অনুপদা এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে মেজদা গোপনে পরামর্শ করলেন, কি করে রাতের আপদকে চিরদিনের মত স্তব্ধ করা যায়। আলাপ-আলোচনার শেষে মিষ্টি খেয়ে সকলে হাসি মুখে আমাদের বাড়ী থেকে চলে গেলেন। ঠিক হল, আবার রাত সাড়ে ন'টায় সকলে একসঙ্গে মিলিত হবেন।

রাত তখন বারোটা হবে। রামা হো গান বেশ জমে উঠেছে। ঢোল-খঞ্জনীও সমান তালে তাল রেখে বেজে চলেছে। এদিকে পাড়ার ছেলের দল মূক বধির স্কুলের নীচু পাঁচিল টপকে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছি সেই কীর্তনের আসরের দিকে। কেউ যেন দেখে না ফেলে তাই এত সাবধানতা। প্রত্যেকের হাতে একটি করে মাঝারী ধরণের টিন আর এনামেলের হাতা। খালি মেজদার হাতে ছিল এক বাক্স ভুঁই পটকা। আসর থেকে দশ বারো হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়ে আমরা সকলে মিলে এক সঙ্গে হাতা দিয়ে টিন পেটাতে শুরু করলাম। সঙ্গে নানারকম মুখের আওয়াজ—কেউ হাঁসছে, কেউ কাঁদছে আবার কেউবা শিয়াল কুকুরের ডাক কিম্বা নাকি সুরে শব্দ করছে। গায়েনরা সবাই সেই শব্দ শুনে হক্‌চকিয়ে গিয়ে মনে মনে রামনাম জপ করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও একদম থেমে যাই। চারদিক অন্ধকার আর অখণ্ড নিস্তব্ধতা —শুধু জোনাকির আলো আর ঝিঁ ঝিঁ পোকার গুঞ্জন ছাড়া আর কোনই শব্দ নেই। ওদের মধ্যে কে যেন কাঁপা গলায় বলে উঠলো: কে? কে ওখানে? বাকিরা সবাই অজানা ভয় ও উৎকণ্ঠায় নীচু গলায় কী যেন বলাবলি করছিল এবং ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আগের গায়েনটি বোধ হয় বলে উঠল, "এই, তোমরা কেউ একজন বাইরে বেরিয়ে দেখ না, ব্যাপারটা কি!" কিন্তু কে বাইরে যাবে? ভয়ে সকলে অথর্ব হয়ে গেছে। ভূতের ভয় জগদ্দল পাথরের মত যেন ওদের বুকে চেপে বসেছে।

মেজদাও যেন ঠিক এই মুহূর্তটার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। নিখুঁত লক্ষ্যে ঠিক গায়েনদের মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় একটা বড় ভুঁই পটকা ছুঁড়ে মারলেন। ভীষণ শব্দে সেটি রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে খান্‌খান্ করে দিল। আবার শুরু হল আমাদের টিন পেটানো আর সেই ভয়ংকর নানারকম শব্দ—কান্নার আওয়াজ, শিয়াল কুকুরের ডাক। সে এক অদ্ভূত পরিস্থিতি। গায়েনরা পড়ি কি মরি করে যে যেমন পারল ঊর্ধ্বশ্বাসে রামনাম জপ করতে করতে চোঁ চোঁ দৌড় মারল।

আসল ঘটনা কিন্তু চাপা রইল না। পরদিনই ওরা সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পেরে মেজদার নামে স্কুলের অধ্যক্ষের কাছে নালিশ জানাল। তিনি

ওদের বললেন, "তোমরা নিশ্চয়ই এমন কিছু করেছ যার জন্যে মুকুন্দ আসতে বাধ্য হয়েছিল।" ওরা সমস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, "না স্যার। আমরা এমন কিছুই করিনি। রোজকার মত গতকালও গানের মধ্যে ভগবান রামচন্দ্র ও সীতামায়ের ভজনা করছিলাম। সেও বাবু রাত দশটায় শেষ হয়ে গেল।" অধ্যক্ষ মহাশয় মেজদাকে ডেকে পাঠালেন। ওদের বক্তব্য শুনে মেজদা বললেন "ওরা মিথ্যে কথা বলছে।" একথা বলে তিনি ওদের দিকে এমনভাবে তাকালেন যে ওরা আমতা আমতা করতে শুরু করে দিল।

দলনেতাটি বলল—"দশটার মধ্যে না ভাঙলেও কোনদিনই বারোটার বেশি হয়নি স্যার।"

অধ্যক্ষ মহাশয় ব্যাপারটি আন্দাজ করতে পারেন। বলেন, "তা, আরো দেরীতে আসর ভাঙ্গে না কেন? তোমরা করোটা কি—আরও কিছুক্ষণ চালাবে তো।"

ওরা ভাবল অধ্যক্ষ মশাই বোধহয় ওদের গানকে উৎসাহ দিচ্ছেন। একজন তাদের মধ্যে বলে ফেললোঃ "সে তো ঠিকই; তাই তো মাঝে মাঝে রাত ভোরও হয়ে যায়। আপনাদের মত গুণী মানুষেরা যদি এভাবে আমাদের একটু আধটু তারিফ জানান, তাহলে আরও অনেকেই এসে জুটবে—আমাদের চেষ্টা সফল হবে।"

অধ্যক্ষ মহাশয় সব শুনে শুধু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হুঁ'; তবে শোন আর যদি কোনদিন শুনতে পাই যে তোমাদের সান্ধ্য গানের জন্য কারও কোন অসুবিধা হচ্ছে, তবে সেই মুহূর্তেই সকলকে বিদায় করে দেবো। মনে রেখো। যাও।"

গুটি গুটি পায়ে অধ্যক্ষ মহাশয়ের ঘর থেকে গায়েনের দল চলে যায়। একটি বিরাট সম্ভাবনার যে এমনি অপমৃত্যু হবে তা তারা হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারেনি।

৯ মেজদার আত্মিক ও মানসলোকে তথ্যানুসন্ধান

দক্ষিণেশ্বরে সমাধি লাভ

মেজদা, মনোমোহনদা, জীতেন্দ্রনাথ মজনুমদার—মেজদা যাঁকে জীতেনদা বলতেন এবং আমি, দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। বেশির-ভাগ সময়ে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে যাওয়া হতো। একবার আহিরীটোলা ঘাট থেকে নৌকা করে গিয়েছিলাম। সেদিন নৌকায় ফিরতে গিয়ে অনেক রাত হয়ে যায়, কারণ ভাটা না পড়লে নৌকায় খেয়া চলে না। আমার মত ছেলে মানুষকে নিয়ে যাওয়া এবং এত রাত্রি করে ফেরার জন্য বাবার কাছে সেবারে খুব বকুনি খেয়েছিলেন মেজদা।

দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে প্রথম মা কালীকে দর্শন করে তারপর সামনের নাট-মন্দিরে বসে কিছুক্ষণ ধ্যান করতাম। রামকৃষ্ণদেবের ঘরে বসে কিছুক্ষণ ধ্যান করার পর মেজদা যেতেন বিখ্যাত পঞ্চবটী বনে। এখানে বসেই ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ধ্যান করতেন ও সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেখানে বসে মেজদা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানস্থ হয়ে থাকতেন। এছাড়া মন্দিরের পূব-দিকে একটা বেলগাছ আছে। এর তলায় বসে রামকৃষ্ণদেব প্রায়ই ধ্যান করতেন। মেজদাও মাঝে মাঝে সেখানে ধ্যানে বসতেন। আমরাও সামনেই গঙ্গার ধারে বসে ধ্যান করতাম—ভগবৎ চিন্তায় মগ্ন থাকতাম। কি যে ভালো লাগতো তা বর্ণনা করা যায় না। মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বেজে উঠলেই মেজদা ও আমরা সকলে উঠে পড়তাম এবং মা কালীর আরতি দেখে প্রসাদ পেয়ে ঘরে ফিরতাম।

একদিনের ঘটনা বলি। প্রতিবারের মত আমরা সেবারেও গঙ্গার ধারে বসে আছি আর মেজদা পঞ্চবটী তলায় বসে ধ্যান করছেন। আরতির ঘণ্টা বাজতেই মেজদাকে ডাকতে গিয়ে আমরা অবাক! সেই আলো-আঁধারিতে মেজদাকে দেখে আমরা ভীত ও স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখি মেজদা নিশ্চল হয়ে ধ্যানমগ্ন—তাঁর গলায় জড়িয়ে আছে একটি সাপ এবং আর একটি রয়েছে কোলের ওপর। শরীরের চারধারে একটা বৃত্তাকার হালকা ফিকে আলোর দ্যুতি। সকলে কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তারপর আমি 'মেজদা', 'মেজদা' বলে চেঁচিয়ে উঠি এবং মনোমোহনদা ও জীতেনদাও তাঁর নামধরে ডাকতে থাকেন।

কিছুক্ষণ পরে মেজদার শরীর নড়ে ওঠে। তিনি আস্তে আস্তে হাত-তালি দিতেই সাপদু'টি নেমে পেছনের জঙ্গলে মিশিয়ে যায়। পরে মেজদাকে সাপের কথা বলতে তিনি শুধু বলেন—ও কিছু নয়।

তখন পঞ্চবটীর চারপাশে ভীষণ জঙ্গল ছিল। এখন পরিষ্কার হয়ে

গেছে। ভক্তরা পঞ্চবটীর পাতা ছিঁড়তো, ডালপালা ভেঙ্গে নিয়ে যেতো। তাই আজকাল রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

আসল ও ভণ্ড তপস্বী

যখনই কোথাও কোন সাধু এসেছেন বলে শোনা যেতো, তখনই মেজদা ছুটতেন সেই সাধুদর্শনে। আমরাও প্রায়ই তাঁর সঙ্গী হতাম। একদিন একজন এসে বল্লে—কালীঘাটে আদি গঙ্গার ধারে এক গাছতলায় একজন সাধু-বাবা এসেছেন। তাঁর নাকি ১০৫ বছর বয়েস এবং অনেকের অনেক রোগ তিনি ভাল করে দিচ্ছেন। তাই মেজদার সঙ্গে মনোমোহনদা, জীতেনদা আর আমিও বেরিয়ে পড়লাম সাধু সন্দর্শনে।

সেখানে গিয়ে দেখলাম বিরাট ভীড়। কোনমতে ভীড় ঠেলে কাছে গিয়ে দেখি—এক জটাধারী সুন্দর মূর্তি সাধু ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য। মেজদা একেবারে সাধুর কাছে গিয়ে বসলেন ; আমরা বসলাম কিছুটা পেছনে। মেজদা সাধুর সঙ্গে কথা বলছিলেন কিন্তু আমরা তাঁদের কথাবার্তার কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না। খানিক পরে মেজদা উঠে পড়ে আমাদের বল্লেন—'চলো'। রাস্তায় বিশেষ কিছু কথা হলো না।

বাড়ী ফিরে বললেন—'একটি অতি সুন্দর চুণকাম করা কবরখানা দেখে এলাম।'

আমরা মেজদার কথায় অবাক। বললাম, "কিছুই বুঝছি না, একটু বুঝিয়ে বল।"

মেজদা আমাদের বললেন, "কবরখানা বাইরে থেকে কি সুন্দর দেখতে —পরিষ্কার চুণকাম করা কিম্বা মারবেল পাথর দিয়ে বাঁধান। কিন্তু ভেতরে কি থাকে? পচা মাংস আর হাড়। সাধুটি বাইরে থেকে কবরখানার মতই সুন্দর দেখতে, কিন্তু কথা বলে বুঝলাম ভেতরটা একদম ঝরঝরে, আত্মিকভাবে মৃত।"

তবে মেজদার সান্নিধ্যে থেকে অনেক কিছু দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং অনেক প্রকৃত সাধুসঙ্গও পেয়েছিলাম। আমাদের বাড়ীর কাছে সারকুলার রোডের ওপর একটা তিনতলা বাড়ীতে থাকতেন শ্রদ্ধেয় শ্রী নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মশাই। এই 'লঘিমাসিদ্ধ সাধু'র কথা মেজদা তাঁর যোগিকথামৃত (Autobiography of a Yogi) গ্রন্থে বিস্তৃত করে লিখেছেন। মেজদা ভাদুড়ী মশায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে যেতেন। কয়েকজন শিষ্য তাঁকে দেখাশোনা করতেন।

একদিন সন্ধ্যায় মেজদা আমাকে সঙ্গে নিয়ে ভাদুড়ী মশায়ের বাড়ীতে গেলেন। বাড়ীটা অন্ধকার ; উপরে উঠেও কাউকে দেখতে পেলাম না। ভাদুড়ী মশায়ের ঘরের দরজা ভেজান ছিল। আমরা আস্তে আস্তে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে দেখি ঘরটাও অন্ধকার—শুধু বাইরের বারান্দার জানলা দিয়ে রাস্তার

গ্যাসের আলো অল্প অল্প ঘরে আসছে। প্রথমে আমরা ঘরের ভেতর কোন জিনিষই দেখতে পাচ্ছিলাম না। ক্রমে ক্রমে অন্ধকার চোখসওয়া হয়ে এলো। তখন অবাক হয়ে দেখি ভাদুড়ী মশাই নিজের বিছানা ছেড়ে অনেক উঁচুতে শূন্যে বসে আছেন। আমি ভাবলাম নিশ্চয়ই উনি কোন উঁচু জিনিষের ওপর বসে আছেন। স্পষ্ট করে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। অনেকক্ষণ আমার কাশি পাচ্ছিল। আর চাপতে না পেরে জোরে কেশে উঠলাম। তখন দেখি ভাদুড়ী মশায়ের দেহ নড়েচড়ে উঠল এবং তিনি শূন্য থেকে নেমে বিছানায় বসলেন।

ভাদুড়ী মশাই তারপর বললেন, "আরে মুকুন্দ, কতক্ষণ এসেছ? বসো, আলোটা জেলে দাও।"

আমরা অবাক হয়ে ভাবতে থাকি এতক্ষণ শূন্যে বসেছিলেন কি করে? কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তিনি আমাদের মিষ্টি খাওয়ালেন। কোনবারই মিষ্টি না খাইয়ে ছাড়তেন না।

সেদিন অনেক ভাগ্যে যা দেখেছি, জীবনে কোনদিন তা আর ভুলব না।

মেজদার মনঃশক্তির পরিচয় লাভ

ভৌত বস্তুর উপর মনের প্রভাব অসীম। সাধনার প্রারম্ভিক স্তরেই মেজদা একদিন আসনে বসে উপাসনা করতে করতে উপলব্ধি করলেন একটি অদ্ভুত শক্তি যেন ওঁর ভিতর জন্ম নিয়েছে। সেই শক্তি বলে তিনি অদৃশ্য বস্তুর সন্ধান এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা বা কে কী হবে তা বলে দিতে পারবেন। এর জন্য অবশ্য দরকার একজন 'মাধ্যম', যে প্রয়োজনীয় উত্তর সঠিকভাবে প্রকাশ করবে। তাই আমাকেই তিনি সেই 'মাধ্যম' হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে যে ঘটনাটি সবার আগে মনে আসে তারই উল্লেখ করছি। অসুস্থ হয়ে ছোটকাকা একবার আমাদের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন। সেই সময়ে মেজদা একদিন আমাকে তাঁর উপাসনা ঘরে নিয়ে গেলেন। আমরা দু'জনে যোগাসনে মুখোমুখি বসলাম। তারপর তিনি আমার গা ও মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বুঝতে পারছিলাম দেহের মধ্যে কেমন যেন পরিবর্তন আসছে—বেশ স্নিগ্ধ আর আরামদায়ক, অথচ বাধা দেবার ক্ষমতা একটুও নেই। সামান্য দু'চারটে কথার পর মেজদা ছোটকাকার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম, 'কাকার শরীর বেশ খারাপ। এখুনি তোমায় ডাকতে আসছে...'। কথাটা শেষ করার আগেই শুনতে পেলাম কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে। দরজা খুলতে মেজদা শুনতে পেলেন সত্যি ওঁকে নীচে ডাকা হয়েছে।

কাশীতে একবার মেজদার সঙ্গে এক বাঙালী ছেলের পরিচয় হয়, নাম

সুনীল। সেই সূত্র ধরেই সে একদিন হাজির হলো কলকাতায়। এখানে নাকি তার কোন আত্মীয়স্বজন নেই—তাই আমাদের বাড়ীতেই থাকতে চায়।

সাতদিনের জায়গায় পনেরো দিন হয়ে গেল, অথচ সুনীল যাবার কোন কথাই তোলে না। কাশীতে থাকতেই মেজদা শুনেছিলেন যে ছেলেটি বিশেষ সুবিধের নয়। তবুও মনের মধ্যে কোথায় যেন বাধছিল চলে যেতে বলতে। মেজদার মনে হলো ছেলেটি যেন ওঁর গলাবন্ধ গরদের কোটটির দিকে কি এক লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

মেজদার কাছে কোটটির মূল্য ছিল অনেকখানি, কারণ সেটি মা বাবাকে দিয়েছিলেন। জামা কাপড়ের দিকে বাবার মোটেই দৃষ্টি ছিল না। কি অফিস, কি আত্মীয় বন্ধু—সব জায়গাতেই তিনি খুব সাধাসিধে পোষাকে যেতেন। অনেকে এ' জন্যে মায়ের কাছে এসে অনুযোগ করতেন। মা তখন বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক রকম জোর করেই এটি তৈরী করিয়েছিলেন। বাবা, খুব বেশি হলে মাত্র দু'তিনবার সেটি পরেছিলেন। মেজদা বড় হতে বাবা সেটি মেজদাকে দিয়েছিলেন।

মাঝখানে একটি কথা বলে নেই। জীতেনদা ছিলেন মেজদার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই মেজদা ওঁকে ছেলেটির ব্যাপারে সব কিছু বলেছিলেন এবং জীতেনদাও মেজদার অনুপস্থিতির সময় ছেলেটিকে চোখে চোখে রাখতেন।

একদিন—তারিখটা ঠিক মনে করতে পারছি না—কোন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। ফিরতে রাত হওয়ায় মেজদা কোটটি আর ওপরের ঘরে নিয়ে যান্ নি। নীচের ঘরে হ্যাংয়ারে ঝুলিয়ে রাখলেন।

পরদিন বাবা মেজদাকে বললেন, 'গোরাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কলেজ ষ্ট্রীট্ থেকে একজোড়া চটি-জুতো কিনে দিও।' সেদিনই বিকেলে মেজদা, জীতেনদা, সুনীল ও আমি একসঙ্গে বেরিয়েছি কলেজ ষ্ট্রীটে যাবো জুতো কিনতে। বাড়ী থেকে বেরোবার আগে ছেলেটি নিজেই হ্যাংয়ার থেকে কোটটি নিয়ে পরে নিয়েছিল। প্রথমটায় একটু কিন্তু করেছিলেন মেজদা, তারপর বোধ-হয় মনের দিক থেকে ছোট হয়ে যাচ্ছেন ভেবে চুপ করে গিয়েছিলেন।

ঐ কলেজ ষ্ট্রীট্ যাবার পথেই পড়ে সেজদির শ্বশুরবাড়ী। সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে মেজদা আমাদের বললেন, 'তোমরা একটু দাঁড়াও আমি চট্ করে সেজদির সংগে দেখা করে আসি।' সেই সঙ্গে জীতেনদাকে কাছে ডেকে নীচু গলায় বললেন,—লক্ষ্য রেখো, ছেলেটি যেন পালিয়ে না যায়। অল্পক্ষণ পরেই মেজদা ফিরে এলেন এবং আমরাও আবার হাঁটতে শুরু করলাম। তারপর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ (বিধান সরণী) আর কেশব সেন ষ্ট্রীটের মোড়ে আসতেই সুনীল হঠাৎ একটা চলন্ত ট্রামে লাফিয়ে উঠে পড়ল। জীতেনদা আগে থেকেই এমনি একটা কিছু আন্দাজ করেছিলেন, তাই তিনিও তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাতে উঠে পড়লেন। সুনীল জানতো জীতেনদার হাতে ধরা পড়লে সে কিছুতেই রেহাই পাবে না। তাই সে একটা ভীড় চৌরাস্তায় লাফিয়ে নেমে পড়ে সন্ধ্যার জনারণ্যে মিশে গেল।

অনেক খোঁজাখুঁজি হলো কিন্তু কোথাও তার দেখা পাওয়া গেল না। যাই হোক্ জুতো কিনে বিষণ্ণ মনে সকলে বাড়ী ফিরে এলুম। জামাকাপড় ছেড়ে মেজদা আমাকে নিয়ে ঢুকলেন ওঁর উপাসনা ঘরে। আগের বারের মত গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আমার মধ্যে এক অদ্ভুত আবেশভাব এনে, ছেলেটি কোথায় গেছে, সেই বাড়ীর ঠিকানা কি—সব জেনে নিলেন। রাত হয়ে গেছে তাই সেদিন আর ছেলেটির খোঁজ করা গেল না।

পরদিন ভোরবেলা মেজদা, আমি এবং জীতেনদা একটি বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়লুম। একজন ভদ্রলোক দরজা খুলতে মেজদা তাঁকে ছেলেটির চেহারার বর্ণনা আর নাম বললেন। তিনি জানালেন—সুনীল গতকাল রাত্রে এসেছিল কিন্তু আবার ভোর না হতেই চলে গেছে। ভদ্রলোক সুনীলের আত্মীয়। আমরা তাঁর খোঁজ করছি কেন জিজ্ঞাসা করাতে মেজদা তাঁকে কাশীতে সুনীলের সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে গতকালের ঘটনা পর্যন্ত সব বললেন।

তিনি বললেন, "তোমরা কাল রাতেই এলে না কেন, তাহলে হাতেনাতে ওকে ধরতে পারতে। আর আমিও ঘাড় ধরে ওকে থানায় নিয়ে যেতে পারতুম। ও একটি পাকা শয়তান এবং চোর। তোমাদের আসার আগে শুনেছি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু টাকা চেয়ে নিয়ে গেছে। ঠিক আছে, আজই আমি কাশীতে ওদের বাড়ীতে চিঠি লিখছি এবং কোটটি যাতে ফিরে পাও তারও ব্যবস্থা করছি।"

জীতেনদা বললেন, "আপনি যে রকম বলছেন তাতে মনে হচ্ছে যে কোটটি সুনীল বিক্রি করে দেবে। সে কি আর ফিরে পাওয়া যাবে?"

তখন ভদ্রলোক বললেন, "তোমরা ভেতরে এসে একটু বোসো আর কোটটির কত দাম হবে বলো। আমি সে টাকা দিয়ে দেব। কারণ চোর একরাত্রি আমার বাড়ীতে ছিল এবং সেদিক থেকে আমারও কিছু দায়িত্ব আছে।"

মেজদা বললেন, "ছি ছি, এ আপনি কি বলছেন। আপনি কেন ঐজন্যে গুণগার দেবেন?"

চলে এসেছিলুম এর পর। বাবাকে মেজদা ঘটনাটি সব বলেছিলেন। শুনে তিনি বলেছিলেন ভালই হয়েছে। ব্যাপারটা ঐখানেই ইতি হয়ে যায়। আমরা আর কোটটি ফিরে পেতে চেষ্টা করিনি।

মেজদা সেই সময় পরলোক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে নানারকম পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। মৃত আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যাপারে মাধ্যম হিসাবে তিনি আমাকে ব্যবহার করতেন। এই করতে গিয়ে একবার এক বিদেহী আত্মা আমার ওপর ভর করে। কিছুতেই সে আমাকে ছাড়বে না। সে বলে যে টালা ব্রীজের কাছে তাকে খুন করা হয়েছে। অন্য দেহের সন্ধানে সে এতদিন ঘুরে বেড়িয়েছে। এখন আমাকে খালি পেয়ে সে এসে আশ্রয় নিয়েছে—অতএব কিছুতেই আর আমাকে ছাড়তে রাজি নয়।

নিজের জানা সমস্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করেও মেজদা সেই বিদেহী আত্মাকে দূর করতে পারলেন না। শেষে আমাদের বাবা মাকে মহাগুরু লাহিড়ী মহাশয়

নিজের যে ছবিখানি দিয়েছিলেন সেটি নিয়ে বললেন, "ছুঁয়ে দেব, ছুঁয়ে দেব কিন্তু—বলছি শীগ্গির চলে যাও। গেলে না···ছুঁয়ে দিলুম..." দু'তিনবার এ'রকম ভয় দেখাতে সেই আত্মা শেষ পর্য্যন্ত আমাকে মুক্তি দেয়।

এইভাবে আমাকে মাধ্যম করে মেজদা মায়ের সঙ্গেও কথা বলতেন। মেজদার অতীন্দ্রিয় শক্তির কথা শীঘ্রই আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। একদিন তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন হাজির হলেন স্বচক্ষে মেজদার কাণ্ডকারখানা দেখতে। তারা কে কি ভাবছেন—আমাকে মাধ্যম করে মেজদা সে'সব কথা তাদের বলে দিলেন। এইভাবে একসময় আমার এক পিসতুতো ভাই ললিত মোহন মিত্রের স্ত্রী রাঙা বৌদি'র পালা এল। তখন অন্য সব মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ বললেনঃ "আমাদের কথা তো টপ্‌টপ্‌ বলে দিলে, কিন্তু ওরটি বলতো দেখি—তাহলে বুঝবো তোমার ক্ষমতা।"

মেজদা একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, "কেন বেচারীকে লজ্জা দিতে চাইছেন।"

"ওসব ভাঁওতাবাজী ছাড়ো। বলনা যে পারব না। আরে বাবা ওর মনের কথা তোমাদের স্বয়ং ভগবান পর্য্যন্ত জানেন না—তুমি তো তুমি!"

মেজদা কৌতুক করে রাঙাবৌদিকে বললেন 'আমাকে দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন। আমার কিন্তু দোষ নেই। এঁরা সবাই শুধু আমাকেই নয়, আমার ভগবানকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করছেন।"

রাঙা বৌদি চোখ পাকিয়ে দেখলেন মেজদাকে। মেজদা বললেন, 'তাহলে বলি রাঙা বৌদি? দেখবেন যেন অস্বীকার করবেন না।'

মেজদা একভাবে কটি মুহূর্ত চেয়ে রইলেন রাঙা বৌদির দিকে। একটু যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন বলে মনে হলো। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলতো রাঙা বৌদি এই মুহূর্তে কি খেতে চাইছেন?'

আমি বললাম, "এক গ্লাস ঠাণ্ডা বরফ জল।"

ঘরে হাঁসির রোল উঠল। রাঙা বৌদির মুখখানা লজ্জায় আবিরের মত লাল হয়ে ওঠে। তবু জোর করে বলেন, "ধ্যেৎ, কি অসভ্য দেখেছ...."

মেজদা বললেন; "লজ্জাই পান আর যাই পান্—বলুন ঠিক কি না!" মাথা নীচু করে ঘাড় কাত করেন রাঙা বৌদি।

গড়পার রোডে সে সময় উপেন মিত্র নামে মেজদার এক বন্ধু ছিলেন। একদিন মেজদার সঙ্গে উপেনদা'র বাড়ীতে গেছি; তিনি আমাদের নিয়ে গিয়ে তাঁর বৈঠকখানায় বসালেন। আমি যেখানে বসেছিলাম তার পেছনে ছিল একটা বইয়ের তাক। মেজদা উপেনদাকে বললেন আমি যেন দেখতে না পাই এমন-ভাবে সে যেন তাক থেকে একখানা বই তুলে নেয়। আমি বইটির নাম, দাম, প্রকাশক কে এবং কোথায় ছাপা হয়েছে—সব বলে দিলাম। মেজদা এরপর বইয়ের যেকোন একটা পাতা খুলতে বললেন। আমি পাতার নম্বর এবং সেখানে কি লেখা আছে—সব গড়গড় করে বলে গেলাম। উপেনদার বাড়ীর সবাই অবাক; নিজেদের চোখ এবং কানকে যেন তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

এর প্রায় সপ্তাহখানেক পরে মূক ও বধির বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মেজদাকে তাঁর মনঃশক্তি প্রদর্শন করার জন্য আহ্বান জানালেন। পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা থাকার জন্য মেজদা সেই ডাককে অস্বীকার করতে পারলেন না। আমাকে সকলের সামনে দাঁড় করিয়ে মেজদা একটা মাটির ঢেলা আমাকে খেতে দিয়ে বললেন, 'কি খাচ্ছিস্ রে? খুব মিষ্টি বুঝি?'

আমিও খুব আস্বাদ করে খেতে খেতে বললুম, 'হ্যাঁ, খুব মিষ্টি; চমৎকার খেতে।'

ঢেলার প্রায় সবটুকু শেষ করে এনেছি এমন সময় মেজদা জোর গলায় বললেন, 'কি বিচ্ছিরি আর তেতো রে বাবা'।

ঐ কথা বলতেই যতটা খেয়েছিলুম সবটুকু থু থু করে মাটিতে ফেলে দিলুম।

এর বেশ কয়েকদিন পরে মেজদার সঙ্গে একজায়গায় যাবার জন্যে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি এমন সময় জুতোয় একটা পাথর ফুটে গেল। পাশের বাড়ীর দেওয়ালে ডান হাতটি রেখে কাঁকড়টি বার করার চেষ্টা করছি এমন সময় মেজদা বললেন, "কী রে দেওয়ালে হাত আটকে গেছে তো?"

দেখলুম, সত্যি সত্যি আমার ডান হাতটা পাশের বাড়ির দেওয়ালে আটকে গেছে। যত চেষ্টা করছি, ততো যেন বেশি করে আটকে যাচ্ছে। কিছুতেই ছাড়াতে পারছিনে।

"একটু দাঁড়াতো, আমি আসছি", বলে মেজদা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন। একটু পরেই নেমে এসে বললেন 'চল'। সঙ্গে সঙ্গে অবাক্ কাণ্ড। হাতও দেয়াল থেকে খুলে গেল।

আমাকে নিয়ে মেজদার কাণ্ড কারখানার খবর বাবার কানে গিয়ে পেঁছিল। তিনি মেজদাকে ডেকে বললেন, "গোরাকে নিয়ে আর এসব কোরো না। এতে ওর শরীর ও মন—দুই দুর্বল হয়ে পড়বে।" সেই থেকে মেজদা আর কোনদিন আমাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন নি।

সেই সময় একদিন রবিবারে পাঁচুদি* মেজদাকে এসে বল্লেন, "দেখ মুকুন, বাক্স থেকে ২৫ টাকা চুরি গেছে। আমার মনে হয় কানু ঠাকুরেরই কাজ। সে ছাড়া আর কেউ আমার ওঘরে যায় না।"

মেজদা কানুঠাকুরকে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, কিন্তু কিছুতেই সে দোষ স্বীকার করলো না। মেজদা তখন তাকে মাটিতে বসিয়ে কিছুক্ষণ তার মুখের সামনে হাত নাড়তেই ও স্থির হয়ে গেল এবং মাটিতে শুয়ে পড়লো। পাঁচুদি, রাঙা মামা, বিনু (মেজদির ছোট ছেলে) আর আমি কানুর চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়ালুম। মেজদা তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন—

* পাঁচুদি হলেন বাবার মামার বাড়ী তরফে এক আত্মীয়া। অল্প বয়সে বিধবা হবার পর আমাদের দেখাশোনা করার জন্যে এখানে চলে আসেন। তিনি খুব ধর্মপ্রাণা ছিলেন। মেজদার থেকে বয়সে সামান্য বড় হলেও তিনি তাঁর কাছেই দীক্ষা নেন।

—"তুমি কি পাঁচুদির টাকা নিয়েছ?"
—"হ্যাঁ, নিয়েছি।"
"কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?"
—"উত্তর দিকের সিঁড়ির তলায় ইট চাপা দিয়ে রাখা আছে।"

সেখান থেকে টাকাটা উদ্ধার হবার পর মেজদা তখন তার জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। মেজদা আমাকে যতবার হিপনোটাইজ করেছেন ততবার এক মুহূর্তের মধ্যে আমার জ্ঞান ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক্ কানুর জ্ঞান আর ফেরাতে পারেন না। মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া হলো, কিন্তু তাতেও কিছু হলো না।

সেদিন ছিল রবিবার। বাবা বাড়ীতেই ছিলেন। বিনু আস্তে আস্তে বাবাকে সব কথা বলাতে তিনি নীচে নেমে এলেন। মেজদাকে বললেন "মুকুন, এ'কি কাণ্ড করেছ? তোমাকে কতবার না এ সব কাজ করতে বারণ করেছি?"

এই বলে বাবা কানুঠাকুরের স্থির দেহটার পাশে বসে দুই ভুরুর মাঝখানে টিপে ধরে খানিকক্ষণ প্রাণায়াম করলেন এবং তারপর তার মাথায় ও দেহে হাত বুলিয়ে দিতেই সে চোখ খুলে তাকাল এবং ধড়মড় করে উঠে বসলো তারপর অবাক হয়ে আমাদের সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সেই থেকে বাবার কড়া হুকুম মেনে নিয়ে মেজদা হিপনটাইজ করা একদম ছেড়ে দেন।

উদাসীন 'নাগা সাধু'

প্রতিদিন সূর্য ওঠার আগে মেজদা বিছানা ত্যাগ করে হাত মুখ ধুয়ে প্রার্থনায় বসতেন। তারপর মা কালীর নামগান করতে করতে চলে যেতেন গঙ্গাস্নানে। এটি ছিল ওঁর নিত্য কর্মের একটা বিশেষ অংশ। এক একদিন আমিও জেদ ধরে ওঁর সঙ্গে যেতুম।

একদিনের কথা বলি। মেজদা তখন ক্লাশ টেন-এ পড়েন। অন্য দিনের মতো সেদিনও সকালে বাড়ী থেকে বেরোলেন গঙ্গাস্নান করতে। পূব আকাশে তখন শুকতারা জ্বল জ্বল করছে। ঊষাকালের সোনালী আলো মেখে মেঘের দল পূব আকাশে ভেসে চলেছে। মনে হয় যেন তারা ভগবানের আশীর্বাণী বহন করে নিয়ে যাচ্ছে দিকে দিগন্তে।

কোলকাতা শহরের বুকে তখন এতো ঘরবাড়ী বা কলকারখানা গড়ে ওঠেনি। এত গাড়ীঘোড়াও ছিল না। শহরের বেশ খানিকটা অংশ ছিল ফাঁকা। সেখানে দেখা যেতো ঘন সবুজ গুল্ম আর বড় বড় গাছপালা। তাদের পাতার সুনিবিড় ছায়া ভেদ করে ভোরের আলো এসে পড়তো মাটিতে। গাছের ডালপালায় ক্রীড়ারত রং-বেরঙের নানা পাখীর মিষ্টি সুরের গান বাতাসে ভেসে আসতো। ওরা যেন ঘুমিয়ে থাকা পুরবাসীকে ডেকে বলতে চায় ওঠো, জাগো! দেখো কেমন সুন্দর ভোর হচ্ছে। হৃদয় দিয়ে উপভোগ করো পৃথিবীর এই

সৌন্দর্যকে। ভগবানকে বন্দনা করো—সকলকে কাছে ডেকে আপন করে নাও, ভাগ করে নাও সকলের সঙ্গে ঈশ্বরের ঐ অপার ভালবাসা। তারপর আলো যখন আরও ছড়িয়ে পড়ে, তখন তারা ডানা মেলে দেয় সুনীল আকাশে, কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ে সেই আশ্বাস বাণী—আবার আসবো ফিরে গোধূলি বেলায়।*

মেজদা পাখীদের ভালবাসতেন এবং তারা যে আমাদের কত উপকার করে সেকথা প্রায়ই বলতেন। তাদের গানে ভাগবতী আনন্দের কথা মনে পড়ে। তারা আমাদের প্রভাত আলোয় জাগিয়ে দিয়ে সৃষ্টির সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ এনে দেয়, ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দূর আকাশে পাড়ি দিয়ে জানিয়ে দেয় এ জগৎ অনিত্য, তারা যেন বলে—পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিরাট মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করো। আমরা পার্থিব মায়ামোহে আবদ্ধ হয়ে যা চিরসত্য সেই ঈশ্বরকেই ভুলে গেছি। তিনি আছেন প্রকৃতির নানা রূপের আড়ালে। তাঁকে বন্দনা করো, তাঁর বিরাটত্ব উপলব্ধি করো—অবগাহন করো তাঁর আনন্দ সলিলে। সময় চলে যাচ্ছে। যেখান থেকে তোমার আগমন সেখানে পৌঁছানোর যাত্রা শুরু করো এই মুহূর্তেই। আর যারা আছে তাদেরও সঙ্গে নাও, চলো এগিয়ে চলো—অপেক্ষা করার সময় তোমার কোথায় ?

এমনি সব চিন্তা করতে করতে হর্ষোৎফুল্ল মনে মেজদা এসে পৌঁছতেন গঙ্গার ঘাটে। মায়ের নাম নিতে নিতে ঝাঁপ দিতেন জলে। ভগবৎ বন্দনার সুরে আবিষ্ট হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন ধীর প্রবাহিনী গঙ্গার জলে। গলা অবধি জলে দাঁড়িয়ে থাকা মেজদাকে দেখে আমার মনে হতো তিনি যেন এক পূত আত্মা, মোহান্ধ মানুষদের মাঝে কিছুদিন থাকার জন্য এ'জগতে আবির্ভূত হয়েছেন।

এইভাবে কতো সময় পার হয়ে যেতো। একের পর এক মায়ের গান গেয়ে চলতেন তিনি—তাঁর চোখের জলে সব কিছু ঝাপসা হয়ে যেতো। তাঁর সেই গানের মধ্যে মিশে থাকতো মানুষের মুক্তির জন্যে আকুল প্রার্থনা, প্রাণের নিবিড় আকূতি।

বেলা দ্বিপ্রহর হলে তিনি জল থেকে উঠতেন। ভাবানন্দে মুগ্ধ হয়ে পরিবেশের কথা সম্পূর্ণ বিস্মিত হয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে চলতেন তিনি। ঈশ্বরের নামগানের মাধুর্যে মত্ত হয়ে ভুলে যেতেন পোষাক-আসাকের কথা। পথের মানুষ ওঁর সেই গান মুগ্ধ হয়ে শুনতো। সুস্থ সবল কিশোর সেই 'নাগা সাধু'র* নগ্নতার প্রতি কেউ খেয়ালই করতো না।

ঠিক সেই সময়ে আমাদের এক পরিচিতা আত্মীয়া সেই রাস্তা ধরে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। মেজদাকে ঐ অবস্থায় দেখে দাঁতে দাঁত চেপে ভ্রূকুটি

* এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। ঈশ্বর দীনদুনিয়ার মালিক হয়েও নিঃস্ব—তাই এ'রাও অংগে কোন বস্ত্র ধারণ করেন না। কয়েকটি শৈব সম্প্রদায় যাঁরা নিজেদের 'দিগম্বর' বলেন তাঁরাও আরাধ্য দেবতার অনুসরণে নিরাবরণ হয়েই অবস্থান করেন।

করে বললেন, "ছিঃ মুকুন্দ ছিঃ। তুমি যে ভগবানের নামে এরকম অসভ্যতা আর বাঁদরামো সুরু করেছ তাতো জানতুম না। রাস্তা দিয়ে কত বাড়ীর মা, বৌ, ঝি চলেছেন—সে'সব কি একদম ভুলে গেছ? লজ্জা-সরমের বালাইটুকুও হারিয়ে ফেলেছ?"

মেজদা মহিলাটিকে প্রথমে চিন্তে পারেন নি। দূর থেকে ভেসে আসা স্বপ্নালু গলায় তিনি শুধু বললেন, "কি বলছেন আপনি?"

ভদ্রমহিলা এবার বেশ রাগত কণ্ঠেই জোর দিয়ে বললেন, "বদ্‌মায়েস ছেলে, আমি কি বলছি বুঝতে পারছনা, না? নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখোতো? তোমার জামা কাপড় কোথায়? না কি সে'সব বালাই অসভ্যতা বলে একদম জলাঞ্জলি দিয়েছ? কোন সাহসে তুমি এভাবে রাস্তা দিয়ে হাঁটো? বংশের কুলাঙ্গার না হলে কেউ কি অমন বাপ-মায়ের নামে এমনিভাবে কালি ছিটোতে পারে?

যে সৌন্দর্যের আস্বাদে নিজেকে মেজদা এতক্ষণ ডুবিয়ে রেখেছিলেন, যার চিন্তায় জগৎ ভুলেছিলেন, তা যেন মুহূর্তে ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে গেল। বাস্তব যেন ওঁর পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিল, সামাজিক আচার আচরণের নির্মমতাকে স্মরণ করিয়ে দিলো। মনে পড়ে গেল জামাকাপড় তিনি গঙ্গার ঘাটেই ফেলে এসেছেন। তিনি কেবল শান্ত সৌম্য হাসিমুখে মহিলাটিকে বললেন, "আপনার মনেই পাপ আছে, তাই আপনি দুনিয়ার সব কিছুতেই নোংরামি দেখছেন।"

মেজদার কথায় মহিলাটি যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। চোখের অগ্নিবৃষ্টিতে পারলে যেন ওঁকে ভস্ম করে ফেলেন।

মহিলাটির তীব্র ভর্ৎসনা বা তাঁর তখনকার বাস্তব অবস্থা মেজদার মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করেনি। বরঞ্চ ধীর স্থিরভাবে তিনি আবার গঙ্গামুখো হলেন তাঁর পোষাকের খোঁজ করতে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যদর্শন লাভ

ঈশ্বর সম্বন্ধে যে গভীর আকুতি মেজদা নিজের অন্তরে অনুভব করতেন, তাকেই তিনি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। এই প্রসঙ্গেই এক সহপাঠীর সঙ্গে একদিন তাঁর কথা হচ্ছিল। বন্ধুটির এই বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ থাকলেও খুব একটা বিশ্বাস ছিল না। মেজদা তাঁকে বোঝাতে চাইছিলেন যে, যদি কোন লোক নিষ্ঠাভরে একনাগাড়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে চলে তবে ভগবান অবশ্যই তাকে দেখা দেন। মেজদার কথায় বন্ধুটির মনে অস্থিরতা দেখা দিল, কিন্তু সংশয় তবু দূর হলো না। বললেন, "তা হলে হয়তো ভবিষ্যতে কোনদিন, নয়তো পরের জন্মে তোমার কথার সত্যতা দেখতে পাব।

মেজদা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "দূরে ভবিষ্যতের কথা কেন বলছো? কেন আজকের এই মুহূর্তের কথা বলছ না? কোন ভক্ত সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে দৃঢ় একাত্মতা নিয়ে যখন বলতে পারবে—আজ, আজই তোমাকে দেখতে চাই প্রভু, সেদিন সেই মুহূর্তে তিনি তাঁর সামনে এসে দাঁড়াবেন। ভক্তের ভক্তি ও প্রার্থনা যদি পৃথিবীর অণু-পরমাণুতে ছড়িয়ে যায়, তবে তিনি লুকোবেন কোথায়? তাঁকে যে আসতেই হবে।"

মেজদার ঐ প্রত্যয়ের স্পর্শ বন্ধুটির মনেও যথেষ্ট ছাপ ফেলে। তাঁর মনের স্ফুলিঙ্গে বন্ধুর মনেও যে অগ্নিশিখা জ্বলে উঠেছে সেকথা বুঝতে পেরে মেজদা বলেন, "আজ, এই রাতেই আমরা যদি একাত্ম হয়ে ভগবানকে শ্রীকৃষ্ণ রূপে ধ্যান করি, তাহলে তিনি সেই রূপেই আমাদের সামনে আর্বির্ভূত হবেন।"

মেজদার কথায় বন্ধুটির মনে সেই রাতেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করা শুধু যে সম্ভবপর তাই নয়, যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য বলেই বোধ হলো। দু'জনেই তারা আমাদের বাড়ীতে সন্ধ্যার সময় মিলিত হবে বলে স্থির করলো। যতক্ষণ না শ্রীকৃষ্ণের দেখা মেলে ততক্ষণ একসাথে তাঁর ধ্যান করবে।

দুই বন্ধু অন্তরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে যখন মেজদার উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ করলেন, তখন পৃথিবী রাতের অবগুণ্ঠনে মুখ লুকিয়েছে। ভেতর থেকে তাঁরা দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপরে কুশাসন পেতে পদ্মাসনে বসে দিব্য উৎসাহমণ্ডিত হয়ে গান, প্রার্থনা এবং ধ্যান শুরু করে দিলেন।

ভক্ত ভারতীয়দের চোখে শ্রীকৃষ্ণ হলেন ভগবানের পূর্ণ অবতার; তাই তারা তাঁকে অষ্টোত্তরশতনামে বন্দনা করে থাকে। তিনি ছিলেন সনাতন ভারতের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নরপতি যার মধ্যে লোকনেতার উপযুক্ত জ্ঞান, ন্যায়-পরায়ণতা ও প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা আমরা দেখতে পাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সখা অর্জ্জুন যখন কৌরবদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণে অনীহা প্রকাশ করেন তখন শ্রীকৃষ্ণই তাঁকে মানব জাতির প্রতিভূরূপে, বিধি নির্দিষ্ট কর্তব্যপালন এবং নিজ আত্মিক লক্ষ্য পূর্ণ করার জন্য যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র মহারণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে অতি পবিত্র উপদেশাবলী দিয়েছেন, তাকেই আমরা বলি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। কি পার্থিব বিষয়ে কি আধ্যাত্মিক বিষয়ে এই ধর্মগ্রন্থে প্রকাশিত জ্ঞান ও সৌন্দর্যের তুলনা মেলা ভার।

যুগ যুগ ধরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ যে যে রূপে ভজনা করেছে, তিনি তার কাছে সেই সেই রূপেই ধরা দিয়েছেন। ভক্তরা তাঁকে অকৃত্রিম বন্ধু, শ্রেষ্ঠ প্রেমিক, দুষ্টের যম, শিষ্টের রক্ষক রূপে পূজা করে থাকে। আবার অনেকের কাছে তিনি হলেন গোকুলের সেই রাখালিয়া যিনি তাঁর মোহিণী বংশীধ্বনিতে পথভ্রষ্ট মানুষদের পরমাত্মার প্রতি আকৃষ্ট করেন। ভক্তরা কত রূপেই না তাঁর আরাধনা করে থাকেন।

ধ্যানমগ্ন বালক দু'টিকে ঘিরে এক অনাবিল শান্তি বিরাজিত। মেজদার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় হলো। তাঁর কণ্ঠ থেকে ধীরে ধীরে নির্গত হয় কৃষ্ণনাম। সেই গভীর শান্তিময়তার মধ্যে প্রাণায়ামের সাহায্যে দু'জনেই স্থিত হলেন।

তাদের অন্তরের প্রার্থনা যতই বাড়তে থাকে ততই তাদের শরীরও নিশ্চল হয়ে আসে। অস্তে আস্তে ঘর জুড়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দলোকের সৃষ্টি হয়—আলোয় আলোময় হয়ে ওঠে। বাইরে সবাই যখন নিদ্রামগ্ন, তখন দুটি কিশোর শুধু ভক্তিনম্রচিত্তে অতন্দ্র। প্রার্থনা শুধু প্রার্থনা, কেবল সংগীত আর সংগীত—এই করেই রাত ক্রমশঃ ভোর হতে থাকে। মেজদার সঙ্গীর মনে ক্রমশঃ দেখা দেয় সংশয়, শরীর ক্লান্ত বোধ হয়।

"মুকুন্দ, আমরা বোধহয় ভুল করছি। এত সহজে তিনি আসবেন না।"

"এ চঞ্চলতা কেন? আরও নিবিষ্ট হয়ে প্রার্থনা করো। আমাদের অন্তরের আহ্বানে তিনি নিশ্চয়ই সাড়া দেবেন।"

আরও কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে যায়। শেষে মেজদার বন্ধুটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়ে হতাশ কণ্ঠে বলেনঃ "নাঃ, কোনই আর আশা নেই মুকুন্দ। ভালো করে চেয়ে দেখ ভোর হয়ে আসছে। চলো, একটু বিশ্রাম করে নিই।"

অনমনীয়ভাবে মেজদা বললেন, "তোমার মন না চাইলে তুমি যেতে পারো। আমি উঠবো না। তাঁর দেখা পেতে আজ যদি আমার মৃত্যু হয়, হোক্।"

হঠাৎ থেমে গেলেন মেজদা। দিব্য দর্শনের আনন্দে তাঁর দেহ যেন নিথর হয়ে গেল। মুখখানি শান্ত মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। চিৎকার করে উঠলেন, "দেখতে পেয়েছি। আমি দেখতে পেয়েছি গোকুল নন্দনকে।"

মেজদার বন্ধুর মনে দৃঢ়তা এবং আত্মিক দৃষ্টি—দুয়েরই অভাব ছিল। তাই তিনি বললেন "কোথায় তিনি মুকুন্দ? আমি তো তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না।" আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান মেজদা বললেন, "তুমিও পাবে। এসো, সরে এসো আমার কাছে।" এই বলে তিনি সংশয়গ্রস্ত বন্ধুর বুকে হাত ছোঁয়ালেন। মেজদার হাতের স্পর্শমাত্রই বন্ধুটির মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন হলো।

তিনি বলে উঠলেন, "আমিও পেয়েছি মুকুন্দ। আমিও কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছি।"

ওদের হৃদয় ভরে যায় এক স্বর্গীয় আনন্দে। দু'জনেই ভগবানের শ্রীচরণে সকৃতজ্ঞ প্রণাম করেন।

মেজদা বলতে থাকেনঃ "হে ঠাকুর, যমুনার তটে তটে তোমার সেই মোহন বাঁশির সুর আজ আর শোনা যায় না। তোমার বাঁশির সুর মানুষ, পশু, পক্ষী—সকলকেই আনন্দসাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো। মানুষের অন্তরে তোমার সেই সুরসঙ্গীত আবার ধ্বনিত হোক্। তারা যেন তাদের মুক্তির আলোক দেখতে পায়।

"হে প্রভু, আমার সাধনায় পূর্ণতা দাও। আমার ভক্তি গ্রহণ করে অনুগৃহীত করো। আমি তোমাকে প্রণাম করি। আমাকে ধন্য কর নাথ।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন—হাত তুলে বরাভয় দিলেন। তারপর মিলিয়ে গেলেন মহাশূন্যে।

দিব্য দৃষ্টিদান

মানুষ তার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি অনন্ত দৈবশক্তিতে মিশিয়ে সাধারণের ধারণায় অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলতে পারে। একথা মেজদা বিশ্বাস করতেন। তিনি বহুবার তাঁর সম্মোহন শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, এবং শুধুমাত্র স্পর্শের দ্বারাই অনেকের মধ্যে নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে সঞ্চালিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

একদিন বিকেলে মেজদা, মনোমোহনদা, অতুল্যদা (এক আত্মীয়) আর আমি গড়ের মাঠে বেড়াতে গেছি। ঘুরে ফিরে অনেক কিছু দেখলাম। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নামল—দূর আকাশে অন্ধকারের বুক চিরে ছোট ছোট আলোর চুমকির মত ফুটে উঠতে লাগলো এক একটি তারা। চারজন চুপচাপ বসে আছি, হঠাৎ মেজদা একটা তারার দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললেন, "ঐ দেখ চূড়োধারী কৃষ্ণ"।

সেই শান্ত পরিবেশ যেন ভেঙ্গে গেল এবং আমরা সকলেই বিস্ময়ে চমকে উঠলাম। মনোমোহনদা গভীর আগ্রহভরে খুঁজলেও সেই মনচোরাকে দেখতে পেলেন না। হঠাৎ অতুল্যদা বললেন, "আরে ঐ তো, দেখনা—দেখতে পাচ্ছো না তোমরা?" মনোমোহনদা আবার তাকিয়ে দেখেন, কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পান্ না। দুঃখ হতাশায় তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়। বহুদিন ধরে তিনি মেজদার নিত্যসঙ্গী এবং শুধু তাই নয় মেজদার সবরকম আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্খার শরিকও বটে। অথচ অতুল্যদা, যে কোনদিন সাধন ভজন করে না, তারই ভাগ্যে কিনা ঐ দিব্য মূর্তির দর্শনলাভ হলো। শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে আমারও খুব মন খারাপ হয়ে গেছলো!

যাই হোক ব্যথাভরা কণ্ঠে মনোমোহনদা মেজদাকে বললেনঃ "আমার সবই মিথ্যে ভাই। তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গী হওয়া আমার সাজে না। অতুল্যই তোমার যোগ্য সঙ্গী, তুমি ওকেই সব বলে দাও, দেখাও।"

এমনি আর একদিনের কথা। মেজদা ইতিমধ্যে 'পান' দর্শনবিদ্যা আয়ত্ত করেছেন। মনোমোহনদা এবং আমি মেজদার সঙ্গে মূক বধির স্কুলের মাঠে বসে আছি। তিনি আমাকে একটা তেল মাখানো পানপাতা আনতে বললেন। পাতাটি মনোমোহনদার হাতে দিয়ে বললেনঃ "একমনে হাতের এই পানটির দিকে চেয়ে থাকো, আর পরলোকের কারুর কথা চিন্তা করো। দেখবে তিনি তোমার এই পানপাতায় এসে দেখা দিচ্ছেন।"

অপলক চোখে পানের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনোমোহনদা বললেন, "এক অপরূপ সুন্দর নীলাভ মূর্তি দেখতে পাচ্ছি।"

মেজদা বললেন, "ওঁকে জিজ্ঞেস করো তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির কী অবস্থা।"

আমি জানি না তিনি কি উত্তর পেয়েছিলেন কিংবা মেজদাকেই বা কি জানিয়েছিলেন। শুধু এইটুকু বুঝলাম এই অভিজ্ঞতা তাঁর মনের পূর্বকার বিষণ্ণতাকে বহুলাংশে দূর করেছিল।

আরো কিছুদিন পরে আমরা তিনজনে নারকেলডাঙ্গার কবরখানা দেখতে যাই। দু'চার পা এগিয়েছি, মেজদা বললেন—'এসো প্রণাম করি কারণ হয়তো এখানেও কোন পুণ্যাত্মা রয়েছেন।' মেজদার দেখাদেখি আমরাও প্রণাম করলাম। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন আমার মনে সেদিন আসেনি। ভয় পেয়েছিলাম কিনা তাও বলতে পারবো না। শুধু এইটুকুই জানি ওঁর সঙ্গে থেকে থেকে অলৌকিক ব্যাপারে আমি ক্রমশঃ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম। আর সব চেয়ে বড় যেটি শিখেছিলাম তা হলো—নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতনতাই হচ্ছে প্রকৃত জাগরণ। তাই চিন্তা, বুদ্ধি, বিবেক আর কর্ম দিয়ে অসম্ভবকেও সম্ভব করে তোলা যায়।

মায়ের অশরীরী মূর্ত্তির দর্শনলাভ

মেজদার সঙ্গে আমি সদা সর্বদা ছায়ার মতো ঘুরতাম। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং যেখানে যেতেন, আমাকে সঙ্গে নিতেন। আমরা দু'জনে একদিন ৫০নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের এক স্কুল বাড়ীতে গেলাম। বাড়ীটা দেখেই আমি বলে উঠলাম, 'এই বাড়ীতেই তো আমাদের 'মা' মারা গিয়েছেন।'

মেজদা বল্লেন, 'এই বাড়ীতে এখন এক মহাপুরুষ বাস করেন। তাঁর নাম শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত। ইঁনি এই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক এবং 'রামকৃষ্ণ কথামৃতে'র লেখক। ইঁনি একজন গুপ্ত সাধক এবং মায়ের ভক্ত।' মেজদা আগেও এখানে এসেছেন, আজ আমাকে মহাপুরুষের কাছে নিয়ে এসেছেন।

শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে সবাই 'মাস্টার মহাশয়' বলেই সম্বোধন করতেন। আমরা যখন উপস্থিত হই, তখন সন্ধ্যে হয়েছে। উনি তখন পুজোর ঘরে আহ্নিক করছিলেন। আমরা প্রণাম করতেই তিনি আমাদের স্নেহভরে বসতে বলে পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন—কে কি পড়ি, কোথায় থাকি ইত্যাদি। ওঁর মধুর হাসি আর এত স্নেহ দেখে মনে হলো যেন আমরা কতকালের পরিচিত। তাঁর পবিত্র সংস্পর্শে এসে আমি সত্যই নিজেকে বিশেষ ভাগ্যবান বলে মনে করেছিলাম।

ওঁর ঠাকুরঘরে দেখলাম মস্ত একটি কালীমূর্তির পট বেদীর উপর রাখা। মা কালীর পাদমূলে লাল জবাফুল ও গলায় জবাফুলেরই মালা। উনি যখন ধ্যানস্থ হয়ে থাকতেন তখন আমরা হয় ওনার পাশে কিংবা পিছনে চুপ করে বসে থাকতাম। এক অপূর্ব আনন্দে ভরপুর হয়ে যেতাম।

আমরা প্রায়ই ওঁর কাছে গিয়ে বসে থাকতাম। একদিন আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি এই ভুতের বাড়ীতে কি করে একলা থাকেন? বললাম —মা যখন এ' বাড়ীতে প্রথম আসেন তখন তাঁর মনে কেমন একটা অজানিত ভয় দেখা দিয়েছিল। তারপর এই বাড়ীতেই বড়দার বিবাহের ঠিক আগে মা এবং মাসতুতো ভাই কলেরায় মারা যান। পরে যখন বাড়ি ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে আসি, তখন লোকমুখে শুনি—এটা ভুতের বাড়ি। আমাদের পারিবারিক দুর্ঘটনার আগে আর একজন বিবাহ উপলক্ষে ঐ বাড়ী ভাড়া করেছিল।

আশ্চর্য্যের ব্যাপার—বিয়ের পরদিনই বাড়ীর কর্তা এবং নতুন বর কলেরায় মারা যায়। আর একবার অন্য একজনদের বিয়ের দিনই ছাদনা তলায় বর মারা যান। এইসব দুর্ঘটনার পর থেকেই বাড়ীটা খালি পড়ে থাকে—কেউ ভাড়া নেয় না। যারা জানে না তারাই বিয়ে উপলক্ষে বড় বাড়ী দেখে ভাড়া নেয়। আমাদের দুর্ঘটনার পর থেকে সকলেরই বিশ্বাস—বাড়ীটা ভূতুড়ে বাড়ী।

মাস্টার মশাই বললেন, 'বাড়ীটাকে খালি পড়ে থাকতে দেখেই আমি এটা স্কুলের জন্য ভাড়া নেই। আমি স্বয়ং মা কালীর সন্তান ও ভক্ত। ভূতপ্রেত আমার কি করবে? তবে একথা ঠিক যে এক আত্মঘাতী অশরীরী এই বাড়ীতে বাস করতো। তাই অন্য কেউ এ' বাড়ীতে বাস করতে এলেই সে তার অনিষ্ট সাধন করতো। আমি আসার পর সে আমাকেও অনেক ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমি মা কালীর বরপুত্র, তাই আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। অবশেষে মুক্তির জন্য অনেক কান্নাকাটি, বহু অনুনয়-বিনয় করতে থাকে। তার মুক্তির জন্য আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাই এবং অনেক যাগযজ্ঞও করি। সে মুক্তি পায় এবং তারপর থেকে এ'বাড়ীতে আর কোন উৎপাত দেখা যায়নি।'

একদিন ওঁনার বাড়ীতে গিয়ে দেখি উনি মা কালীর পটের সামনে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। আমরা দু'জনে চুপ করে তাঁর পিছনে গিয়ে বসলাম। মা কালীর মূর্তির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দেখি মায়ের চোখ দুটি নড়ছে এবং তিনি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে মেজদা ও আমি পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছি, এমন সময় মাস্টার মশাই আমাদের দিকে পিছন ফেরা অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করলেন, "কি দেখছ?" মাস্টার মশাই জানতেন মা কালী সজীব মূর্তিতে দর্শন দিয়ে আমাদের আশীর্বাদ করেছেন।

আর একবার আমরা মাস্টার মশাইকে বললাম—আমরা যাতে আমাদের পরলোকগত মাতাকে দর্শন করতে পারি সেই ব্যবস্থা তিনি যেন করে দেন। প্রথমে তিনি কিছুতেই রাজী হননি। অনেক অনুনয়-বিনয় করাতে বললেন: "মঙ্গলবার সন্ধ্যারপর এসো। কিন্তু কথা দাও অধীর হবে না, বা বেশীক্ষণ তাঁকে আটকে রাখবে না।" আমরা তৎক্ষণাৎ তাঁর সব কথাতে রাজী হয়ে গেলাম।

নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার সময় মাস্টার মশাই গভীর ধ্যানে বসলেন। আমরাও অধীর আগ্রহে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। এইভাবে প্রায় দু'ঘণ্টা অতিবাহিত হলো। মহান সাধক তখনও ধ্যানমগ্ন। তারপর আমাদের দিকে না ফিরেই আস্তে আস্তে বললেন, "তোমরা পিছন ফিরে দেখ দরজায় কে দাঁড়িয়ে আছেন।" আমরা দেখি আমাদের স্নেহময়ী মা দরজার দু'দিকে দুটি হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন এবং মৃদু মৃদু হাসছেন।

আমরা মা মা বলে চীৎকার করে কেঁদে উঠে কাছে যাবার চেষ্টা করতেই মাষ্টার মশাই নিষেধ করে বললেন, "স্থির হয়ে বসো। তবে ইচ্ছে হলে কথা কইতে পার।"

আমরা বললাম, "মা, তুমি কি আমাদের ভুলে গেছ?"

মা খুব মিষ্টি পরিষ্কার স্বরে বললেন, "তোমাদের সকলকার উপর আমার সর্বদা দৃষ্টি আছে। মা কালী তোমাদের সব সময় রক্ষা করছেন।" এই বলে তিনি শূন্যে মিলিয়ে গেলেন।

আমরা এই অভাবনীয় ঘটনার কথা বাবা ছাড়া আর সকলের কাছেই গোপন রেখেছিলাম। তিনি শুধু একটু মৃদু ভর্ৎসনার ছলে বলেছিলেন, "বিগত আত্মাকে এ'রকম করলে তাকে কেবল কষ্ট দেওয়াই হয়।" তারপর থেকে মাকে বহুবার স্বপ্নে দেখলেও সেদিনের মত আর কখনও অমন প্রত্যক্ষভাবে দেখিনি।

মা কালী

ছোটবেলায় মেজদা ঈশ্বরকে মা ভগবতী রূপে পূজা করতেন এবং যৌবনে তাঁকে তিনি মা কালী রূপে আরাধনা করতেন। খৃস্টানরা ঈশ্বরকে 'পিতা'রূপে সম্বোধন করেন। পরব্রহ্মকে 'মা ভগবতী'* রূপে চিন্তা হিন্দুদের নিজস্ব অবদান। পার্থিব জীবনে মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক খুবই নিবিড় হয়, কারণ তিনি সহজেই সন্তানকে ক্ষমা করেন এবং তাঁর ভালবাসাও হয় নিঃস্বার্থ। সন্তান ভাল বা মন্দ যাই হোক্ না কেন, মা সবসময় তার প্রয়োজনে সাহায্যের হাতটি বাড়িয়ে দেন।

করুণাময়ী মা কালীর রূপের যে ব্যাখ্যা আমি এখানে লিখছি, সেটি আমি শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রী মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজের কাছ থেকে পেয়েছি। আমি তাঁর কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ।

মা কালী হচ্ছেন পরমা শক্তিরূপিনী। যা অতীতে ছিল, বর্তমানে যা আছে এবং ভবিষ্যতে যা থাকবে—এ সমস্ত কিছুরই প্রতীক হলেন মহাকালী। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—একই মহাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এই লয় শক্তি কিন্তু কোন অশুভের দ্যোতক নয়। গাছের জন্ম হয় যেমন বীজ থেকে, বাল্য যেমন সূচিত করে যৌবনের আগমন, তেমনি মৃত্যুও নিয়ে আসে অমরত্বের স্বাদ। ভারতীয় ঋষিরা তাই ধ্বংসের মধ্যে দেখেছেন তাঁর অনুপম সৌন্দর্য, অপার করুণা। মনে রাখতে হবে, মা হলেন করুণাময়ী, সৌন্দর্যময়ী। তিনি শুধু ধ্বংসই করেন না, বিশ্বকে সৃজন ও পালনও করেন। একাধারে সৃজন ও লয়—এই দুই রূপের ভিতর দিয়ে মহাকালী প্রকৃতি জগতের সঠিক রূপটি প্রকাশিত করেন। তাঁর ব্রহ্মময়ী রূপটি ধ্যানের মধ্যে দিয়েই জানা যায়।

* পরমহংস যোগানন্দজী বলেছেন, ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের কাছে পিতা, মাতা, বন্ধু ও প্রিয়তম রূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। [প্রকাশকের মন্তব্য]

† 'দিব্যবাণী'র (Whispers from Eternity) 'আমি তোমাকে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নৃত্যের মধ্যে দেখি' নামক অংশে শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দজী, তাঁর মহাকালিকার সৃষ্টি নৃত্যলীলার অপূর্ব দিব্যদর্শনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। (প্রকাশকের মন্তব্য)

মা কালী হলেন চতুর্ভুজা। ডান হাত দু'টির মধ্যে একটি হলো বিশ্ব-সৃজন শক্তির প্রতীক এবং অন্যটি দিয়ে তিনি ভক্তকে বর ও অভয়দান করছেন। বাঁ হাত দু'টির মধ্যে তিনি একটিতে ধারণ করে আছেন খড়্গ এবং অন্যটিতে কর্তিত নরমুণ্ড। তিনি যে একাধারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষাকারিণী এবং ধ্বংস-কারিণী পরমা শক্তি তারই প্রতীক হলো এই দুই বাহু। প্রকৃতির বিরুদ্ধবাদিনী শক্তির এমন সুন্দর সামগ্রিক অভিব্যক্তির ছবি পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। একই অঙ্গে ঈশ্বরের নিঃস্বার্থ প্রেম এবং সৃষ্টির অবশ্যম্ভাবী পরিণতির প্রকাশের কল্পনা আর কোথাও করা হয়েছে কিনা সন্দেহ।

পরমেশ্বরী মহাকালী নৃমুণ্ডমালিনী। পঞ্চাশটি নৃ-মুণ্ড মালার মত তাঁর কণ্ঠকে বেষ্টন করে আছে। এই নরমুণ্ড সাধারণ অর্থে জ্ঞান এবং বিশেষ অর্থে সংস্কৃত ভাষার পঞ্চাশটি বর্ণের প্রতীক। আর্য ঋষিরা নাদব্রহ্ম থেকে এই সুপ্রাচীন ভাষার উৎপত্তি বলে নির্ধারণ করেছেন। সৃষ্ট জগতে বিধি-সম্মত ও বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনার জন্য তাঁরা এই শব্দব্রহ্ম থেকেই মন্ত্রের উৎপত্তি করেছেন। অতএব দেবী কালিকার গলার নরমুণ্ডমালা জ্ঞান এবং সৃষ্টির অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতীক রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে।

মায়ের আলুলায়িত কেশরাশি যেন এক মায়া আবরণ, যা দিয়ে বিচিত্র পৃথিবীর চরম তত্ত্বকে তিনি আবৃত করে রেখেছেন।

মায়ের রং কালো। আলো-আঁধারির প্রত্যন্তদেশ যেখানে, সেখানেই সৃষ্টির সুরু। মা কালী হলেন সৃষ্টির আদ্যাশক্তি, তাই তাঁর স্বাভাবিক বর্ণও কালো। আদিতে সৃষ্টি আকারহীন ছিল। কালো নিরাকারের দ্যোতক। কালো অর্থে আমরা বর্ণহীনতা ও বৈচিত্র্যহীনতা বোঝাই। তাই এই সর্বত্র বিরাজিত, সর্বজ্ঞ মহাকালীর মধ্যেই সকল ধর্ম, সকল জ্ঞান, সকল সত্য এসে লীন হয়ে গেছে।

মা দিগম্বরী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসীমতা বোঝাতেই তিনি দিগ্‌বসনা।

মায়ের কটিদেশ মানুষের কর্তিত হাত দিয়ে বেষ্টিত। হাত দিয়ে মানুষ কাজ করে। জীবমাত্রই কর্মফলের প্রভাবে মহাকালের অবিদ্যায় আশ্রয় নেয়। আর সেই কারণেই তাকে বারবার পার্থিব জগতে ফিরে আসতে হয়। তাইতো ব্রহ্মময়ীর কটিতে স্থান পেয়েছে অজ্ঞ মায়াবশ মানুষের হাত।

মা ত্রিনয়নী। তাঁর ত্রিনয়নে রয়েছে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি—যারা প্রত্যেকেই অন্ধকার বিদূরিত করে। এই ত্রিনয়নে তিনি ত্রিকাল লক্ষ্য করছেন। তিনি তাঁর নয়নের অবিদ্যা বিনাশিনী জ্যোতি দিয়ে মানুষের কাছে প্রকাশিত করেন সত্য, শিব ও সুন্দরকে।

মা তাঁর বক্ষের পুণ্য পীযূষধারায় তাবৎ সৃষ্ট জগতকে প্রতিপালন করেন এবং সাধকদের তাঁর পরমা উপস্থিতির অমৃতস্বাদ দেন।

মা তাঁর শুভ্র সুচারু দশনপংক্তি দিয়ে রক্তরাঙ্গা জিহ্বাকে দংশন করছেন। সাদা রং সত্ত্ব এবং লাল রজঃ গুণের প্রতীক। এইরূপ জিহ্বা দংশনের মধ্য দিয়ে তিনি যেন বোঝাতে চাইছেন ভেদাভেদ জ্ঞান বিশিষ্ট, পবিত্র, উন্নতিদায়ক সত্ত্বশক্তির সাহায্যে প্রকৃতির কর্মপ্রদায়িনী রজঃশক্তিকে সংযত করা কর্তব্য।

ব্রহ্মপুরুষ শিব মায়ের পদতলে শায়িত—মায়ের একটি পা শিবের বক্ষোপরি স্থাপিত। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকালে পরমাত্মা প্রকৃতির বশ হন এবং মা কালিকাই জগৎ পালয়িত্রী হন্। কিন্তু যে মুহূর্তে প্রকৃতির সঙ্গে পরমাত্মার মিলন হয়, তখনই মহাপ্রকৃতি বশীভূত হয়ে পড়েন।*

প্রায় শ্মশানেই মহাশক্তির পূজা করা হয়ে থাকে। শ্মশান হচ্ছে শবের স্থান। মানুষ তার কর্মসেরে এখানে চিরবিশ্রাম গ্রহণ করে। এখানে মা কালী থাকেন। সকলেই তাঁর আশ্রয়ে বিশ্রাম পায়। শ্মশানবাসিনী মা কালী আমাদের সকল শোকতাপ, উদ্বেগ, বিচ্ছেদবেদনা মুছিয়ে দেন।

মা কালীকে আমরা বলি ভীষণবদনা—দেখলেই মনে ভয়ংকর ভয়ের সৃষ্টি হয়। শয়তান কোনদিন তাঁর কাছে ক্ষমা পায় না। কিন্তু মায়ের মুখের হাসিটি বড়ই মধুর, বড়ই দাক্ষিণ্যে ভরা। কালিকারূপিণী এই মহাশক্তিই আবার বিশ্বের সকল জীবজগতের এবং মানুষেরও পরমাজননী। তাঁর শক্তির সীমাপরিসীমা নেই। তবু ফুলের মত কোমল ভালবাসা দিয়ে করুণাময়ী মা তাঁর সন্তানদের লালন-পালন করেন।

হিন্দুরা ঈশ্বরকে পরম মাতৃরূপে দেখেছেন। তারা সেই পরমাকে শুধু মা বলে ডেকেই ক্ষান্ত হননি, বিশ্বের সর্বত্র মায়ের একটি রূপই দেখেছেন: 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'। সকল মায়ের মধ্যে মাকে নিরীক্ষণ করতে শিখে আমরা সব মানুষকেই আপন ভাই করে নিয়েছি। 'হিন্দু ভক্ত-সাধক মায়ের পায়ে নিজের ক্ষুদ্র আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে বিশ্বমানবকে ভাই বলে ডাকে। সর্বত্র মাতৃরূপ দর্শন করে সাধক কামকে জয় করে। কাম জয় করতে পারলেই প্রেমী হওয়া যায়। প্রেম আমাদের ভেতরের ক্ষুদ্রতাকে দূর করে মানুষের একতাকে দৃঢ় করে তোলে। এই জাতীয় ঐক্যই আজকের দুনিয়ায় আমাদের সব থেকে বেশি প্রয়োজন।

বাড়ীতে মেজদার শেষ কালীপূজা

মেজদার তপস্যার গভীরতা যতই বাড়তে লাগলো, ততই মা ভগবতীর সাকার মূর্তি উপাসনা করার আগ্রহ কমতে থাকল, নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনায় তিনি মনোনিবেশ করলেন। আমাদের গড়পার রোডের বাড়ীতেই মেজদা নিজ হাতে কালী প্রতিমা নির্মাণ করে শেষবারের মত তাঁকে পূজা করেছিলেন। আমি-

* শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দজী তাঁর 'দিব্যবাণী' (Whispers from Eternity) গ্রন্থে লিখেছেন: 'শিব হলেন লোকত্তর পরম ব্রহ্ম (পার্থিব জগতে তিনি নিষ্ক্রিয়)। তিনি তাঁর 'শক্তিরূপিণী' মা কালীকে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ক্ষমতা দিয়েছেন। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে বলা হয়েছে—কালীর চরণ যখন শিবের বক্ষ স্পর্শ করে তখন ব্রহ্মাণ্ডের বিলোপ হয়। অর্থাৎ সসীম যখন অসীমের সঙ্গে মিলিত হন তখন দৃশ্য চরাচর পরম সত্তায় লীন হয়। (প্রকাশকের মন্তব্য)

ও তাঁকে সেই ব্যাপারে সাহায্য করেছিলাম। কুমোরদের মত প্রথমে খড় আর টুকরো টুকরো কাঠ দিয়ে কাঠামোটা তৈরী করে শেষে তার ওপর মাটি লাগিয়ে প্রতিমার অবয়ব বানালেন। দিন কয়েক পরে মূর্তিটির কয়েকস্থানে ফাটল দেখা দেওয়ায় পাতলা কাপড় জলে ভিজিয়ে সেই সব ফাটলে লাগিয়ে দিলেন। মূর্তির চুল তৈরী হয়েছিল পাট দিয়ে। এই পাট জোগাড় করতে গিয়ে বেশ মজা হয়েছিল। যে সময়ের কথা লিখছি সেই সময় আপার সার-কুলার রোড দিয়ে গোরু আর মহিষের গাড়ীতে করে পাটের গাঁট নিয়ে যাওয়া হতো। মেজদা আমাকে সুকিয়া ষ্ট্রীটের মুখে দাঁড় করিয়ে নিজে চলে গেলেন মানিকতলার মোড়ে। গাড়োয়ানের অজান্তে পিছন দিক থেকে ঝুলে পড়া পাট দু'জনে মিলে বেশ খানিকটা জোগাড় করলুম। তারপর বাড়ী এসে সেগুলির উপর কালো রং চড়িয়ে মায়ের চুল তৈরী করা হলো।

মেজদার সঙ্গে থেকে কাজ করে আমিও দেবীমূর্তি গড়তে শিখে নিয়েছিলাম। মেজদা নিজ হাতে মূর্তি গড়া ছেড়ে দেবার পর অন্ততঃ পাঁচ বছর সেজদি (নলিনী) আর আমি দু'জনে মিলে ঐ রকম মূর্তি গড়ে শ্যামাপূজা করেছিলাম।

ইতিমধ্যে সেজদির সঙ্গে বাদুড়বাগানের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক শ্রী পঞ্চানন বসুর বিবাহ হয়। মেজদা ও সেজদির মধ্যে পারস্পরিক স্নেহ-ভালবাসার আকর্ষণ ছিল খুব বেশি। বাড়ীতে মেজদা প্রায়ই উৎসব করতেন আর সেজদি আড়ালে থেকে তার খরচ জোগাতেন। এ সমস্ত ব্যাপার আমার জানার সুযোগ হতো না, যদি না একদিন মেজদা আমাকে সেজদির বাড়ী থেকে ওর হারমোনিয়ামটি আনতে পাঠাতেন। মেজদা বাড়ীতে কোন উৎসব হলে আমাকে একখানি চিঠি দিয়ে সেজদির কাছে পাঠাতেন ওঁর হারমোনিয়ামটি আনতে। সেজদি ঐ হারমোনিয়াম বাক্সে লুকিয়ে টাকা দিয়ে দিতেন। একদিন কৌতূহলবশে বাকসের ডালা খুলতেই সব আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

সেজদি এইরকম ভাবে মেজদার নানা আধ্যাত্মিক কাজে সাহায্য করে গেছেন। ডাক্তার বসু তাঁর চিকিৎসা বৃত্তি থেকে প্রচুর টাকা রোজগার করতেন এবং সে'জন্যই সেজদির পক্ষে খরচ যোগানো সম্ভব হতো। ডাক্তারবাবু সত্যিকারের পরোপকারী ছিলেন। গরীবের কাছে ফী নেওয়া তো দূরের কথা, পথ্য ও ঔষধের জন্য বরঞ্চ তাদের টাকা দিয়ে আসতেন। আমাদের আত্মীয়দের তিনি বিনা ফীতেই চিকিৎসা করতেন।

মেজদার তন্ত্রসাধনা

মেজদা তাঁর অধ্যাত্ম পথসন্ধানে সবরকম পথ সম্বন্ধেই বিশেষ ঔৎসুক্য দেখিয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা নিমতলা মহাশ্মশানে যেতেন। এখানেই আমাদের মায়ের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়েছিল। চারিদিকে মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি এই নশ্বর দেহের অপরিমেয় বাসনা-কামনা এবং সেই দেহের

প্রতি অর্থহীন আকর্ষণের কথা মনে মনে ভাবতেন। প্রথমদিকে আমিও কয়েকবার তাঁর সঙ্গে গিয়েছি। মেজদা সেখানে আপন চিন্তায় তন্ময় হয়ে থাকতেন, কিন্তু সেই পরিবেশে আমার বড়ই ভয় করতো। শেষাশেষি আমি আর সেখানে যেতে চাইতাম না। কয়েকদিন পরে দেখি ঘোর লাল রংয়ের কাপড় পরা এক জটাধারী প্রায়ই মেজদার সঙ্গে বাড়ীতে আসছেন এবং সোজা তাঁর ছাদের ঘরে গিয়ে ঢুকছেন। সেই লোকটির সর্বদা লাল চোখ এবং কপালে মস্ত সিঁদুরের ফোঁটা দেখে আমার কেমন যেন ভয় ভয় করতো।

একদিন ওঁদের দু'জনার অনুপস্থিতিতে আমি গোপনে মেজদার পুজোর ঘরে যাই। সেখানে দেখি একটি মড়ার খুলি ও দুইটি হাড় আড়াআড়িভাবে একটি কাঠের চৌকির ওপর রাখা রয়েছে। তাই দেখে আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে আসি। বাবা রাত্রে অফিস থেকে ফিরলে আমি তাঁকে মেজদার শ্মশান যাওয়া, জটাধারী সেই লোক এবং ওপরের ঘরে মরা মানুষের হাড়গোড় —সব কিছু বলে দিই। তারপরদিন বাবা মেজদাকে তন্ত্রসাধনার* ক্ষতিকর দিক্‌টার কথা বেশ শান্তভাবে বুঝিয়ে দিলেন। এরপর একদিন তান্ত্রিকটি এসে ঐ নরমুণ্ড ও হাড়গুলি নিয়ে চলে যায়। সেই থেকে মেজদা আর কখনো তন্ত্রসাধনা করেননি এবং অপরকেও ঐ সাধনা না করার জন্য উপদেশ দিয়ে গেছেন।

পচা দানা—নাকি চালের পায়স ?

ভারতবর্ষে এক ধরণের সাধু আছেন যাঁরা অদ্ভুত এক উপায়ে পার্থিব খাদ্যদ্রব্য বিষয়ে সব স্বাদ-আস্বাদের নিবৃত্তি ঘটিয়ে থাকেন। নানাপ্রকার শাকসব্জী ও মশলা মিশিয়ে তাঁরা এমন একটি বস্তু তৈরী করেন যা থেকে তার উপাদানগুলির আলাদা করে স্বাদ উপলব্ধি করা দুরূহ হয়ে পড়ে। কিছুদিন এইভাবে খাওয়া দাওয়া করলে জিভ তার স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

মেজদা নিজের খাওয়ার প্রতি আকাংখা নিবৃত্তির জন্য রন্ধন করার প্রচলিত সমস্ত পদ্ধতি ত্যাগ করে শাক্‌সব্জী ও তরিতরকারীর সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণে লবণ আর চিনি মিশিয়ে এমন একটি বস্তু তৈরী করলেন যা খেয়ে বোঝা গেল না সেটি কি। সত্যি বলতে কি সেটি ভয়ংকর অখাদ্যই হয়েছিল—শুধু বিস্বাদে

* শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান পালন এবং মন্ত্রশক্তির প্রয়োগ—এই হলো মোটামুটি তন্ত্রসাধনা। এর আসল উদ্দেশ্য হলো 'মায়া' শক্তিগুলিকে জানা তাকে বশ করা এবং আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনসাধন করা। আসল 'তন্ত্র' বলতে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলি যাকে বোঝায়, তার বিষয়ে জানে মুষ্টিমেয় কিছু তত্ত্বজ্ঞানী। যা সচরাচর দেখা যায় তা হলো এই শাস্ত্রের অপভ্রংশ। মানুষ জাগতিক ও সিদ্ধাই ক্ষমতা লাভের আশায় ঐগুলির চর্চা করে থাকেন। (প্রকাশকের মন্তব্য)

ভরা। মেজদা পাঁচ-ছ'দিন পরপর এ'রকম খাবার খেয়ে ভালমন্দ জ্ঞানের অনুভূতিটুকুকে পর্য্যন্ত শেষ করার প্রয়াস করেছিলেন।

একদিন মেজদা, সুরেনদা এবং আমি আপার সার্কুলার রোড ধরে শিয়ালদার দিকে চলেছি। মনে হলো, সামনের দিক থেকে একটা ভীষণ রকমের পচা দুর্গন্ধ যেন হাওয়ায় ভেসে আসছে। আমাদের গা গুলিয়ে উঠলো। মনে হলো এখুনি বুঝি বমি হয়ে যাবে। নাকে সজোরে রুমাল চেপে ধরেও সেই গন্ধ থেকে রেহাই পেলাম না। মেজদার কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। আরো কিছু পথ এগোলাম। একটা গরু আমাদের সামনে সামনেই চলছিল। হঠাৎ কি হলো কে জানে সে রাস্তার ওপারে গিয়ে ছুটতে শুরু করে দিলো। যে সামান্য কয়েকজন মানুষ ফুটপাতের ওপর দিয়ে হাঁটছিলেন তাঁরা হৈ হৈ করে এদিক-ওদিক সরে গেলেন। পথের যানবাহন থেমে গিয়ে দুর্গন্ধের কারণ জানতে চাইল।

মেজদার মধ্যে কিন্তু কোনরকম বিকৃতির লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি যেমন চলছিলেন তেমনি চলতে থাকলেন। সুরেনদা বললেন, "মুকুন্দ, তুমি কি ভাই কোনরকম গন্ধ টের পাচ্ছ না। আমাদের যে এদিকে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসার উপক্রম হলো।" মেজদা, সে'কথার জবাব না দিয়ে, শুধু একটু হেঁসে এগিয়ে চললেন। অনন্যোপায় হয়ে আমাদেরও ওঁর সঙ্গে চলতে হচ্ছিল।

সুরেনদা আবার বললেন, "আর এদিক দিয়ে নয় মুকুন্দ, চলো ওপার দিয়ে যাই। দেখছ না, সামনে কি সব পড়ে আছে—মাছি ভন্ ভন্ করছে? কয়েকটা আমাদের গায়েও এসে বস্ছে। এখন বুঝতে পারছি গোরুটা ঐ গন্ধের জন্যই এই ফুটপাত ছেড়ে রাস্তার অন্যদিকে পালিয়েছে।

মেজদার কথা আর আচরণ দেখে মনে হলো বুঝি তিনি প্রকৃতিস্থ নন। বললেন—"অবোধ জীব জানে না যে ভগবান সবখানেই আছেন, এমনকি এই পচা চালেও আছেন। কিন্তু আমি তা জানি বলেই ঐ পচা দুর্গন্ধযুক্ত চালও খেতে পারি।"

সুরেনদা একটু ঠাট্টার সুরেই যেন বললেন, "তুমি ঐ পচা চাল খেতে পারলে আমিও খেতে পারি!" মেজদা তৎক্ষণাৎ নীচু হয়ে সেই অখাদ্য চাল একমুঠো তুলে মুখে পুরে দিয়ে এমনভাবে চিবোতে লাগলেন যেন মনে হলো তিনি পরমান্ন খাচ্ছেন।

সুরেনদার মুখ দেখে মনে হলো তিনি যেন ভূত দেখেছেন—এইভাবে ছুটে পালালেন রাস্তার অন্য দিকে। মেজদা ঐ জিনিষ আর এক মুঠো তুলে সুরেনদার পিছনে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেললেন এবং জোর করে তার মুখে পুরে দিলেন। আমি চীৎকার করে বলে উঠলাম, 'এই মেজদা, করছো কি? দেখছো না ও ভিরমী খাচ্ছে?' সুরেনদা বমি করতে থাকেন—ওকে দেখে মনে হচ্ছিল এখুনি বুঝি দম্ বন্ধ হয়ে মারা যাবেন।" আমি প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বললাম, "মেজদা, কিছু হয়ে গেলে আমাদের পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে। ছেড়ে দাও ওঁকে; দেখছো না কি রকম হাঁফাচ্ছে!" মেজদা সুরেনদার বুকে পিঠে

হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হাসছিলেন। কিছুক্ষণ পর সুরেনদা সুস্থ হয়ে উঠে বললেন, "এই নাকে খৎ দিচ্ছি ভাই। এরপর তোমাকে কোন বিষয়ে চ্যালেঞ্জ জানাবার আগে শতবার ভেবে নেবো।"

কিন্তু যে বিষয়টি সেদিনের মত আজও আমার কাছে আশ্চর্য্য লাগে তা হলো—সেই ভীষণ পচা চাল মুঠো মুঠো খেয়েও মেজদার কোন ক্ষতি হয়নি। জানি না, যে জ্যোতি ভক্ত সাধকের সমস্ত ব্যথা বেদনা, জ্বালা যন্ত্রণা উপশম করে দেয়, সেই জ্যোতিই সেদিন মেজদা খাবার আগে ঐ পচা চালের দুর্গন্ধ দূর করে দিয়েছিল কিনা। আমি জানি মেজদা ছিলেন ঈশ্বরের একনিষ্ঠ ভক্ত। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভব ক্ষমতার বাইরে বিশ্বের সকল সৃষ্টির মাঝে যে ঈশ্বর গোপনে রয়েছেন, তাঁরই রসাস্বাদনে তিনি সর্বদাই নিজেকে নিমগ্ন রেখেছেন। সেদিনের ঘটনা আমার কাছে একথাই সুস্পষ্ট করে দিয়েছিল যে মেজদা একমেবাদ্বিতীয়মের সন্ধান পেয়ে গেছেন।

সাধন মন্দির ও সারস্বত লাইব্রেরী স্থাপন

আমার যতদূর মনে পড়ে ১৯০৮ সাল নাগাদ মেজদা তাঁর প্রথম আশ্রমটি স্থাপন করেন। আমাদের গড়পারের বাড়ীর নীচের ঘরে সকলকে নিয়ে একসঙ্গে সাধনভজন করতে মেজদার বিশেষ অসুবিধা হতো। সকলেই তাই একটা সুবিধা মতন স্থানের খোঁজ করতে থাকেন। পুলিনদা* কাঁকুড়গাছি এলাকায় বাগমারীতে নিজের বাড়ীর কাছাকাছি একটি গোলপাতার ছাউনি দেওয়া ঘর ঠিক্ করেন। মাসিক ভাড়া ছিল ১ টাকা ২৫ পয়সা (পাঁচ সিকা)। সেই ঘরটি ভাড়া নিয়ে মেজদা সেখানেই স্থাপন করেন তাঁর 'সাধন মন্দির'। মেজদা এই আশ্রমটি তৈরী করে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। আমরা সেখানে নিয়মিত যেতাম। মেজদা শাস্ত্র থেকে স্তোত্রপাঠ করতেন এবং আমরা সবাই মিলে কীর্তন, ভজন ও ধ্যান করতাম।

প্রতিদিন রাত্রে বাড়ীর সকলে ঘুমিয়ে পড়লে পর থামু চুপিচুপি একতলার বৈঠকখানা ঘরের দরজা খুলে মেজদাকে বাড়ীর বাইরে যেতে সাহায্য করতো। আর সকালবেলাও ঐ একই পথে মেজদা বাড়ী ফিরতো। থামুই তাকে ভোরবেলা দরজা খুলে দিতো। মেজদা রাতটা সাধন মন্দিরেই কাটাতেন। মেজদার এই যাওয়া-আসার কথা একমাত্র থামু ছাড়া বাড়ীর আর কেউই জানতো না।

এইরকম সময়েই প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ্ পূর্ণচন্দ্রের সংগে মেজদার পরিচয় হয়। মাঝে মাঝে আমাদের অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিতেন। ধর্মপ্রাণ তরুণদের পরিচালিত এই আশ্রম শীঘ্রই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ফলে

* শ্রীপুলিন বিহারী দাস। পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করে স্বামী শিবানন্দ নামে পরিচিত হন।

অভ্যাগতের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। সাধন মন্দিরের কাছেই 'পঞ্চবটী' নামে একটি সুন্দর বাগানবাড়ী ছিল। কখনো কখনো এই বাগানে মেজদা ওঁর ভক্ত ও বন্ধুদের নিয়ে ধ্যানে বসতেন।

মাত্র এক বছর হলো সাধন মন্দির এই বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ঘরটিতে সকলের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না, আর তাছাড়া স্থানটি আমাদের সকলের বাড়ী থেকে অনেক দূরেও বটে। এই রকম সময় আর্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী হরিনারায়ণ বসুর পুত্র তুলসী নারায়ণ বসুর সংগে আমাদের পরিচয় হয়।

মেজদার কাছে সব কথা শুনে তুলসীদা নিজেদের বাড়ীর পিছনে লাগোয়া মাঠের মধ্যে খোলার চালওয়ালা একখানি ঘরের বন্দোবস্ত করে দেন। ঘরটি কয়েকটা অংশে বিভক্ত। সাধন মন্দিরকে কাঁকুড়গাছি থেকে এই নতুন ঠিকানায় অর্থাৎ ১৭/১, পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য লেন, কলকাতা-৯-তে স্থানান্তরিত করা হয়। এখান থেকে একটা সরু গলি পার হলেই গড়পার রোডে পেঁছান যায়। এখানেই একটি গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হয়েছিল মেজদা যার নাম দিয়েছিলেন 'সারস্বত লাইব্রেরী'। লাইব্রেরীকে উপযুক্তভাবে সাজাবার জন্য তিনি বাড়ী থেকে নিয়ে গেলেন চেয়ার, টেবিল, আলমারী এবং অনেক বই ও ম্যাগাজীন। তুলসীদার ঘনিষ্ট বন্ধু প্রকাশ চন্দ্র দাস আমাদের কাজকর্মে আকৃষ্ট হয়ে তাতে যোগদান করে।

তুলসীদা ও প্রকাশদা দু'জনেই কিন্তু এই লাইব্রেরীর ব্যাপার নিয়ে মেজদার ওপর নিজেদের প্রভাব বাড়াতে চাইছিলেন। ওঁর কোন কথাতেই তারা বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। এতে মেজদা মনে মনে ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি ঠিক করলেন সারস্বত লাইব্রেরীকে অন্য স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাবেন। সৌভাগ্যক্রমে ঐ সময় আমাদের প্রতিবেশী উপেন মিত্রর সংগে মেজদার পরিচয় হয়। সব কথা শুনে তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, "কোন চিন্তা কোরো না। হরি নাগের বাড়ীর বৈঠকখানায় যাতে তুমি লাইব্রেরী করতে পার আমি তার ব্যবস্থা করছি।"

সমস্ত ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেলেও তুলসী এবং প্রকাশদা, মেজদাকে একখানা বই বা ম্যাগাজিনও সেখান থেকে সরাতে দিলেন না। এ'সব সত্ত্বেও কিন্তু মেজদা একটুও হতোদ্যম হলেন না। বললেন, 'গোরা, আমরা আবার নতুন করে লাইব্রেরী গড়ে তুলবো!' আর কিছু ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে নবীন উদ্যমে প্রতিবেশীদের দরজায় দরজায় ঘুরে তিনি বইপত্র সংগ্রহ করলেন এবং নতুন করে সারস্বত লাইব্রেরী* প্রতিষ্ঠা করলেন। লাইব্রেরীটি এখনও আছে। দীর্ঘদিন ওটি নাগ মহাশয়ের বাড়ীতেই ছিল। শ্রী হরি নাগের মৃত্যুর পর বইগুলিকে কিছুকাল একটা গুদামঘরে রাখা হয়। ১৯৭৮ সালের ৯ই মে তারিখে নাগ

* সারস্বত লাইব্রেরীর বর্ষ-বিবরণ থেকে জানা যায় যে এই লাইব্রেরী ১৯১০ সালের ১০ই জানুয়ারী স্থাপিত হয়েছিল।

মশায়ের বাড়ীর বিপরীত দিকে ৬৯নং গড়পার রোডের নতুন বাড়ীতে সারস্বত লাইব্রেরী পুনরায় চালু করা হয়।

১৯১০ থেকে ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত মেজদা কলেজের পড়াশুনায় নিযুক্ত ছিলেন এবং থাকতেন শ্রীরামপুরে নিজ গুরু স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছে। ১৯১৬ সালে মেজদা আবার তুলসীদার বাড়ীতে আশ্রমটি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। তখন তাঁর নাম হয়েছে স্বামী যোগানন্দ। পুরাণো সাধন মন্দিরকে নতুন করে সাজানো হলো—গড়ে তোলা হলো সভা গৃহ, পূজার বেদী, রান্নাঘর এবং শাস্ত্রী মশায়ের থাকার ঘর। তাছাড়া নানারকম চারাগাছ বসিয়ে অঙ্গনটিকে সাজানো হয়েছিল।

নিয়মিত সভানুষ্ঠান ছাড়াও ধর্মগ্রন্থ পাঠ, ধর্ম আলোচনা, ভজন ও কীর্তন গান এবং ক্রিয়াযোগ সাধনা চলতে লাগলো। সভাশেষে সকলকে ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হতো।

একদিন ধ্যান চলাকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র* আশ্রমে আসেন। ঘুরে ঘুরে তিনি আশ্রমের যাবতীয় কাজকর্ম দেখেন। যাবার সময় তিনি বলেন: "আপাততঃ পার্থিব জগতের কিছু কাজ আমাকে আগে শেষ করতে হবে। সেটাই এখন আমার ধ্যান। তাই চোখ বুঁজে শুধু ধ্যান করা এখন আমার চলবে না।"

দু'জন তরুণ আশ্রমিক ছাড়াও আরও অনেকেই আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভের আশায় আশ্রমে রোজ আসতেন। ১৯১৭ সালে মেজদা আশ্রম ও ছেলেদের স্কুলকে দিহিকায় নিয়ে যান এবং তারপর ১৯১৮ সালে সেখান থেকে রাঁচীতে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু তিনি সর্বদাই তুলসীদার বাড়ীতে তাঁর সেই আশ্রম জীবনের দিনগুলির কথা বিশেষভাবে স্মরণ করতেন। অনেক বছর পরে ঐ সম্পত্তিটি খরিদ করার জন্য মেজদা আমেরিকা থেকে টাকা পাঠান। সেখানে সভাগৃহ, বেদী ও বাসগৃহ সমেত নতুন করে যোগদা সৎসঙ্গ কেন্দ্রকে গড়ে তোলা হয়। এটি এখন 'যোগদা সৎসঙ্গ গড়পার কেন্দ্র' নামে সুপরিচিত।

* গোড়ার দিকে তিনি মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক রূপে ভারতবর্ষে সুপরিচিত হন্।

১০ মেজদার গুরুদেব ও কলেজ জীবনের দিনগুলি

মেজদার গুরুদেব স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি ও তাঁর দর্শনলাভ

মেজদা ১৯০৯ সালের জুন মাসে হিন্দু স্কুল থেকে এনট্রেন্স* পরীক্ষা পাশ করেন। বাবার কাছে তিনি এর আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে স্কুলের পড়াশুনা তিনি নিশ্চয়ই শেষ করবেন এবং সেই প্রতিজ্ঞার মর্যাদা তিনি রেখেও ছিলেন। তাই কিছুদিন বাদে যখন তিনি বললেন যে ঈশ্বরের সন্ধানে সংসার ত্যাগ করবেন, তখন আর কোনভাবে তাঁকে বাধা দেওয়া গেল না। জীতেন্দ্র নাথ মজুমদার, যাঁকে আমরা জীতেনদা বলতাম, তিনি শাস্ত্রী মশায়ের কাছে ইতিমধ্যেই দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং কাশীতে ভারত ধর্মমহামণ্ডল আশ্রমে বাস করছিলেন। মেজদা স্থির করলেন কাশীতে জীতেনদার কাছেই যাবেন। সেই-মতো বাবার অনুমতি নিয়ে তিনি কাশীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

মহামণ্ডল আশ্রমে মেজদা তাঁর সাধনকর্মে অধিকাংশ সময় নিয়োজিত থাকতেন। আশ্রমের অন্যান্য বাসিন্দারা কিন্তু মেজদার এই নিষ্ঠা বিশেষ সুনজরে দেখতো না—বরঞ্চ তিনি যে অধিক সময় নিরালায় থাকেন, এই নিয়ে তাঁকে বিদ্রূপ করতো। ফলে অন্যায়ভাবে তাঁর ওপর অনেক অতিরিক্ত কাজের ভার চাপিয়ে দেওয়া হতো। মেজদা সব বুঝেও নিঃশব্দে তা সহ্য করে যেতেন।

ছেলের যাতে কোন কষ্ট না হয় সেজন্য বাবা মাঝে মাঝে মণি অর্ডারে টাকা পাঠাতেন। একদিন মঠাধ্যক্ষ স্বামী দয়ানন্দজীর পরামর্শে বাবাকে সেই টাকা পাঠাতে বারণ করলেন মেজদা। কষ্ট দিনে দিনে বাড়তেই থাকে। এর ওপর ছিল অসময়ে খাওয়া—বেলা বারটার আগে আশ্রমে কোনরকম খাওয়ার ব্যবস্থাই ছিল না। বাড়ীতে মেজদা সকালবেলায় একটা ভাল রকমের জল-খাবার খেতে অভ্যস্ত ছিলেন। ফলে অত বেলা পর্য্যন্ত অনাহারে থাকায় তাঁর অসহ্য ক্ষুধা পেতো।

একবার দয়ানন্দজী কোন কাজে পনেরো দিনের জন্য আশ্রমের বাইরে ছিলেন। তাঁর ফেরার আগের দিন মেজদা কোন কারণে উপবাস করেছিলেন।

* ১৯০৯ সালে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসারে কাউকে কলেজে শিক্ষালাভ করতে হলে দুটো পরীক্ষা পাস করতে হতো। প্রথমটিকে বলা হতো এ্যানট্রেন্স পরীক্ষা-গ্রহণ করতেন বাংলা দেশের শিক্ষা দপ্তর। বিদ্যালয় জীবনের দশম বর্ষে স্কুল জীবনে শিক্ষণীয় সকল বিষয় অধিগত হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হতো। এরপর যারা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে ইচ্ছুক তাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জনের জন্য বসতে হতো। এনট্রেন্স পরীক্ষা শেষবারের মত গ্রহণ করা হয় ১৯০৯ সালে। ১৯১০ সাল থেকে কলেজে শিক্ষাগ্রহণেচ্ছুক বিদ্যার্থীদের শুধু ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষাতেই অবতীর্ণ হতে হতো। দশম শ্রেণীর ছাত্রদের তখন বলা হতো ম্যাট্রিকুলেশান স্ট্যানডার্ডের ছাত্র। (প্রকাশকের মন্তব্য)

উপবাসের কষ্টকে ভোলার জন্য তিনি মনে মনে চিন্তা করেছিলেন দয়ানন্দজী ফিরে এলে পরদিনের মধ্যাহ্ন ভোজটা নিশ্চয়ই একটা ভালরকমের ব্যাপার হবে। মেজদা তাই দয়ানন্দজীর আগমনের জন্য অধীর আশায় অপেক্ষা করছিলেন। যে কোন কারণেই হোক্ দয়ানন্দজীর ট্রেন সেদিন আসতে দেরী করছিল। দয়ানন্দজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আশ্রমের সকলেই তাঁর স্নান ও উপাসনা সমাপন না হওয়া পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকতে মনস্থ করলেন। মেজদার খালি মনে হচ্ছিল ক্ষুধার জ্বালায় তিনি বোধহয় আর বাঁচবেন না। মনে পড়ছিল বাড়ীর কথা —কত আদর যত্নেই না তিনি সেখানে বড় হয়েছেন। যাই হোক্ শেষ পর্য্যন্ত রাত নটার সময় খাবার জন্য সকলের ডাক পড়লো।

স্বামীজী যে একজন প্রকৃত ত্যাগী পুরুষ, দেহের প্রয়োজনের প্রতি তিনি যে বিন্দুমাত্রও মনোযোগ দিতেন না—সেকথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তিনি মেজদাকে বলেছিলেনঃ "ভগবানের শক্তিতেই আমরা বেঁচে থাকি। টাকা পয়সা, খাওয়া-দাওয়া প্রাণ নামক বস্তুটিকে ধরে রাখার সাহায্য যন্ত্র মাত্র। তাই সবার আগে মানুষকে এই দেহযন্ত্রের ওপর নির্ভরতা ত্যাগ করতে হবে। তা নাহলে সে জীবনের পরম কারণকে কোনদিনও অনুভব করতে পারবে না।"

স্বামীজীর কথাগুলি মেজদাকে মুগ্ধ করে, কারণ তাঁরও জীবনের পরম কামনা হলো ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া। স্থির করলেন, নিজের সকল পার্থিব সামগ্রীকে বিসর্জন দেবেন। অপ্রয়োজনীয় জিনিষের খোঁজে নিজের বাক্স-পেঁটরা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখলেন, মাকে সাধু যে রূপার কবচটি দিয়েছিলেন, সেটি আর সেখানে নাই। মনে পড়ে তাঁর সাধুটির ভবিষ্যৎবাণীঃ "প্রয়োজন শেষ হলেই, কবচটি যেখান থেকে এসেছে সেখানে আবার চলে যাবে।"

যাঁর সন্ধানে তিনি সর্বকিছু ত্যাগ করে এসেছেন তাঁকে তখনো না পাওয়ায় এক অজানা বিষাদ ও অস্থিরতায় তাঁর মন ভরে যায়। এমনি মানসিক অবস্থার মাঝে একদিন সকালবেলা উপাসনায় বসে তাঁর মনে হলো কে যেন তাঁকে অন্তরে বলছেঃ "মনকে শান্ত করো। তোমার গুরু আজই আসছেন।"

সেইদিন মেজদাকে কিছু কেনাকাটা করার জন্য আশ্রমের এক পুরোহিতের সংগে বাজারে যেতে বলা হলো। ঘুরে ঘুরে অনেক জিনিষ কেনার পর ওঁরা একটা ছোট গলির মধ্যে ঢুকলেন। গলিটার শেষ প্রান্তে গেরুয়া বসনধারী সৌম্যদর্শন এক সন্ন্যাসী দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর দেহ বেশ ঋজু ও শক্তসমর্থ। তাঁর তেজঃপূর্ণ মুখখানিকে আবৃত করে রেখেছিল দীর্ঘ বাবরী চুল এবং ছুঁচালো দাড়ি। মেজদা তাঁকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন—মনে হলো যুগ যুগান্ত ধরে যেন তিনি তাঁকে চেনেন। ইচ্ছে হলো তাঁর সংগে কথা বলেন। এদিকে দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে সঙ্গীটি তাঁকে তাড়া দিচ্ছেন আশ্রমে ফেরার জন্যে। অগত্যা মেজদাকেও তাঁর সংগে যেতে হলো। কিছুক্ষণ পরে তাঁর মনে হলো পা'টা যেন ভারী ভারী লাগছে—মনে হচ্ছে যেন মাটিতে বসে যাচ্ছে। বুঝতে পারেন, সন্ন্যাসী তাঁকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছেন। বিস্মিত, স্তম্ভিত

পুরোহিতের কাছে নিজের হাতে ধরা জিনিষপত্র সমর্পণ করে মেজদা ছুটে গেলেন সেই সন্ন্যাসীর কাছে। তারপর সাধুটির কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে তাঁর চরণদু'টি জড়িয়ে ধরে বিগলিত কণ্ঠে মেজদা শুধু বলে ওঠেন, "গুরুদেব !"

মনে হলো অন্তরে বসে কে যেন তাঁকে বলছেঃ "এই তো সেই, যাঁকে তুমি স্বপ্নে দেখেছ।" তিনি শুধু অর্ধস্ফুট স্বরে বলতে থাকেন, "কত বছর ধরে আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। আমি জানি, আপনি, শুধু আপনিই পারেন আমাকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে।"

সন্ন্যাসী মেজদাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে বলে ওঠেন, "প্রাণাধিক্, তুমি এসেছ ! কতকাল আমি তোমারই জন্যে অপেক্ষা করে আছি!" তারপর মেজদার হাত ধরে তিনি এগিয়ে চলেন রাণা মহলের দিকে। সেখানে গঙ্গার ধারে তাঁর মায়ের বাড়ী। তিনি মায়ের কাছে বেড়াতে এসেছেন। বাড়ীর দোতলার বারান্দায় বসে তিনি মেজদাকে বলেন—'আমার আশ্রম আর অন্য যা কিছু আমার আছে সব তোমাকে দিয়ে যাবো।'

মেজদা তাতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে শুধু বলেন, "ভগবান-ধন ছাড়া অন্য কোন কিছুতেই আমার লোভ নেই।"

সাধুটি বলেন, "আমি তোমাকে আমার নিঃস্বার্থ ভালবাসা দিলাম।"

তারপর তাঁরা আহারের জন্য অন্য ঘরে গেলেন। সাধুটি সেখানে হঠাৎ বললেন, "কবচের কাজ ফুরোতে সে চলে গেছে। বেনারসের ঐ আশ্রমে তোমার আর থাকার কোন দরকার নেই। সবার আগে তুমি কোলকাতায় ফিরে যাও। যে বিশ্বপ্রেমের প্রেমী হতে চাইছ, তা থেকে আত্মীয়-পরিজনদের বঞ্চিত করছ কেন ? হিমালয়ের কোলে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে জ্ঞান পাওয়া যায় না। তার জন্য প্রয়োজন সদগুরু সঙ্গ।"

কাশী যাবার আগে বড়দার সেই মন্তব্য মেজদার মনে পড়ে যায়ঃ "নতুন পাখী আধ্যাত্মিক আকাশের মোহে এখন উড়ুক না। ভারী বাতাসে দু'টো ডানাই খুব তাড়াতাড়ি ভারী হয়ে আসবে। নীড়ের পাখী তখন আবার নীড়ে ফিরবে। এই তো সংসারের নিয়ম।" বড়দার কথা সত্য হোক্—এটা মোটেই মেজদার ইচ্ছে ছিল না। নতুন পাওয়া গুরুর ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তাই কোলকাতা ফিরতে রাজী হলেন না। তার বদলে তিনি সন্ন্যাসীর নাম ও আশ্রমের ঠিকানা জেনে নিলেন।

সাধু বললেন, "আমার নাম স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি। প্রধান আশ্রমের ঠিকানা—রায় ঘাট লেন, শ্রীরামপুর।"

মেজদা বাড়ী ফিরে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে শ্রীযুক্তেশ্বরজী তাঁকে বললেন—এক মাসের মধ্যে তোমাকে বাড়ী ফিরতেই হবে। এত সহজে আমার শিষ্য হওয়া যায় না। আমার শিক্ষার কাছে বাধ্যতা প্রমাণ করে পরিপূর্ণভাবে আমার কাছে আগে আত্মসমর্পণ করতে হবে।"

মেজদা ভাবেন বিধাতার কি বিচিত্র লীলা ! গুরুর সন্ধানে পৃথিবীর

শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত যাবার কথা যখন তিনি ভাবছেন, তখন কিনা তাঁর সেই গুরু রয়েছেন কলকাতারই পাশে শ্রীরামপুরে।

এদিকে মহামণ্ডল আশ্রমে মেজদার অবস্থানের দিনগুলো ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে। স্বামী দয়ানন্দজী বেশ কিছুদিন বম্বেতে রয়েছেন। একদিন শুনতে পেলেন আশ্রমে অনেকেই বলাবলি করছে: "মুকুন্দ বেশ মজায় আছে। সবকিছু ভোগ করছে অথচ একটি পয়সা দেবারও নাম করে না।" মেজদা ভাবেন—দয়ানন্দজীর পরামর্শেই বাবাকে টাকা পাঠাতে বারণ করেছেন অথচ এরাই এখন টাকার কথা বলছে। কষ্ট পান মনে। জীতেনদাকে বলেন, "আমি চললুম ভাই। দয়ানন্দজীর কাছে আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিও আর তাঁকে আমার প্রণাম জানিও। আমি এক মহাপুরুষের সন্ধান পেয়েছি। তিনি শ্রীরামপুরে থাকেন। আমি তাঁরই আশ্রমে যাচ্ছি।"

জীতেনদা বললেন, "আমিও যাবো মুকুন্দ। এখানে থেকে ইচ্ছামত ভগবানের নাম করা বা ধ্যান করার সুযোগ আমি পাই না।"

কলেজীয় শিক্ষায় অনীহা

শ্রীরামপুরে স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজীর আশ্রমে উপস্থিত হয়ে মেজদা তাঁর গুরুদেবকে নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন। এতদিনে যেন তাঁর আত্মা শান্তি পেলো। এইবার বাকি জীবনটা জ্ঞানাবতার শ্রীযুক্তেশ্বরজীর পদতলে বসে ও তাঁর সান্নিধ্যে থেকে নিশ্চিত আনন্দে কাটিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু সে আশায় বাদ হলেন গুরুদেব নিজে। বললেন, "কোলকাতায় থেকে তোমায় পড়াশুনা করতে হবে। একদিন তোমাকে পাশ্চাত্যেও যেতে হবে। সেখানকার মানুষ ভারতের অধ্যাত্মবাদ জানার জন্য উৎসুক হয়ে আছে। তোমার মন্তব্য ও বক্তব্য তারা তখনই বিশ্বাস করবে যখন দেখবে তাদের হিন্দু গুরুটির কেতাবী শিক্ষায় ডিগ্রী আছে।"

মেজদা এই বাড়ী ফেরার ব্যাপারে খুব খুশী না হলেও আমরা কিন্তু তাঁকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম।

মেজদার যেমন ছিল তীক্ষ্ন মেধা তেমনি ছিল অবিশ্বাস্য স্মরণশক্তি। চেষ্টা করলে তিনি বড় পণ্ডিত হতে পারতেন, কিন্তু পড়াশুনায় তাঁর মোটেই আগ্রহ ছিল না। বাবার কাছে করা প্রতিজ্ঞার মান রাখতে হিন্দু স্কুল থেকে পাশ করার জন্য যতটুকু পড়া প্রয়োজন মাত্র ততটুকুই তিনি পড়াশুনা করতেন। এরপর বাড়ীর সবাই তাঁর উপর চাপ দিতেন এমন কোন একটা বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করার জন্যে যাতে তিনি ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হতে পারেন। অবশ্য তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মেজদার আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গে অত্যধিক আগ্রহকে কিছুটা প্রশমিত করা। যাই হোক্, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেজদা শেষ পর্য্যন্ত উত্তর বিহারের সাবুর কৃষি কলেজ (Sabour Agricultural College) ভর্তি হন। মেজদা কৃষি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন—এটা বোধহয় ভগবানের ইচ্ছা ছিল না। দু'তিন মাস যেতে না যেতেই তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। সেখানকার পরিবেশে

তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, তাছাড়া সঙ্গীদের ছেড়েও তাঁর বিশেষ ভাল লাগছিল না। বাড়ী ফিরলেন একটা মস্ত বাঁধাকপি নিয়ে—তাঁর কৃষি শিক্ষার স্মারক!

কোলকাতায় ফিরে ঠিক করলেন ডাক্তারী পড়বেন। মেট্রোপলিটান ইনস্টিট্যুটে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) তিনি আই. এস. সি ক্লাশে ভর্তি হলেন। বই খাতা কিনে আমাদের পড়ার ঘরের আলমারী বোঝাই করলেন। তারপর কি যে হলো সব দিয়ে দিলেন একে একে এবং সেই সঙ্গে ডাক্তারী পড়ার ইচ্ছাতেও জলাঞ্জলি দিলেন। তিনি একটা ক্লাশও করেছিলেন বলে আমার মনে হয় না। এরপর কাশীর মহামণ্ডল আশ্রমে যোগদানের জন্য তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন। ভাবলেন তিনি—পাঠ্যপুস্তক আর পড়তে হবে না—চিরদিনের জন্য তিনি এখন মুক্ত। অথচ শ্রীযুক্তেশ্বরজী এখন বলছেন—ভবিষ্যতে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির একান্ত প্রয়োজন। একান্ত অনিচ্ছাসত্বেও গুরুবাক্যকে শিরোধার্য করে মেজদা ১৯১০ সালের অগ্যাস্ট কিংবা সেপ্টেম্বর মাসে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলেন।

এ'সব সত্বেও মেজদা কিন্তু পড়ায় মন না দিয়ে বেশিরভাগ সময় শ্রীরামপুরের গুরুর আশ্রমে সাধনায় নিয়োজিত থাকতেন। কলেজের সংগে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারের শেষের দিকে আই. এ. পরীক্ষা দেবার সময় মেজদা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেইকারণে পরীক্ষায় বসতে পারেননি। পরের বছর অর্থাৎ ১৯১৩ সালে আবার পরীক্ষা গ্রহণের সময় না হওয়া পর্যন্ত মেজদাকে কয়েকমাস অপেক্ষা করতে হয়। যাই হোক্ তিনি পরীক্ষায় পাশ করে আই. এ.* ডিপ্লোমা লাভ করেন। মেজদা মনে করলেন যথেষ্ট পড়াশুনা হয়েছে আর লেখা পড়ার কি দরকার। ডিপ্লোমা পত্রটি সঙ্গে নিয়ে শ্রীরামপুরে গিয়ে তিনি শ্রীযুক্তেশ্বরকে পড়াশুনা ত্যাগ করার ইচ্ছা জানালেন। বললেন "সত্যি কথা বলতে কি আমি এবার লেখা-পড়া ছেড়ে দিতে চাই। 'আমার একান্ত ইচ্ছা সব সময় আপনার কাছেই থাকি।'

শ্রীযুক্তেশ্বরজী কিন্তু তাতে মোটেই সম্মতি প্রকাশ করলেন না। বরঞ্চ তিনি বললেন "মুকুন্দ তুমি মনে রাখবে একদিন তোমায় পশ্চিম দেশে যেতে হবে এবং সেখানে তোমার ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি যথেষ্ট উপকারে আসবে।"

মেজদা অভিমানভরে বললেন, "আপনার কাছে আমায় যতক্ষণ খুশী থাকতে দেন না কেন?"

কি যেন ভাবেন যুক্তেশ্বর গিরিজী। তারপর বলেন, "ঠিক আছে, এক কাজ করো ; তুমি শ্রীরামপুর কলেজেই ভর্তি হয়ে যাও।"

* এদেশে আই. এ. পরীক্ষা পাশের দু'বছর পর বি. এ. পরীক্ষা দেওয়া যায়। শারীরিক অসুস্থতার কারণে মেজদা ১৯১৩ সালের শরৎকালের আগে শ্রীরামপুর কলেজে ভর্তি হতে পারেন নি। সে'কারণে ১৯১৫ সালে তিনি বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন।



জ্ঞান প্রভা ঘোষ (১৮৬৮-১৯০৪)

আমাদের মাতৃদেবী



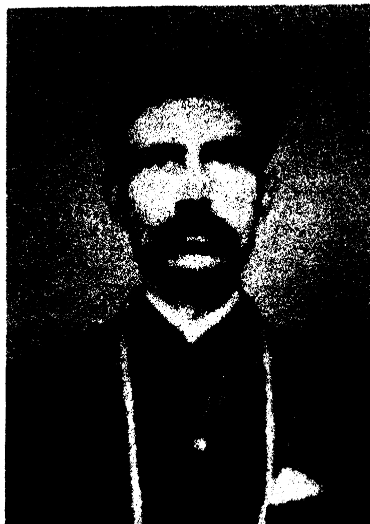
ভগবতী চরণ ঘোষ (১৮৫৩-১৯৪২)

আমাদের পিতৃদেব



সারদা প্রসাদ ঘোষ

পিতার মধ্যম ভ্রাতা



সতীশ চন্দ্র ঘোষ

পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা





শ্রী ও শ্রীমতি গোবিন্দ চন্দ্র বোস

আমাদের দাদু ও দিদিমা



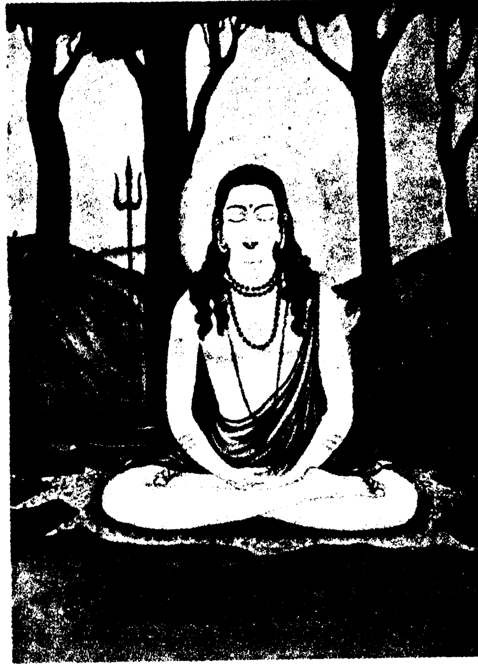
গোরক্ষপুরে পুলিশ অফিস রোডে আমাদের বাড়ী (আংশিক মেরামতের পর)
এই বাড়ীতেই মেজদা জন্মগ্রহণ করেন।



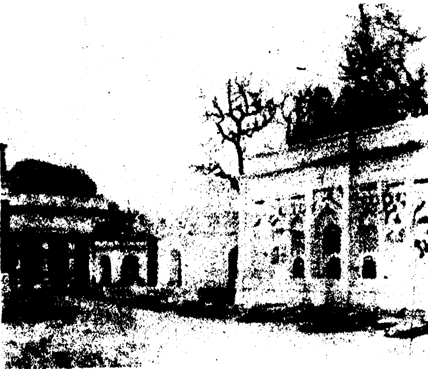
পুলিশ স্টেশন ও আমাদের বাড়ীর মাঝে কুয়ো। প্রতিবেশীরা ও
আমরা এর জল ব্যবহার করতাম।



পুলিশ স্টেশনের আঙিনার প্রবেশপথ



গোরক্ষনাথ
দশম শতাব্দীর এই সাধুর নাম থেকেই
গোরক্ষপুর শহরের নামকরণ হয়েছে।



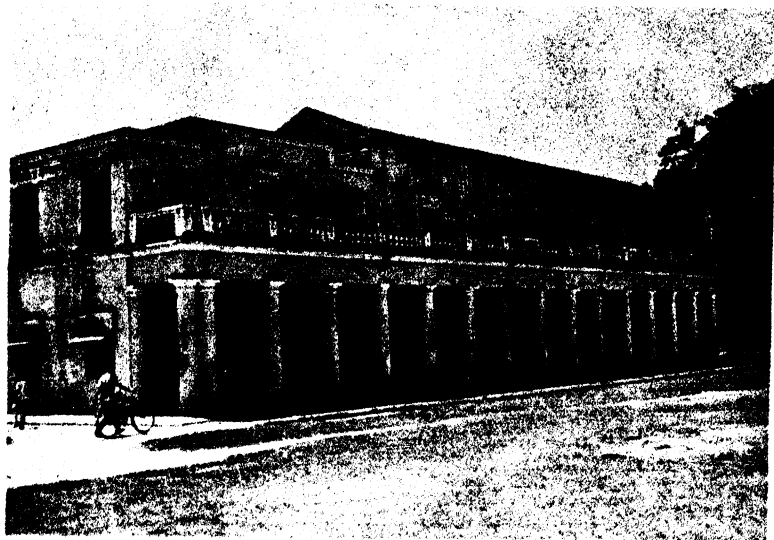
গোরক্ষপুরের প্রাচীন মন্দির
এখানেই গোরক্ষনাথ পূজা করতেন।



গোরক্ষনাথের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত
নতুন মন্দির



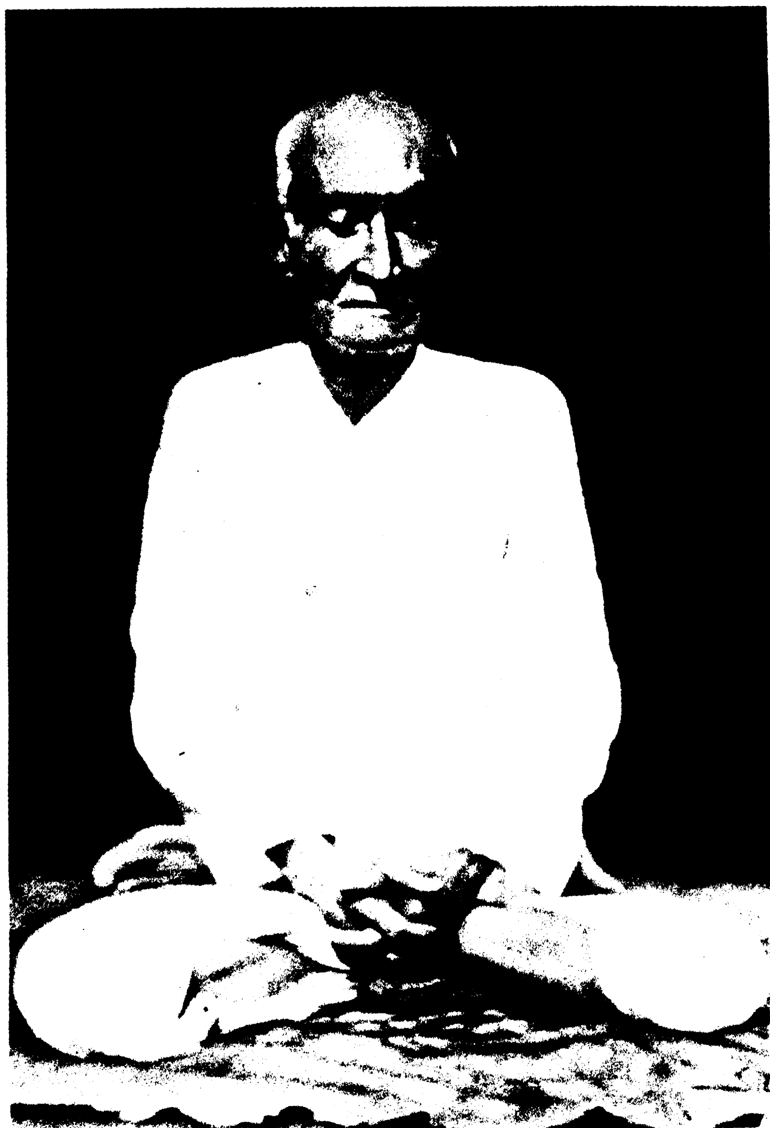
মেজদা—বয়ঃক্রম ছয় বছর



গোরক্ষপুরের সেন্ট অ্যাণড্রুজ স্কুল ; এখানে মেজদা প্রথম শিক্ষাগ্রহণ করেন



পরমেশ্বরী মহাকালী, বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেমংকরী ও ভয়ংকরী রূপের প্রতীক



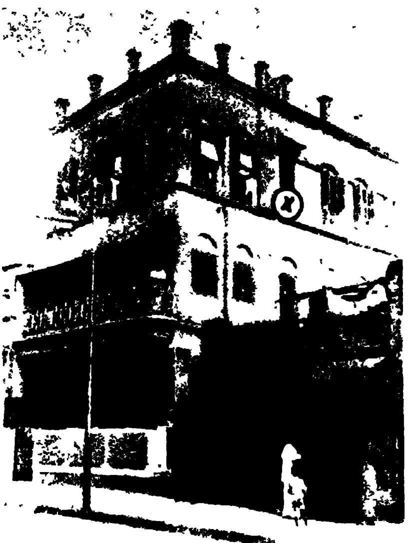
পরিণত বয়সে যোগসাধনরত পিতৃদেব

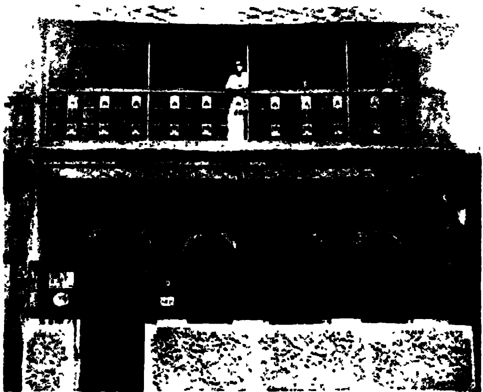


ঝি-মা, পিতৃদেব ও তদীয় ভগিনী



মেজদা—বয়ঃক্রম ষোল বছর







কলকাতায় আমাদের পৈতৃক নিবাস—৪নং গড়পার রোড। 'X' চিহ্নিত জানলাটি মেজদার সাধনকক্ষ যেখানে তিনি দীর্ঘসময় ধ্যান করে কাটিয়েছেন। দক্ষিণের ছবিটি কক্ষের অভ্যন্তর ভাগ। পরবর্তীকালে এই পবিত্র স্থানটিকে আমি একটা স্থায়ী মন্দিররূপে গড়ে তুলি।



মেজদা—বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র (লেখকের অংকিত চিত্র)



শাস্ত্রী মহাশয় (স্বামী কেবলানন্দ)

মেজদার সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক



স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি (১৮৫৫-১৯৩৬)

মেজদার গুরুদেব



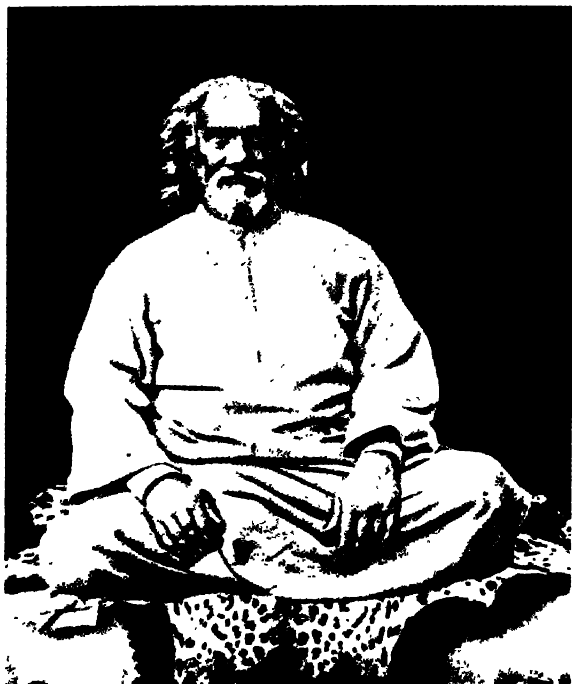
শ্রীরামপুর কলেজ—এখান থেকেই মেজদা বি. এ. পাশ করেন



শ্রীরামপুর কলেজের প্রবেশপথ



শ্রীরামপুরে সারদা কাকার বাড়ীর একটি ঘর। কলেজ জীবনে এখানে মেজদা মাঝে মাঝে থাকতেন। পরে সারদা কাকার পুত্র প্রভাস চন্দ্র ঘোষ এই ঘরটিকে একটি ধ্যানমন্দির করে নাম রাখেন 'আনন্দলোক'



স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর

মেজদা এই ছবির নামকরণ করেন 'বাংলার সিংহ'



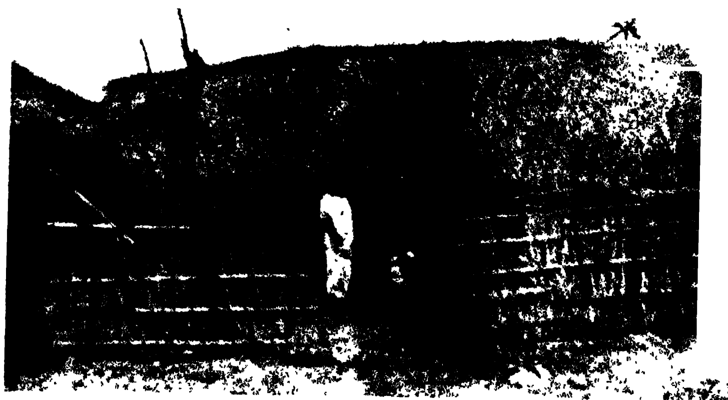
শ্রীরামপুর গঙ্গার পাড়ে রাইঘাট : শ্রীযুক্তেশ্বরজী এই ঘাটেই স্নান করতেন এবং এখানেই তিনি মহাবতার বাবাজীর দর্শনলাভ করেন [মেজদার লেখা "অটো-বাইওগ্রাফি অফ্ এ যোগী" (যোগিকথামৃত) দ্রষ্টব্য]



১৯১৬ সালে জাপান যাত্রাকালে মেজদার পাশপোর্ট ফটো—শিশুকালের পর সেই একবারই তিনি চুল ছোট করে কাটেন



মেজদার তৈরী চেয়ারে উপবিষ্ট পিতৃদেব। ছবিটি মেজদার তোলা



সাধন মন্দির—মেজদার প্রথম আশ্রম



পশ্চিম বঙ্গের ডিহিকায় ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত যোগদা সৎসঙ্গ ব্রহ্মচর্য
বিদ্যালয়ের প্রথম ভবন



প্রতিষ্ঠার স্বল্পকাল পরে গৃহীত রাঁচীর কাশিমবাজার প্যালেসে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের ছবি
(উপবিষ্ট, কেন্দ্র বাম) শাস্ত্রী মহাশয়, (কেন্দ্র) মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী (বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক) ও
(কেন্দ্র দক্ষিণ) মেজদা—স্বামী যোগানন্দ



১৯৩৫ সালে ভারতবর্ষে ফেরার পর হাওড়া রেল স্টেশনে মেজদা
(বাম থেকে দক্ষিণে) মহারাজ শ্রীশ চন্দ্র নন্দী, মেজদা, লেখক, বিষ্ণু
ও মেজদাকে স্বাগত জানাতে সমবেত ভক্তবৃন্দের একাংশ



১৯৩৬ এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় অপরাপর তীর্থযাত্রী সহ মেজদা ও তাঁর সঙ্গীগণ



১৯৩৫ সালে বেরিলীর পুরাতন আবাসগৃহে মেজদা ও তাঁর সঙ্গীগণ। সেখানে তাঁদের স্বাগত জানান বাল্যদিনের বন্ধু দ্বারকাপ্রসাদ (কেন্দ্রে, মেজদার পাশে) ও তাঁর পরিবারবর্গ। (পশ্চাতে কেন্দ্রে, দণ্ডায়মান বাম দিক থেকে) লেখক, রিচার্ড রাইট ও বিষ্ণু ঘোষ



১৯৩৫ সালে ইছাপুরের পৈতৃক আবাসে মেজদা ও সঙ্গীগণ। মূল বাস্তুর জায়গায় এখন আছে খোলা মাঠ ও একটি গাছ





(বামে) শ্রীশ্রী দয়ামাতা ও তদীয়া ভগিনী শ্রী আনন্দ মাতা। চিত্রটি লেখক কর্তৃক ১৯৩৮ সালে কলকাতায় গৃহীত। দয়ামাতাজী হলেন মেজদার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী এবং যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া / সেলফ রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপের সংঘমাতা ও সভানেত্রী। উভয়েই ১৯৩১ সাল থেকে পরমহংস যোগানন্দের শিষ্যা। ছবিটি ডেভল্যাপ করার সময় আমার মনে হয়েছিল যেন 'একটি দিব্য বৃন্তে দুইটি কুসুম'। (দক্ষিণে) ধ্যান সাধনরত দয়ামাতাজী



লেখক শ্রী সনন্দলাল ঘোষ (১৮৯৮-১৯৭৯)



লেখক ও তৎসহ সর্ব কনিষ্ঠা ভগিনী থাম্ব

(থাম্বর মৃত্যুর স্বল্পকাল পূর্বে)

অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন মেজদা তাঁর গুরুর দিকে। 'উনি কি জানেন না যে এখানকার কলেজে ডিগ্রি পরীক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থাই নেই?' কিন্তু শীঘ্রই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শ্রীরামপুর কলেজেও ডিগ্রি পড়ার ক্লাশ সুরু হলো। শ্রীযুক্তেশ্বরজীর কাছে থেকেই মেজদার বি. এ. পড়াশুনার কাজ চলতে থাকল। একথা আজ সর্বজনবিদিত যে একমাত্র শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর আশীর্বাদেই মেজদা পরীক্ষা পাশ করে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। এই পরীক্ষায় পাশ করা নিয়ে মেজদার মনে যখন যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছিল তখন তাঁর গুরু তাঁকে বলেছিলেন: "সূর্য ও চন্দ্র আকাশে তাদের স্থান বদল করলেও তোমার পক্ষে পরীক্ষায় ফেল করা অসম্ভব।"

স্নাতক হয়ে এসে মেজদা যখন তাঁর গুরুদেবকে প্রণাম করলেন তখন শ্রীযুক্তেশ্বরজী তাঁকে বলেছিলেন "দেখো মুকুন্দ, ঠাকুর দেখলেন চন্দ্র সূর্যের গতিপথ বদলানোর চেয়ে তোমায় গ্র্যাজুয়েট করা অনেক সহজ। তুমিও তাই পরীক্ষায় পাশ করলে!"

জনসমক্ষে প্রথম ভাষণ

মেজদা তখন কোলকাতার স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের প্রথম বার্ষিকী শ্রেণীর ছাত্র। সেই সময় তাঁকে স্থানীয় একটা স্কুলের উৎসবে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। অনুরোধ এসেছিল সেই স্কুল অর্থাৎ এথেনিয়াম স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক শ্রী অতুল নন্দী মহাশয়ের কাছ থেকে। মেজদা সেই প্রস্তাব শুনে কিছুক্ষণ চিন্তার পর রাজী হয়ে গেলেন। পরে আমাদের বলেছিলেন, "জীবনে কখনো পাবলিক লেকচার দিইনি। তাই একটু চিন্তিত হয়েছিলাম। কিন্তু একটু স্থির হয়ে ভাবতেই ভেতর থেকে কে যেন বল্লেন, 'ভাবনার কিছু নেই। ভগবানের নাম স্মরণ করে চলে যাও—সব ঠিক হয়ে যাবে'।"

অনুষ্ঠানের দিন বিকেলবেলায় মেজদার সঙ্গে তাঁর কয়েকজন বন্ধু, মনোমোহনদা, জীতেনদা এবং আমিও গিয়েছিলাম। জীবনে প্রথম সাধারণের সামনে বক্তৃতা দিতে চলেছেন মেজদা—স্বাভাবিক ভাবেই একটু নারভাস্ হয়ে পড়তে পারেন। যেতে যেতে দেখি মেজদার সেই সদাহাস্যময় মুখ আর নেই—কেমন যেন গম্ভীর হয়ে চলেছেন। সেদিনের সেই বক্তৃতার সমস্ত কথা আজ আর আমার স্পষ্ট করে মনে নেই। কিন্তু কিছু কিছু কথা এখনও আমার বেশ মনে আছে কারণ সেগুলি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল:

"মানুষ মাত্রেই সুখের সন্ধানী। যারা নানা রকম নেশা করছে তারা সুখ ও আনন্দ পাবার জন্য করছে। যেসব লোক ইন্দ্রিয় সুখভোগের আশায় নিষিদ্ধ পল্লীতে যাচ্ছে—তারাও সুখের আশাতেই যাচ্ছে। যারা বিবাহ করে সংসার পেতে পুত্র কন্যা নিয়ে ঘর বাঁধছেন, তাঁরাও সুখের আশাতেই করছেন। আর

যারা সর্বস্ব ত্যাগ করে কৌপীন মাত্র সম্বল করে পর্বত গুহায় বসে ধ্যান করছেন, তাঁরাও ঐ সুখের উৎস সন্ধানেই তা করছেন।

"ইন্দ্রিয় সুখ ক্ষণস্থায়ী সুখ এবং অচিরে তা দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইন্দ্রিয় সুখাকাঙখীরা পতঙ্গের মতো অগ্নিশিখায় পুড়ে মারা যায়।"

"অজ্ঞান বা মায়াই মানুষকে সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করে। তা থেকে যত কামনা-বাসনা এবং অসৎ কর্মের উৎপত্তি হয়। এবং এরই ফলে সাময়িক সুখ-লাভ ও শেষে বিষাদ আসে।"

মেজদার ঐ বক্তৃতা সকলে মন দিয়ে শুনেছিলেন এবং পরে হেডমাস্টার মশাই ও স্থানীয় মান্যগণ্য অতিথিরা তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বক্তৃতার পর দেখেছিলাম মেজদার মুখে আবার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিটি ফুটে উঠেছে।

মৃত্যুর করাল ছায়া

বাবার কাছ থেকে কোনো রেলের পাশ না নিয়ে, এমনকি কাউকে কিছু না জানিয়ে মেজদা মাঝে মাঝেই বাড়ী থেকে উধাও হয়ে যেতেন। সঙ্গে কিন্তু তাঁর সবসময় দু'চারজন বন্ধু থাকতো। সাধু সন্ন্যাসী ও মঠ-মন্দিরের খোঁজে এবং নিভৃতে নিরালায় উপাসনা করার জন্যেই তিনি পরিচিত পরিবেশ থেকে এভাবে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতেন। প্রথম প্রথম মেজদার এইরকম আচরণের জন্য বাড়ীর অনেকেই অনুযোগ করতেন। তারা বাবার কাছে অভিযোগ করে এ' ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাতেন। শেষ পর্য্যন্ত এটি এমন নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়ালো যে সকলে বুঝতে পারলেন মেজদার স্বাধীনতাকে ঐভাবে বাধা দেওয়া যাবে না। আবার কখনো কখনো দেখতাম বাড়ীর অন্যদের সংগে সব যোগসূত্র ছিন্ন করে নিজের উপাসনা ঘরে বসে মেজদা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরির সাক্ষাত পাওয়ার পর থেকে দেখেছি মেজদা ত্রিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত একনাগাড়ে ধ্যান সাধনায় নিমগ্ন থেকেছেন।

একদিন, তখন গ্রীষ্মের ছুটি চলছে ; আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে দুপুর বেলা খেতে বসেছি। মেজদা সবেমাত্র দীর্ঘ তপস্যার পর নীচে নেমেছেন। আমরা দু'দিন তাঁর দর্শন পাইনি। আত্মসমাহিতের মতো নিঃশব্দে বসেছিলেন।। তিনি থালা থেকে অল্প অল্প ভাত খাচ্ছিলেন বটে কিন্তু ভাবখানা এমন যেন আসপাশে কেউ নেই—শুধু ওঁর ঈপ্সিত ঠাকুর এবং নিজে রয়েছেন। পাঁচুদি নিঃশব্দে মেজদার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। একটু পরে মেজদার চোখে চোখ পড়তেই আমার যেন কেমন মনে হলো তিনি বোধহয় কিছু মজা করার মতলবে রয়েছেন।

হঠাৎ মেজদা অজ্ঞান হয়ে পেছনে হেলে পড়লেন। পাঁচুদি চীৎকার করে উঠলেন, "কি হয়েছে ? তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে ? বলো না ?"

আমরা দেখলাম মেজদার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। পাঁচুদি মেজদার হাত ধরে দেখলেন নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না।

কে যেন বলে ওঠেন, "যোগবিদ্যা শিখেছেন, হবে না! দিন দিন শরীরের কি হাল হচ্ছে! নিশ্চয়ই মাথা ঘুরতে আরম্ভ করেছে।"

ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়া হলো। মেজদাকে ধরে ধরে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। বেশ কিছু সময় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন ডাক্তারবাবু। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে শুধু বললেন, "নাঃ! আমার আর কিছু করণীয় নেই।"

সারা বাড়ীতে নেমে এলো এক বিরাট শোকের ছায়া। আমরা ছোটরা সকলে 'মেজদা, এই মেজদা ওঠো না' বলে কাঁদতে লাগলাম। বড়োরাও চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছেন, "মুকো, মুকো বাবা কি হয়েছে বল না!" খবর শুনে কোথা থেকে ছুটে এসে ঝি-মা মেজদাকে বুকে তুলে নিয়ে 'মুকুন, মোকোরে, কোথায় গেলি বাবা! হে ভগবান, তোমার দিব্যি করে বলছি আর আমি ওকে কখনো কিছু বলবো না। তুমি শুধু ওকে ফিরিয়ে দাও ঠাকুর! ওতো খুব ভালো ছেলে—তবে ওকে কেন ছিনিয়ে নিলে ঠাকুর'—এই সব বলে দারুণ কাঁদতে লাগলেন।

ঝিমাকে এমন করে এর আগে কখনো কাঁদতে দেখিনি। বরং দেখেছি মেজদার বন্ধু-বান্ধব এলে বা তাদের সংগে বেশি সময় কাটালে তিনি খুব বকাবকি করতেন। বলতেন, 'তোমার বন্ধুদের জন্যে আমি এত খাটাখাটি করতে পারবো না। তাছাড়া বাপের কষ্টকরে রোজগার করা পয়সা এমনভাবে উড়িয়ে ছারখার করবে—তা আমি জীবন থাকতে সহ্য করব না। একথা পরিষ্কার তোমায় জানিয়ে দিলুম মুকো।'

ঘটনাটি এমন একদিকে মোড় নিচ্ছিল যে শেষ পর্য্যন্ত বোধহয় খুব বিশ্রী একটা কিছু ঘটে যেতো। এমন সময় মেজদা যেমন হঠাৎ পেছন দিকে ঢলে পড়েছিলেন, তেমনি আবার সোজা বিছানায় উঠে বসে ঝি-মাকে বললেন, "তাহলে ঝিমা কথা দিচ্ছ, তুমি আর কখনো আমাকে বকবে না, অ্যা!"

ঝি-মার বয়স হয়েছিল, তাই চলাফেরার সুবিধার জন্য লাঠি ব্যবহার করতেন। মেজদার এই রকম ভীষণ ঠাট্টায় প্রচণ্ড রেগে গিয়ে সেই লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে এসে বললেন, "বাঁদর ছেলে কোথাকার আমার সঙ্গে মস্করা হচ্ছে? ভেবেছিলে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি, না? রোজ মজা করা তোমার বার করছি। একদিন আমিও বসে বসে সজ্ঞানে দেহ ছেড়ে চলে যাব।*"

মেজদা আর ঝি-মার কাণ্ড আমাদের ভারাক্রান্ত মনে আবার হাসির হিল্লোল তোলে। হো হো শব্দে সকলে হেসে উঠি।

পরে মেজদার কাছে জেনেছিলুম যোগ সাধনা মানুষকে এমন শক্তি দেয় যা দিয়ে সে তার দেহের সমস্ত স্বাভাবিক কাজকর্ম ইচ্ছে মত ঘন্টার পর ঘন্টা

* এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল।

বন্ধ করে রাখতে পারে। ডাক্তারবাবু তো সমস্ত ব্যাপার শুনে স্তম্ভিত। নিজের শেখা সবকিছু বিদ্যা যে এমনভাবে মিথ্যে হয়ে যাবে, তা তিনি ভাবতেও পারেন নি।

বড়রাও খুব রাগারাগি করলেন। বকলেন বটে মেজদাকে, তবে সমস্ত ব্যাপারটা তাঁদেরকেও যে বেশ মজা দিয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছিল।

মেজদার 'সমাধি'

আমি প্রায়ই শুনতাম মেজদা ও মনোমোহনদা 'সমাধি' সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন। একদিন মেজদাকে একটু একলা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম 'সমাধি' কাকে বলে এবং সেই অবস্থাই বা কিরূপ। তাঁকে সমাধিস্থ অবস্থায় দেখার ইচ্ছাপ্রকাশও করেছিলাম। প্রথমে মেজদা একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, 'তুমি ছেলেমানুষ ; ওসব বুঝবে না।' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে ভেবে নিয়ে বললেন, "ঠিক্ আছে। আজই রাত ১২টার সময় আমার ঘরে এসো। দরজা খোলাই থাকবে।" রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব করা আমার ছোট-বেলাকার ভীষণ বদভ্যাস ছিল। তাই বাবা আমায় মাঝ রাতে ঘুম থেকে তুলে প্রস্রাব করতে পাঠাতেন। মেজদা আমায় বারবার সাবধান করে দিয়েছিলেন—বাবা ঘুমোতে না যাওয়া পর্য্যন্ত আমি যেন তাঁর ঘরে না যাই।

সে' রাতটা আমি অধীর আগ্রহে জেগে কাটিয়েছিলাম। (আমি, থামু আর বিষ্ণু বাবার ঘরে মেঝেতে বিছানা করে শুতাম। আর বাবা শুতেন তক্তাপোষে। সেজদির তখন বিয়ে হয়ে গেছে। শ্বশুর বাড়ীতে থাকে। মেজদা মাঝের ঘরে শুতেন।) দালানের ঘড়িতে বারোটা বাজতেই অতি সন্তর্পণে খিল খুলে মেজদার ঘরে গেলাম। সেখানে দেখি মেজদা খাটের ওপর বসে ধ্যান করছেন। মেঝেতে তাঁর বিছানার সামনে একটা মাদুর পাতা ছিল। সেখানে আমায় বসতে বলে বল্লেন :

"শরীর থেকে মনকে পৃথক করে পরমাত্মার সঙ্গে মিলন করাকে 'সমাধি' বলে। এই 'সমাধি'র সাহায্যেই জাগতিক মায়াবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সাধক যখন নিমীলিত নেত্রে হৃদয় মধ্যে 'অনাহত'* দ্বাদশদল পদ্ম হতে উত্থিত 'নাদ' ধ্বনিতে মনকে সমাহিত করেন, তখন সেই প্রণব ধ্বনি শুনতে শুনতে 'আজ্ঞাচক্রে'† অবস্থিত বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে পরমাত্মাতে নিশ্চল বা স্থির হয়।

* মেরুদণ্ডে অবস্থিত চতুর্থ আধ্যাত্মিক চেতনার কেন্দ্র। এই অনাহত চক্রের স্থান হলো হৃৎপিণ্ডের বিপরীত দিকে। মানুষের দেহ ও মনকে সঞ্জীবিত করতে মেরুদণ্ডস্থ বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রণব ধ্বনির এক একটি বিশিষ্ট শব্দ শ্রুত হয়।

† কূটস্থে (ভ্রূ-দ্বয়ের সংযোগ স্থল) অবস্থিত ষষ্ঠ কেন্দ্র। উন্নত যোগী মহাত্মার চৈতন্য সব সময় 'অনাহত' ও 'আজ্ঞাচক্রে'র মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। ফলে অধ্যাত্মভাবে শুদ্ধ বুদ্ধি ও অনুভূতির দ্বারা তাঁর সকল কর্ম, দর্শন ও বোধশক্তি চালিত হয়।

তখন শরীরে কোনরকম স্পন্দন থাকে না। মন অন্তর্মুখী, দেহ স্পন্দনরহিত এবং হৃদয় ঈশ্বরে অবিচল—এমন অবস্থাকেই যোগাবস্থা বলে। সাধক বুঝতে পারেন তিনি শুধু নশ্বর দেহী নন্। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ—দেহধারণ করেছেন মাত্র। এই অনুভূতি তাঁকে শোকতাপ মুক্ত করে। তিনি উপলব্ধি করেন—পরমাত্মার মতো তিনিও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।"

এই সব বলে মেজদা একটা গান ধরলেন:

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি, নাহি শশাংক সুন্দর
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব-চরাচর।
অস্ফুট মন-আকাশে, জগত-সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডুবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ।
সে ধারাও বন্ধ হলো, শূন্যে শূন্যে মিলাইল
'অবাঙ্‌মানসগোচরম্' বোঝে—প্রাণ বোঝে যারা॥*

গানটি শেষ হতে মেজদা একদম নিষ্পন্দ হয়ে গেলেন। ঘড়িতে তখন রাত এক-টা। দেড়টা-দুটো—আড়াইটে বাজল—তবুও মেজদার কোন সাড়া-শব্দ পাই না। তখন আমার ভীষণ ভয় হলো। মেজদার গায়ে হাত দিয়ে 'মেজদা' 'মেজদা' বলে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু তিনি তেমনি স্পন্দনহীন হয়ে বসে রইলেন। নাকে হাত দিয়ে দেখি নিঃশ্বাস পড়ছে না। বুকে হাত দিলাম—কিন্তু সেখানেও দেখি বুক ওঠানামা করছে না। শেষে দুই কাঁধ ধরে বেশ জোরে ঝাঁকানি দিলাম—কিন্তু তাতেও কোন ফল হলো না। আমার তখন প্রায় কাঁদ কাঁদ অবস্থা। অভ্যাস মতো বাবা ভোর তিনটের সময় ঘুম থেকে উঠে দেখেন আমি বিছানায় নেই। তিনি তখন মেজদার ঘরে আসেন। আমি কাঁদ কাঁদ অবস্থায় বাবাকে সব কথা খুলে বলি।

বাবা তখন মেজদার পাশে বসে খানিকক্ষণ প্রাণায়াম করে মেজদার বুকে একটি হাত রেখে তাঁর কানে 'ওঁম্' উচ্চারণ করতে লাগলেন। এই রকম প্রায় আধ ঘণ্টা চলার পর মেজদার দেহটা সামান্য নড়ে উঠল এবং উনি আস্তে আস্তে চোখ মেলে চাইলেন। মেজদার কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ চৈতন্য ফিরে আসেনি। বাবা মেজদার সমস্ত শরীরে হাত বুলিয়ে দিতে তাঁর একটু একটু করে স্বাভাবিক ভাব ফিরে এলো। তখন ভোর হয়ে এসেছে। বাবা আমাকে ঘরের সমস্ত জানলা খুলে দিতে বললেন। বাবাকে পাশে বসে থাকতে দেখে মেজদা একটু লজ্জিত হয়ে পড়েন। বাবা কোন কথা না বলে নিঃশব্দে নিজের

* গানটি আমি আগে শুনিনি। দুঃখ হয় কেন আমি তখন লিখে নিইনি। গানের কথাগুলি খোঁজ করতে গিয়ে বড়দির ডাইরীতে পাই। [স্বামী বিবেকানন্দের 'The Hymn of Samadhi'। তাঁর কৃত ইংরাজী অনুবাদটি 'The Complete Works of Vivekananda, Vol· IV' এ স্থান পেয়েছে।]

ঘরে চলে গেলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার চোখে গাঢ় ঘুম নেমে এলো।

সতীর্থকে শিষ্যরূপে গ্রহণ

একটু আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন ছেলে যারা, তারা সবসময় মেজদাকে ঘিরে থাকতো। মৌমাছি যেমন মধুর লোভে আকৃষ্ট হয়, তেমনি এইসব উচ্চমনা ছেলের দল মেজদাকেই তাদের নেতা হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল।

মেজদা যখন কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র সেই সময় একজন তীক্ষ্ম মেধাবী, ধর্মপ্রাণ যুবকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ছেলেটির নাম বাসু কুমার বাগ্‌চী। বাসুদা আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন। মেজদার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বাসুদাকে প্রায়ই বলতে শুনতাম, "দেখো মুকুন্দ, বাড়ীতে আমার আর ভালো লাগছে না। এমন একটা নির্জ্জন জায়গা পাইনা যেখানে বসে কিছুক্ষণ ধ্যান করতে পারি।"

মেজদা একদিন বললেন, "তুমি আমাদের বাড়ীতে চলে এসো। মনে প্রাণে দু'জনে যখন এক পথের যাত্রী তখন আর অসুবিধা কি? একটা কিছু সুরাহা হয়ে যাবে।"

প্রথম প্রথম মেজদা, বাসুদা'র আমাদের বাড়ীতে থাকার ব্যাপারে বাবাকে কিছুই জানান নি। বাসুদা মেজদার উপাসনা ঘরে থাকতেন এবং মেজদার খাবার ভাগ করে খেতেন। বাবা অফিসে চলে গেলে তবে নীচে নামতেন। কিন্তু বেশি দিন এই সব কথা গোপন থাকে না। বাবা সব জানতে পারলেন এবং মেজদার ঔদার্যের প্রশংসা করলেন। বাসুদা আমাদের পরিবারের একজন হিসেবে বাড়ীতেই রয়ে গেলেন।

ক্রমে বাসুদা মেজদার একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে ওঠেন এবং সকল আধ্যাত্মিক ব্যাপারে মেজদাকে অনুসরণ করতে থাকেন। সন্ন্যাস জীবনে তিনি স্বামী ধীরানন্দ নাম গ্রহণ করেন।

একদিন কলেজে ক্লাশ করতে করতে মেজদার মনে হলো ভেতর থেকে কে যেন ওঁকে বলছেন, "মুকুন্দ, পাশে বসা ছেলেটিকে তোমার শিষ্য করে নাও। ওকে মুক্তির আলোকে উদ্ভাসিত করো।"

চমকে উঠলেন মেজদা—কে বললো এই কথা? পাশের ছেলেটির দিকে চেয়ে দেখেন সে হাঁসছে। কি রকম যেন সন্দেহ হলো। সামনের দিকে তাকালেন—সেখানে মাস্টার মশাই পড়াচ্ছেন। একে একে সকলকেই তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন। মনে হলো যেন তিনি ইচ্ছে করেই মেজদাকে বাদ দিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার তাঁর মনে হলো একটা সুমিষ্ট কণ্ঠ যেন একই কথা আবার তাঁকে বলছে। মেজদা তখন ছেলেটির দিকে একটু ঝুঁকে তার সঙ্গে কথা বলতে গেলেন। কিন্তু সে বললো, 'আস্তে, আমি এখন পড়া শুনছি।'

মেজদা বললেন, 'আমি তোমার গুরু। তুমি আমার কথা অনুযায়ী চলবে।'

ছেলেটি মেজদার সেই কথা শুনে ভুরু কুঁচকিয়ে বললে, "পাজী, হতচ্ছাড়া! আমি তোমার শিষ্য হতে যাব কোন দুঃখে? আবার ঐ রকম কথা বললে মেরে তোমার মুখ ফাটিয়ে দেবো।' মেজদা সেকথার জবাব না দিয়ে শুধু তার দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসলেন।

পরদিন সকাল সকাল স্কুলে গিয়ে প্রধান ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে ছেলেটি মেজদার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। অন্যদিনের মতো সে'দিনও মেজদা তাড়াতাড়িই স্কুলে গেলেন। তিনি দূর থেকে দেখতে পেলেন ছেলেটি গেটের পাশে অপেক্ষা করছে। তিনি তখন ইচ্ছে করেই একটা গ্যাস পোস্টের আড়ালে গিয়ে লুকোলেন। ক্লাসেরই একজন এভাবে মেজদাকে লুকোতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে মুকুন্দ? এখানে এমনভাবে লুকিয়ে আছ?' অন্যান্য ছেলেরাও তখন সেখানে জমা হয়েছে।

মেজদা তাদের বললেন, "এমনিই লুকিয়ে আছি। তোমরা এক কাজ কর ভাই। সকলে আমাকে ঘিরে আড়াল করে ক্লাস পর্যন্ত নিয়ে চলো। ঐ যে গেটের পাশে ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে ওকে ফাঁকি দিতে হবে। একটু মজা করব আর কি!"

ক্লাসের বন্ধুরা মজার গন্ধ পেয়ে খুবই খুশী হলো। কিন্তু তবু তাদের মনের কৌতূহল মিটলো না। একজন বললোঃ তা না হয় বুঝলাম—কিন্তু ব্যাপার কি বলতো?

মেজদা বললেন, 'ভেতরে নিয়ে চল্ তো আগে—পরে বলছি।'

মেজদা কিভাবে যেন বুঝতে পেরেছিলেন ছেলেটি আগের রাতে স্বপ্ন দেখেছে। ভগবান যেন তাকে বলছেনঃ 'মুকুন্দই তোমার গুরু। এর শিষ্যত্ব নাও। সেই তোমাকে মুক্তির পথ দেখাবে।' অজানা এক আনন্দে ছেলেটির মনপ্রাণ ভরে ওঠে। তাই ছুটে আসে স্কুলে সকলের আগে। নতুন পাওয়া গুরুকে ক্লাশ বসার আগেই ধরতে হবে যে। মেজদাও তাই সহজে নিজেকে ধরা দিতে চান্ না। ভক্তের সঙ্গে ভগবান যেমন লুকোচুরি খেলেন, তিনিও তেমনি সেই শিষ্যের সঙ্গে লুকোচুরিই খেলছিলেন।

শিল্পী ও আলোকচিত্র শিল্পী মেজদা

মেজদা যখন কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র, সেই সময় তিনি একটি বক্স ক্যামেরা কেনেন। তখনকার দিনে ক্যামেরাটির দাম পড়েছিল আট টাকা। ভিতরে ছ'খানি সিকি ইঞ্চি প্লেট পর পর রাখার ব্যবস্থা ছিল। একখানি ছবি তোলা হয়ে গেলে, বাক্সের উপরে একটি বোতাম ছিল তাকে ঠেলে দিলেই প্রথম প্লেটটি ভিতরে শুয়ে পড়তো। এইভাবে ছবি তোলা হতো। নীচের বৈঠক-

খানায় দরজা-জানালা বন্ধ করে ক্যামেরাতে প্লেট ভর্তি করা হতো। ছবি তোলা হয়ে গেলে সেই ঘরেই প্লেটগুলি ডেভালাপ করা হতো একটি কাঠের বাক্সে।

দিনকতক ছবি তোলার কাজে মেজদার সেকি উৎসাহ। বাড়ীতে কিছু ভাঙ্গা কাঠ ছিল—তাই দিয়ে মেজদা নিজের হাতে একখানি চেয়ার তৈরী করেছিলেন। সেই চেয়ারেই বাবাকে বসিয়ে তিনি তাঁর ফটো তোলেন। তাছাড়া আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব অনেকের ফটো তুলেছিলেন। শেষে ছবি তুলতে আমার আগ্রহ এবং তাঁকে ছবি তোলার কাজে নানাভাবে সাহায্য করার জন্য ক্যামেরাটি তিনি আমাকে দিয়ে দেন।

আলোকচিত্র তোলায় আমার আগ্রহ ও স্বাভাবিক প্রবণতাকে উৎসাহিত করার জন্য বছর কয়েক বাদে তিনি আমাকে অ্যামেরিকা থেকে একটি স্টিরিও-স্কোপিক ক্যামেরা পাঠিয়ে দেন। মেজদারই একবন্ধু নাম নগেন্দ্র নাথ দাস এই ক্যামেরা ব্যবহার করার পদ্ধতি আমায় শিখিয়ে দেন। সে ক্যামেরাতে একসঙ্গে দু'টি করে পাশাপাশি ছবি উঠতো—বাঁ দিকের ছবি ডান দিকে আর ডান দিকের ছবি বাঁ দিকে। তারপর ছবি তোলা হয়ে গেলে গ্রাউন্ড-গ্লাস দেওয়া বাক্সে ভরে দেখতে হতো। দেখাত ঠিক জীবন্ত মানুষের মতো। পরবর্তী জীবনে আমি একজন পেশাদার আলোকচিত্রশিল্পী হই ; মেজদার সেই ক্যামেরা এবং নগেন দাসের প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আত্মজীবনীর গোড়ার দিকেই আমি বোধহয় আমার অংকন বিদ্যায় পারদর্শিতার কথা উল্লেখ করেছি। এ'বিদ্যা আমার মা'র কাছ থেকে পাওয়া। এই জন্মগত অধিকার মেজদারও ছিল। আমার আঁকা কৃষ্ণমূর্তি দেখে তিনি সম্পূর্ণ নতুন সাজে সজ্জিত অনুরূপ একটি ছবি অংকন করেন। তারপর নিজের খেয়ালে নানা দেব-দেবীর মূর্তি এঁকেছিলেন। সে'সব দেখে সকলেই বিস্মিত হয়েছিল। অথচ এই বিষয়ে কেউই তাঁকে কোন শিক্ষা দেন নাই। এ' হলো রং আর তুলি নিয়ে এক মহাপুরুষের বিচিত্র মনের খেলা। ভাবলে দুঃখ হয় যে সেই অপূর্ব ছবিগুলি আজ আর নেই। অযত্নে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

মেজদার জন্য মোটরসাইকেল

১৯১১ সালের কথা। মেজদা তখন স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ছাত্র। শ্রীযুক্তেশ্বরজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য রোজ তিনি ট্রেনে কলকাতা থেকে শ্রীরামপুর যাতায়াত করতেন। আসা-যাওয়া করতেই অনেকটা সময় লাগতো, ফলে গুরু-শিষ্যের মিলনের সময় যেতো কমে। মাঝে মাঝে এই নিয়ে নিজের মনের ক্ষোভের কথা মেজদা যুক্তেশ্বরজীর কাছে প্রকাশ করতেন। গুরুদেবই তখন একদিন মেজদাকে বললেন : একটা মোটর সাইকেল কিনে ফেলো, তাহলে পাখীর মত উড়ে উড়ে যাওয়া-আসা করতে পারবে।

বাবাকে সেই কথা বলাতে বাবা বললেন, "তোমাদের নিশ্চয়ই অজানা নয় কি অবস্থা থেকে আমি আজ এই অবস্থায় এসেছি। বহুদিন বহুবার আমি বলেছি আমরা গরীব ছিলাম খুবই। একমাত্র ধৈর্য্য আর অধ্যবসায়কে সম্বল করেই আমি কিছু অর্থের মুখ দেখেছি।"

বাবার কথা শেষ হলে মেজদা শুধু বললেন : আপনার ছেলেরা তো আর গরীবের ছেলে নয়। বাবা সে কথার যুক্তিসঙ্গত উত্তর সেদিন দিতে পারেন নি। মেজদা সাইডকার সমেত একটা ট্রায়াম্প মোটর সাইকেল কিনলেন। সেই সময় মেসার্স টমসনই ছিল কলকাতা এলাকায় মোটর সাইকেলের একমাত্র বিক্রয়-কারী প্রতিষ্ঠান। তাই ঐ গাড়ি চালাবার ট্রেনিং নেবার জন্য মেজদা ঐ প্রতিষ্ঠানেরই একজনকে কিছুদিনের জন্য নিয়োগ করলেন। পরে সুরেন নামে একজন মেকানিককে রেখেছিলেন গাড়ীটিকে দেখাশোনা করার জন্যে। শ্রীরামপুরে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরির কাছে যাবার সময় সুরেনদাও মেজদার সঙ্গে সাইডকারে বসে সেখানে যেতেন।

মোটর সাইকেল কেনার মাস খানেক পরে মেজদা কয়েকদিনের জন্য দার্জিলিং বেড়াতে গেছলেন। চালকের অভাবে গাড়িটা বাড়ীতেই পড়ে থাকতো। যন্ত্রটাকে ঠিক রাখার জন্য সুরেনদা মাঝে মাঝে সেটাকে একটু চালিয়ে আনতেন। নগেন দাস ছিলেন মেজদার এক বিশিষ্ট বন্ধু। তিনি থাকতেন আমাদেরই বাড়ীর কাছে পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য লেনে। সে'বছর তিনি আই. এস্. সি. পরীক্ষার্থী ছিলেন। মেজদার নির্দেশ মতো সুরেনদা রোজ নগেনদাকে মোটর সাইকেলে চড়িয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যেতেন, আবার পরীক্ষা শেষ হলে নিয়ে আসতেন।

ছোট ভাই বিষ্ণু আর আমি প্রায়ই সুরেনদার কাছে আবদার করতুম মোটর সাইকেলে করে একটু এদিক-সেদিক ঘুরিয়ে আনার জন্যে। দুর্ভাগ্য-বশতঃ বিষ্ণুকে নিয়ে একদিন আসার সময় মানিকতলা ব্রীজের কাছে একটা দুর্ঘটনা হয়—মোটর সাইকেল উল্টে বিষ্ণুর মাথা ফেটে যায়। বাবার ক্রোধ এড়াতে সুরেনদা সুযোগ বুঝে মোটর সাইকেল বাড়ীতে রেখে দিয়ে পালিয়ে যান।

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে নগেনদা আমাদের বাড়ীতে এসে দেখেন সুরেনদা নেই। অপেক্ষা করে করে এমন হলো যে বাস বা ট্রামে চড়ে গেলেও ঠিক সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পেঁৗছন অসম্ভব। শেষে অনন্যোপায় হয়ে তিনি আমাকেই বললেন : তুমি চালাতে জান না ?

বললাম বটে জানি, কিন্তু মনে খুব ভয়ও হচ্ছিল। আগে কোনদিন একলা চালাইনি। তবে মেজদা বা সুরেনদা যখন চালাতেন তখন আমি সাইডকারে বসে মনোযোগ দিয়ে চালাবার কৌশল লক্ষ্য করতাম। সে'কারণে ভয় পেলেও নিজের ওপর খানিকটা আস্থাও ছিল। যাই হোক নগেনদাকে সাইডকারে বসিয়ে শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে পরীক্ষাকেন্দ্রে পেঁৗছিয়ে দিতে পেরে-ছিলাম। উঃ! সে কি আনন্দ। এক গ্যালন পেট্রল কিনে প্রতিবেশী এক সম-বয়সী ছেলেকে সাইডকারে বসিয়ে একবারে দক্ষিণেশ্বর ঘুরে এলাম। বিকেল-বেলা আবার নগেনদাকে ঠিক সময়ে নিয়ে এলাম। এইভাবে কয়েকদিন কাটলো।

দু'তিন দিন পরে মেজদা দার্জিলিং থেকে ফিরলেন। নগেনদা তাঁকে সব কথা জানালেন। বাড়ী এসে আমাকে বকাবকি করলেও মনে মনে কিন্তু তারিফই করেছিলেন। বললেন 'চলো তোমার কেমন হাত হয়েছে দেখবো। আমাকে পাশে বসিয়ে চালাবে।'

আমি সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলুম। তারপর মাঝে মাঝে আমি মেজদাকে শ্রীরামপুরে যুক্তেশ্বর গিরিজীর আশ্রমে নিয়ে যেতাম। অন্য সময়ে যুক্তেশ্বরজীকে সাইডকারে বসিয়ে আমরা দু'জন মোটর সাইকেল চালাতাম। রাস্তার দু' পাশের লোক আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখতো। একবার ঐ মোটর সাইকেলে করেই শ্রীযুক্তেশ্বরজীকে আমাদের বসতবাড়ীতে নিয়ে এসে-ছিলাম। একবার তিনি মেজদাকে বলেছিলেন: তোমার চেয়ে তোমার ছোট ভাইয়ের হাত অনেক ভালো। শুনে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠেছিল।

নগেনদা ভবিষ্যতে একজন নামী চিকিৎসক হন। য়ুরোপ আমেরিকার বহু সেমিনারে তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদগ্ধ সমাবেশে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যও রেখেছিলেন। নতুন চিন্তার প্রকাশ দেখিয়েছিলেন। নগেনদা প্রথম জীবনে 'বসু বিজ্ঞান মন্দিরে' আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর অধীনে শিক্ষালাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্ত তিনি যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটির বোর্ড অফ্ ডাইরেক্টরসের একজন সভ্য ছিলেন। নিউরোফিজিওল্যাজি (neurophysiology) ও ইলেক্ট্রোএনসিফ্যালোগ্রাফি (electroencephalo-graphy)-তে বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলোশিপ দেওয়া হয়। মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর থাকার পর ১৯৫০ সালের শরৎকালে ক্যালিফোর্ণিয়ায় সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপ আশ্রমে যান এবং সেখানে তাঁর সঙ্গে মেজদার সাক্ষাত হয়। পরে ভারতবর্ষে ফিরে তিনি কলকাতার সায়েন্স কলেজের প্র্যাক্টিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের প্রধান হন।

আমার স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরির প্রথম দর্শনলাভ

কোলকাতায় স্কুলে পড়ার সময় পড়াশুনা করার চেয়ে আমি খেলাধুলা নিয়েই মেতে থাকতাম বেশি। তাই মেজদা যখন তাঁর নিজের কলেজের পড়া শেষ করতে শ্রীরামপুর কলেজে ভর্তি হন, সেই সময় বাবার সম্মতি নিয়ে আমাকেও সেখানকার ইউনিয়ন স্কুলে দশম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। আমি শ্রীরামপুরে ন'কাকার (সারদা প্রসাদ) বাড়ীতেই থাকতাম এবং মেজদা সেই বাড়ীতে আগে যে ঘরে থাকতেন আমিও সেই ঘরেই বাস করতাম।* গুরু

* দীর্ঘকাল পরে পরমহংসজীর প্রিয়তম খুড়তুতো ভাই প্রভাস চন্দ্র ঘোষ যখন সারদা কাকার বাড়ীতে বসবাস করতে থাকেন, তখন তিনি যোগিরাজের স্মরণে ঘরখানিকে মন্দিরে পরিণত করে তার নাম রাখেন 'আনন্দলোক'।

শ্রীযুক্তেশ্বরজীর বাড়ী থেকে ফিরতে মেজদার প্রায়ই রাত হতো বলে ন'কাকার কাছে তিনি বকুনী খেতেন। সেজন্য গঙ্গার ধারে রায়ঘাট লেনে 'পন্থী' হোস্টেলে তিনি থাকতেন। ন'কাকার বাড়ী, শ্রীযুক্তেশ্বরজীর আশ্রম এবং 'পন্থী' হোস্টেল—সবই ছিল খুব কাছাকাছি। তাই মেজদা রোজ বিকালে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর বাড়ীতে আমাকে নিয়ে যেতেন।

মনে আছে এক রবিবার সকাল নটার সময় মেজদা আমাকে প্রথম তাঁর গুরুর বাড়ীতে নিয়ে যান। তখন আমি কোলকাতাতেই থাকতুম। পুরাতন প্রকাণ্ড বাড়ী ; বিরাট উঠান, ঠাকুরদালান নিয়ে দুই মহলের বাড়ী। বাড়ীটার পিছনে ছিল মস্ত এক বাগান। ঘরে ঘরে ঝাড় লণ্ঠন, দেওয়ালে টাঙ্গানো সাজানো ঢাল তলোয়ার। সমস্ত দিনটা তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছিলাম। উৎসবাদির সময় আর রবিবার এইভাবে সারাদিন তাঁর সঙ্গলাভ করতাম। আমার নাম গোরা জেনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গোরা নাম কেন হলো?' মেজদা তখন বুঝিয়ে বল্লেন—মেজদার মতো আমারও গোরক্ষপুরে জন্ম। বাবা গোরক্ষনাথের নামানুসারে তাই আমার নামকরণ করা হয়। গোরা হলো সেই নামেরই সংক্ষিপ্ত রূপ।

আমি ও মেজদা রোজ বিকালে গিরিজীর ঘরে গিয়ে তাঁর পদতলে বসতাম। প্রথমে তিনি আমাদের অন্য নির্জন ঘরে ধ্যান করতে পাঠাতেন। তারপর আবার তাঁর পায়ের কাছে এসে বসতাম, তাঁর অমৃতময় বাণী শুনতাম। মাঝে মাঝে তিনি ভগবদ্গীতার শ্লোকের অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। বাড়ী ফিরে এসে সেগুলির যতটা অংশ মনে থাকতো, তা লিখে রাখতাম।

এইরকম ভাবেই একদিন শ্রীযুক্তেশ্বরজী আমাকে 'ক্রিয়াযোগে' দীক্ষিত করেন। তার আগে অবশ্য আমাদের গড়পার রোডের বাড়ীতে শাস্ত্রী মহাশয়ের* কাছে দীক্ষা গ্রহণ করি। কিন্তু বয়সে ছোট ছিলাম বলে এবং খেলাধুলোর দিকে বেশি ঝোঁক থাকার জন্যে সাধনভজন কিছুই করতাম না। তাই শ্রীযুক্তেশ্বরজীর শিক্ষাধীনে থেকে কিছুটা উন্নতি করতে সমর্থ হই।

ইউনিয়ন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে আমি শ্রীরামপুর কলেজে ভর্তি হই। আমি যখন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তখন খুব আমাশয় হয়। বাবা তাই আমাকে শ্রীরামপুর কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কোলকাতার সিটি কলেজে ভর্তি করে দেন।

যখন শ্রীরামপুরে ন'কাকার বাড়ীতে থাকতুম তখন তাঁর কাছ থেকে শ্রীযুক্তেশ্বরজী সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি। শ্রীযুক্তেশ্বরজীরা ছিলেন মস্ত বড় জমিদার—সেই জন্যেই বাড়ীতে অত ঢাল তলোয়ার, ঝাড় লণ্ঠন ; জমিদারী থেকে খাজনা বাবদ বহু টাকা আদায় হতো। গিরিজী সেই জমিদারীর মালিক হন। গোড়ায় তিনি অত্যন্ত শৌখীন বাবু ছিলেন। তবে উনি খুব বড়

* স্বামী কেবলানন্দ। ৮ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

দাতাও ছিলেন। প্রজাদের পীড়ন করে তিনি কখনো অর্থ আদায় করতেন না। অন্যান্য জমিদারদের মত তিনি উচ্ছৃংখল প্রকৃতির ছিলেন না। সবাই তাঁর সুনাম করতো।

কাকার কাছে শুনেছি শ্রীযুক্তেশ্বরজীর সঙ্গে আমার দাদামশায় গোবিন্দ চন্দ্র বোসের আলাপ ছিল। তিনি কিছুদিন শ্রীরামপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাছাড়া আমার মেজো মামা শিবচন্দ্র বোসের সঙ্গেও যুক্তেশ্বরজীর পরিচয় ছিল। তিনি ছিলেন শ্রীরামপুরেরই একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর। তাঁরা দু'জনে প্রায়ই গঙ্গার ধারে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন।

স্ত্রীর মৃত্যু এবং লাহিড়ী মহাশয়ের দর্শনলাভের পর শ্রীযুক্তেশ্বরজী সংসারজীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। উনি তাঁর সমস্ত জমিদারী নামমাত্র মূল্যে প্রজাদের মধ্যে বিক্রয় করে দেন এবং সেই টাকায় সরকারী বণ্ড ক্রয় করেন। এর যৎসামান্য আয় থেকেই তঁর ভবিষ্যৎ জীবনের ব্যয় নির্বাহ হতো। তাছাড়া পুরীতেও তিনি একটি আশ্রম স্থাপন করেন। গ্রীষ্মের দিনগুলি তিনি সেখানেই কাটাতেন।

স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজীর আলোচনা থেকে সঞ্চয়ন

শাস্ত্রে যোগ সম্বন্ধে যেসব উল্লেখ আছে তাই নিয়ে শ্রীযুক্তেশ্বরজী মাঝে মাঝে আলোচনা করতেন। তার থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে যা আমি লিখে রেখেছি, তারই কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করছি।

জ্ঞানং যোগাত্মকং বিদ্ধি যোগাশ্চাষ্টাঙ্গ সংযুতঃ
সংযোগ যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মা পরমাত্মনো॥

যোগ যাজ্ঞবল্ক্য ১ : ৪৪

"অষ্ট রকমের যোগভ্যাস করলে তবেই প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। এই জ্ঞান আসে 'যোগ' থেকে।"

জ্ঞান যোগাত্মক অর্থাৎ জ্ঞান যোগই জ্ঞান বলিয়া জানিবে। সেই যোগ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত যথা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধরণা, ধ্যান ও সমাধি।

এই যোগ সাধনায় বিঘ্নোৎপাদনকারীরা হলো—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য। একনিষ্ঠ হয়ে উপরোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনা করে বাধা-বিপত্তিগুলিকে জয় করতে পারলেই জ্ঞান লাভ করা যায়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের নামই যোগ। যোগ সাধনা ছাড়া অশান্ত মনকে জয় করা যায় না। যোগ ব্যতীত জ্ঞানও হয় না। যোগসাধন আয়ত্ত করলে তখন আর কিছুই অসাধ্য থাকে না।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪ : ৩৮

"জগতে জ্ঞানের তুল্য পবিত্রকারক আর কিছুই নাই। যিনি যোগে সিদ্ধিলাভ করেছেন তিনি সময়ে সে'কথা জানতে পারবেন।"

সব সাধনার মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভই শ্রেষ্ঠতম। কর্ম উপাসনার দ্বারা পাপাগ্নি নিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু তদ্দ্বারা পাপাগ্নির মূল ভিত্তিরূপ অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয় না। সুতরাং পুনরায় পাপাচারের আশংকা বর্তমান থাকে। এই অজ্ঞানতাদোষে এমনকি বহু উন্নত ভক্তেরও অধঃপতন হয়েছে। সুতরাং এই অজ্ঞানতা বিধ্বংসী জ্ঞানলাভ না হলে ঈশ্বরকে জানা যায় না।

তবে 'জ্ঞান' যেমন 'কর্ম' নিরপেক্ষ নয়, তেমনি "কর্ম"ও 'জ্ঞান' নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই কর্মযোগ সিদ্ধি না হলে আত্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। কর্মযোগ সাধনার দ্বারা পার্থিব বিষয়বস্তুর আকর্ষণমুক্ত হয়ে চৈতন্যকে কূটস্থে স্থাপন করতে পারলে জ্ঞান স্বতই লাভ হয়।

সাধকের কাছে সত্য জ্ঞান প্রকাশিত হলে পর তাঁর ব্রহ্মস্থিতি লাভ হয়।

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগ বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণ-চেতসা॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬ঃ ২২-২৩

"যে অবস্থালাভ করলে অপর কোনো লাভকে তদপেক্ষা অধিক বলে বোধ হয় না, যাতে স্থিত হলে আধিব্যাধি রূপ মহৎ দুঃখ বিচলিত করে না, সেই দুঃখ-সংশ্রব-বিহীন চিত্তবৃত্তি নিরোধ অবস্থার নাম যোগ। সুতরাং একমনা হয়ে অধ্যবসায় সহকারে যোগভ্যাস করতে হয়।"

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮ঃ ৬৬

"সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণ লও। দুঃখ কোরো না, কারণ আমিই তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।"

গিরিজী মহারাজ* বলেছিলেন—অনেকেই এই শ্লোকটির অনেক রকম ব্যাখ্যা করে থাকেন। এর মানে এই নয় যে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন সব দায়িত্ব ও কর্তব্য ত্যাগ করে কেবল আমারই আরাধনা করো। এর গভীর অর্থ হলো মেরুদণ্ডস্থ মূলাধারাদি চক্রগুলিতে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত প্রকাশিত হয়। আমাদের দেহ এই পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত এবং মৃত্যুর পর এই দেহ আবার পঞ্চভূতেই বিলীন হয়ে যায়। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ—এই পঞ্চতন্মাত্র, ঐ পঞ্চভূতের ধর্ম এবং তারই প্রভাবে জীব দেহের

*শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি; 'গিরি' সম্প্রদায়ভুক্ত বলে তাঁর পদবী হয় গিরি।

বশীভূত হয়ে পড়ে। ফলে মন আত্মাকে বিস্মৃত হয়। আর যা মনে চঞ্চলতা আনে, তাকে ইন্দ্রিয়বশ করে তোলে, তাকেই আমরা 'পাপ' বলি। মনে চাঞ্চল্য এলে এই পাপ আত্মাকে মলিন করে।

কিন্তু আত্মা তো নির্মল, নিত্য, সত্য সনাতন। তাকে আবার মলিন করবে কি করে? একটি আরশির সঙ্গে আত্মাকে তুলনা করা চলতে পারে। আরশি ধুলোয় ঢাকা—ধুলো মুছে দাও, আরশি আবার চক্‌চক্‌ করবে। সেইরূপ মনের চাঞ্চল্যও আত্মাকে ঢেকে রাখে, আর সেই কারণেই আমরা আত্মাকে জানতে বা উপলব্ধি করতে পারি না।

যাঁরা উপরিউক্ত পঞ্চতন্মাত্রে আসক্ত হয়ে পড়েন, তারাই সুখ-দুঃখের বশ হন্‌। তাই ভগবান বলছেন ক্রিয়াযোগ অনুশীলনের মাধ্যমে পঞ্চচক্রের মধ্যস্থিত যে পঞ্চতত্ত্ব আছে, তা পরিত্যাগ করে আজ্ঞাচক্রে স্থিত হয়ে একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ আমাকেই নিরন্তর চিন্তা কর। এই অবস্থায় ভক্ত ভক্তিভাবে আপ্লুত হয়ে ঈশ্বরেই একনিবিষ্ট হন্‌।

অতএব ঈশ্বর যে বলেছেন তিনি যোগীকে সর্বপাপ মুক্ত করবেন তার আসল অর্থ হলো এই। ঈশ্বরে স্থিত হয়ে তিনি 'জীবন্মুক্ত' হন। এতবড় আশ্বাসবাণী ও প্রতিশ্রুতি ভগবান আমাদের দিয়েছেন তবুও মানুষের জ্ঞান হয় না—সে ইন্দ্রিয়বশ হয়ে অজ্ঞান অন্ধকারেই ডুবে থাকে।

শ্রীরামপুর আশ্রমের মশক ও নিরামিষ রান্না

যতদিন আমি শ্রীরামপুরে ছিলাম ততদিন প্রায় রোজ বিকালবেলাতে মেজদার সংগে গিরিজী মহারাজের আশ্রমে যেতাম। প্রথম দিন আমি যাবার একটু পরেই তিনি আমাদের বললেন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে বড় ঘরে ধ্যান করগে যাও। আমরা প্রায়-অন্ধকার ঘরে গিয়ে ধ্যানে বসি। কিন্তু কার সাধ্য সেখানে এক মিনিটও স্থির থাকে। মাছির মতো বড় বড় মশার কামড়ে অস্থির হয়ে পড়ি। তাদের উপদ্রব দমনের চেষ্টা করছি এমন সময়ে গিরিজী মহারাজ সেখানে এসে উপস্থিত।

'কি ব্যাপার, অত ছটফট করলে কি ধ্যান করা যায়? ভগবানের চিন্তা না করে কেবল মশার চিন্তায় সময় কাটাচ্ছ। মনঃসংযোগ করো আর সহ্য করারও চেষ্টা করো। মশার কথা ভুলে যাও তাহলেই দেখবে তাদের কামড়ে কষ্ট পাচ্ছ না।' এই বলে তিনি চলে গেলেন। আশ্চর্য্যের কথা, পরমুহূর্ত থেকে আর মশার কামড় অনুভব করিনি। প্রত্যহ ধ্যানে বসতাম কিন্তু আর কখনো মশার কামড়ে আমাদের অস্থির হতে হয়নি।

অনেকেই এসে শ্রীযুক্তেশ্বরজীর কাছে বসতেন, তাঁর উপদেশ শুনতেন। একদিন কথায় কথায় এক ভদ্রলোক বললেন, "আমি তরকারীতে কাঁচাকলা খেতে পারি না।" কিছুদিন পরে সেই ভদ্রলোককে গিরিজী মহারাজ খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। নানারকমের সুস্বাদু ব্যঞ্জন পরিবেশন করা হলো। খাওয়ার

পর ভদ্রলোক রান্নার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। গিরিজী মহারাজ তখন জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি আজ কিসের তৈরী রান্না সব খেলেন, বলুন তো?"—"তা তো জানি না, তবে খুবই সুন্দর খেলাম।—"সব রান্নাই কাঁচাকলা দিয়ে তৈরী।"

ভদ্রলোক অবাক। গিরিজী মহারাজের তৈরী রান্না খেয়ে তিনি সত্যি খুব তৃপ্ত হয়েছিলেন।

প্রায় সময়েই আশ্রমের অতিথিদের জন্য যুক্তেশ্বরজী নিজের হাতেই রান্না করতেন। তাছাড়া উৎসবের সময় অনেক রকম ব্যঞ্জন প্রস্তুত হতো—সবই তাঁর তত্ত্বাবধানে। সবাই তাঁর রন্ধনের প্রশংসা করতো। মেজদার রন্ধনপটুতা গিরিজী মহারাজের কাছ থেকেই পাওয়া।

যখন লাহিড়ী মহাশয়ের জন্মদিন বা জলবিষুব সংক্রান্তির মতো বড় উৎসব পালন করা হতো, তখন উৎসবের কিছুদিন আগে থেকেই তার প্রস্তুতি-পর্ব শুরু হতো। নানা ফুল আর লতাপাতায় আশ্রমটিকে সাজানো হতো। উৎসবের দিন সকালবেলায় নগরকীর্তন বার হতো। রামমোহন লাইব্রেরী হলে সভা হতো। সেখানে অনেক গুণী-সমাগম হতো। তারপর আমাদের পাশের বাড়ীতে অর্থাৎ ৩নং গড়পার রোডের ছাদে ভোজনের ব্যবস্থা করা হতো।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছ থেকে রান্নায় হাতেখড়ি নেবার পর মেজদা নিজের মন থেকে অনেক রকম রান্না তৈরী করেন। বাড়ীতে কোন অনুষ্ঠান হলে তিনি সেই সব খাবার রান্না করতেন এবং আমাদের শিখিয়েও দিতেন। সে সবই ছিল নিরামিষ। যে সব রান্নার কথা আমার বিশেষ করে মনে আছে সেগুলি হলো: লুচি, আলুর দম (মেজদার প্রিয়), পোলাও, নিরামিষ মাংস, নিরারিষ ডিমের ডালনা, নিরামিয 'মাছের মুড়ো', ইত্যাদি। শেষে অনেক রকম মিষ্টি বিতরণ করা হতো।

কয়েকটি রান্নার প্রস্তুতি এখানে দেওয়া হলো:

নিরামিষ ডিম—প্রথমে ছানাকে পাকিয়ে বড় বড় ডিমের আকার দেওয়া হলো। তারপর খানিকটা ছানাকে 'হলদে' রং করে তার মধ্যে পুর হিসেবে রাখা হলো। তারপর সেগুলি ভেজে ডালনা রাঁধা হতো।

নিরামিষ মাছের মুড়ো—বড় বাঁধাকপি চার টুকরো করে প্রথমে কাটা হয়। তারপর সেগুলি সুতো দিয়ে বেঁধে রান্না করা হয়। চাটনী দিয়ে খেতে অপূর্ব হয়।

নিরামিষ কাটলেট—মোচা সেদ্ধ করে তার সঙ্গে আলু, মশলা ইত্যাদি মিশিয়ে চটকে তাকে কাটলেটের আকার দেওয়া হতো। পরে সেগুলিকে তরল অ্যারারুটে ডুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো লাগিয়ে ভাজা হতো। স্বাদ খুব ভাল হতো।

নিরামিষ মাংস—(ক) ভাল ভাল ময়দা মেখে জলে ধোয়া হতো। ময়দা থেকে আঠার মতো এক বস্তু বের হতো। আলু লম্বা লম্বা করে কেটে সেই

আঠায় জড়িয়ে ভাজা হতো। মশলা দিয়ে ভাল করে রান্না করলে প্রায় মাংসের মত খেতে হয়।*

(খ) এঁচোড়ের ডানলাও খেতে মাংসের মত হয়।

(গ) 'গুছি'—এক প্রকার শুকনো জিনিষ, দেখতে ব্যাঙয়ের ছাতার মতো। সাদা বড় বড় ছোলা দিয়ে রান্না করলে খেতে মাংসের মত লাগে।

মেজদার সহায়তায় আমার বদভ্যাস মুক্তি

সে সময় আমি শ্রীরামপুর কলেজে পড়ি। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে আমি সিগারেট খেতে শিখি, এবং এই অভ্যাস একটা নেশার মতো হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে গুরুজনদের সামনে ধূমপান করলে তাঁদের অসম্মান করা হয়। তাই লুকিয়ে-চুরিয়ে খেতে হতো। এই লুকোচুরি আমার ভাল লাগতো না—বুঝতাম, আমি একটি ক্ষতিকর বদ্ অভ্যাসের দাস হয়ে পড়ছি। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তা থেকে মুক্তি পাচ্ছিলাম না।

মেজদা বোধহয় অন্তর্যামী—তাই আমার মানসিক যন্ত্রণা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। একদিন যুক্তেশ্বরজীর আশ্রমের হল ঘরে আমরা দু'জনে তাঁর অপেক্ষায় বসে আছি। তিনি তখনও ভেতর থেকে বাইরে আসেন নি। হঠাৎ মেজদা বললেনঃ "দেখ্ গোরা, পৃথিবীতে যারাই কোনো বড় কাজ করে, মনের জোরের ওপর নির্ভর করেই তা করে। মনের শক্তি অসীম। যারা সামান্য বদ্ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে না, যেমন ধর কেউ সিগারেট খায়, পান জরদা খায়, নস্য নেয়, মদ খায় বা অন্য নেশা করে—তারা সহজে তা ছাড়তে পারে না, কারণ তাদের মনের জোরের অভাব। যদি কেউ এই সব ছোটখাট জিনিষের ওপর মানসিক শক্তির ক্ষমতা ব্যবহার করতে শেখে, তবে তার দ্বারা ভবিষ্যতে অনেক বড় মনের জোরের কাজ করা সম্ভব হয়।"

তাঁর এই কথাগুলি আমার মর্ম্মে গিয়ে আঘাত করলো। মনে মনে বুঝলাম আমাকে সিগারেটের নেশা ত্যাগ করাবার জন্যেই তিনি কথাগুলো বলেছেন। ভাবলাম, 'সত্যি তো যদি সামান্য সিগারেট খাওয়াই না ত্যাগ করতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতে কি করে বড় কাজ করতে পারব ?" সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করলামঃ মৃত্যু হয় সে'ও ভালো, তবু সিগারেট আর খাব না। কাজটা কিন্তু খুব সহজে হয়নি। প্রথম প্রথম পেট ফুলতে থাকলো। যাই হোক্ সোডা জল ও হজমের ওষুধ খেয়ে অনেক কষ্টে বদ্ভ্যাস থেকে মুক্ত হওয়া গেলো। তারপর একদিন মেজদার সামনে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করতে তিনি

* পশ্চিমে নিরামিষাসীদের কাছে এই ধরণের মাংস আজ খুবই প্রিয়। অনেক বাণিজ্যিক সংস্থা নানা ধরণের এই জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে থাকে। তবে আমেরিকায় পরমহংসজীই প্রথম এই রকম মাংস রান্না প্রচলন করেছিলেন। (প্রকাশকের মন্তব্য)

শুধু একটু হাসলেন—কিছুই বল্লেন না। উভয়েরই অন্তরে অন্তরে বোঝা-বুঝি হয়ে গেল।

এই সময় আমি মাছ-মাংস খাওয়াতেও খুবই অভ্যস্ত ছিলাম। ভাবতাম—যাঁরা নিরামিষ খায়, তারা কি করে খায়। অবশ্য মেজদার কথা স্বতন্ত্র—তিনি সব কিছুতেই অনন্য। একদিন ঠিক করলাম মাংস খাওয়ার অভ্যাস ছাড়তে হবে। পরের দিন থেকেই নিরামিষ খাওয়া শুরু করলাম। প্রথম প্রথম ভীষণ কষ্ট হতো—বিশেষ করে যখন দেখতাম ভাই-বোনেরা পাশে বসে মাছ-মাংস খাচ্ছে। তা সত্বেও ঐসব রান্না খেতাম না। আমি তখন আমার মানসিক শক্তিকে বৃদ্ধি করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এমনও হয়েছে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে হোটেলে গেছি, তাদের চপ্-কাট্‌লেট খাইয়েছি—কিন্তু নিজে খেয়েছি নিরামিষ খাবার। এই রকম করে এক বছর পরে যখন দেখলাম মনের ওপর আমার বেশ জোর এসে গেছে, তখন আবার সকলের সঙ্গে সব খেতে আরম্ভ করি।

এইভাবে মানসিক শক্তি বিষয়ে মেজদার অমূল্য উপদেশ আমার জীবনে এক গভীর আশীর্বাদ বহন করে আনে।

১১ মেজদার সন্ন্যাস গ্রহণ ও তাঁর বিশ্বব্যাপি মিশন

বিবাহে অসম্মতি ও চাকরী প্রত্যাখ্যান

১৯১৫ সালের জুন মাসে মেজদা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাশ করেন। বাবা আশা করেছিলেন—বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ গডফ্রে যে চাকরীর প্রস্তাব করেছিলেন মেজদা তা গ্রহণ করবেন। মিঃ গডফ্রে বাবাকে বলেছিলেনঃ "ভগবতী, কোম্পানীর চাকরীতে তোমার সুনামের জন্য এই অতি লোভনীয় অ্যাসিস্‌টেণ্ট ট্রাফিক সুপারিণটেণ্ডেণ্টের পদটি তোমার ছেলেকে দিতে চাই। তুমি তো জান ইংরেজ না হলে এ'চাকরী হয় না। লেফ্‌টানেণ্ট গভর্ণরও যদি রেকমেণ্ড করেন তাহলেও কোন ভারতীয়ের পক্ষে এই চাকরী পাওয়া দুরূহ। তোমার ছেলেকে বলো সে যেন এই লোভনীয় কাজটি হেলায় না হারায়।"

আমাদের খুড়তুতো ভাই শ্রী প্রভাস চন্দ্র ঘোষের পরের বছর বি. এ. পাশ করার কথা। মেজদা তাই বাবাকে বললেন, তিনি যেন সাহেবকে বলে প্রভাসকে ঐ চাকরীটি করে দেন। কিন্তু বাবা তাতে রাজী ছিলেন না—তাঁর ইচ্ছা মেজদাই যেন চাকরীটি নেন। মেজদাও কিছুতে ছাড়বেন না। রোজ বাবার অফিস যাবার সময় তাঁর সংগে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্‌ (বিধান সরণী) পর্য্যন্ত হেঁটে যেতেন, আবার তাঁর অফিস থেকে ফেরার সময় সেই একইভাবে তাঁর সংগে ঐ বিষয়ে কথা বলতে বলতে আসতেন। মেজদার শুধু একটাই বক্তব্য—প্রভাসকে চাকরীটা করিয়ে দিচ্ছ না কেন? যাই হোক্‌ মেজদা শেষ পর্য্যন্ত অসম্ভবকে সম্ভব করলেন। বাবা প্রভাসদাকে গডফ্রের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর চাকরীটা হয়ে গেল।

আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা বাবাকে বোঝালেন—বিয়ে হলেই মেজদার সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছা চলে যাবে। আমি নিজে দিদিদের সঙ্গে অনেক জায়গায় ওঁর জন্য পাত্রী দেখতে গিয়েছি। এক জায়গায় সব কিছু ঠিকও হয়ে যায়।

মেজদা সে'কথা জানতে পেরে সোজা বাবার কাছে গিয়ে বললেন, "বাবা, আপনি যদি বলেন যে আমার বিয়েতে আপনি নিজে সুখী হবেন, তবে আমি বিয়ে করতে রাজী আছি। আর যদি আমার সুখের কথা জিজ্ঞেস করেন তাহলে বলবো—আমি মোটেই সুখী হবো না। কারণ আপনার চেয়ে একথা এত ভাল করে কেউ জানে না যে বিয়ে করে সংসারী হবার জীবন আমার নয়।"

কয়েক মুহূর্ত এক দৃষ্টিতে মেজদার দিকে তাকিয়ে থাকেন বাবা। তারপরে বলেন, "ঠিক আছে। তোমার সুখেই আমার সুখ।" মেজদার

বিয়ের সব কথা চাপা পড়ে গেল।* এর ফলে মেজদার জীবনের ঐকান্তিক ইচ্ছা—সন্ন্যাস গ্রহণের পথে আর কোন বাধাই রইলো না।

১৯১২ সালে মেজদার ভীষণ অসুখ করে। সেইজন্য তিনি সে'বার আই. এ. পরীক্ষা দিতে পারেন নি। তাঁর তখন পেটে আমাশয় হয়েছিল। রোগ অল্পদিনের হলেও তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন। শারীরিক ঐ দুর্বলতা সত্ত্বেও সন্ন্যাস জীবনের প্রস্তুতি হিসাবে ধর্মীয় কৃচ্ছ্রতা পালন করতে তিনি মনস্থ করেন। নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য সব রকম ভোগবিলাস পরিত্যাগ করলেন। জন্মাষ্টমীর এক সপ্তাহ আগে থেকে খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস শুরু করে দেন। জন্মাষ্টমীর দিনটিতে তিনি উপবাস করেন। ঐ দিন রাত্রে বাসুদা, শিশিরদা, মনোমোহনদা, পুলিনদা এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কাঁকুড়গাছির 'যোগ উদ্যানে' যান। আজকে যাকে নতুন খাল বলে তারই কাছাকাছি একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে আমরা সবাই ধ্যান করতে থাকি। কিন্তু নবীন সন্ন্যাসীর একটা নাম তো থাকা দরকার। তাই মেজদা নিজের নামকরণ করেছিলেন 'যোগেশ্বর'। তাঁর ঐ নতুন নাম মাত্র আমরা ঐ কয়জনাই জানতুম।

মেজদার বিয়ের ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেলেও আমি কিন্তু পড়লাম মুস্কিলে। তখন আমার বয়স মাত্র ষোল বছর—হিন্দু স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ছি। মেজদার সঙ্গে সঙ্গে সব সময় থাকতুম বলে বাড়ীর সকলের সন্দেহ হলো—আমিও বুঝি ওঁর অনুগামী হবো। তাই এবার আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধার তোড়জোড় শুরু করলেন সকলে মিলে। আমাকে আড়ালে রেখে গোপন বৈঠকে আমার বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হলো। বাবার সঙ্গেও শলা-পরামর্শ হলো। মেজদার মত বুদ্ধি বা সাহস আমার ছিল না এবং বড়দের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তিও আমার ছিল না। অতএব ১৯১৪ সালের ১৪ই মে তারিখে বৌদির এক খুড়তুতো বোনের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।†

আমার স্নেহময়ী জননীর বরাবরই ইচ্ছা ছিল খুব জাঁক-জমক করে তাঁর সন্তানদের বিবাহ দেবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভগবান তাঁকে অকালে নিয়ে গেলেন বলে তাঁর সেই ইচ্ছা অপূর্ণ রইল। মেজদা আমার বিবাহকে উপলক্ষ করে মায়ের সেই ইচ্ছাপূরণ ও তাঁর স্বর্গত আত্মার শান্তি বিধানের ইচ্ছা করলেন। খুব জাঁক-জমকপূর্ণ উৎসবের আয়োজন করা হলো। অসংখ্য রঙীন আলোর বাহার, বাদ্য-বাজনা ও ভুরিভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। শোভাযাত্রা করে চতুর্দোলায় চড়িয়ে বরকে বিবাহ বাসরে নিয়ে যাওয়া হয়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে শাঁখ বাজাতে বাজাতে মেজদা পাঁচ মাইল দূরে কনের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। সব সময় মেজদা অপরের বিয়েতে সানন্দে অংশ গ্রহণ করেছেন।

* পাত্রীটির সংগে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের খুড়তুতো ভাই প্রভাস চন্দ্র ঘোষের বিবাহ হয়।

† সেকালে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকলেও বরকনে সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত একত্রে সহবাস করতো না।

বড়দা'র মৃত্যু

মেজদা বি. এ. পাশ করার পর ঠিক হলো তিনি আমেরিকায় গিয়ে পি. এইচ্. ডি. করবেন। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। তাই ইংরেজ এবং আমেরিকান সরকার কেউই এদেশবাসীকে পাশপোর্ট বা ভিসা মঞ্জুর করছিলেন না। মেজদা তাই ভাবলেন যদি জাপান যাওয়া যায়, তবে সেখান থেকে পশ্চিমে যাওয়ার ভিসা মিলতে পারে।

বাবা কিন্তু এই যাওয়ার ব্যাপারে মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন। ওঁর সন্ন্যাস জীবন মেনে নিলেও বিদেশে গিয়ে বসবাসের প্রচেষ্টা—তা সে যত অল্প দিনের জন্যই হোক্—বাবা বরদাস্ত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মেজদাকে বাবা গোরক্ষপুরে বড়দার কাছে নিয়ে গেলেন। বাবা মনে আশা করেছিলেন হয়তো বড়দা মেজদাকে এই বিদেশ ভ্রমণ বন্ধ রাখতে সম্মত করাতে পারবেন। মেজদা কিন্তু কিছুতেই নিজের সংকল্প ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না—বড়দার অসুস্থতা সত্ত্বেও নয়। এবারেও হেরে গেলেন বাবা। ১৯১৬ সালের অগ্যাস্ট মাসের শেষে মেজদা কলকাতা থেকে জাহাজে করে জাপানের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন।

মেজদা কিন্তু নভেম্বরের গোড়াতেই জাপান থেকে ফিরে আসেন। ওখানকার পরিবেশ তাঁর ভাল লাগেনি। বহির্মুখী জীবনের স্রোতে ভেসে যাবার প্রবণতা দেখে তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তাছাড়া জাপান সরকারও ওঁকে আমেরিকা যাবার প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র দিতে রাজি হয় নি।

জাপানে পেঁছিবার কিছুদিন পরে আমরা মেজদার কাছ থেকে উপহার-ভর্তি বড় পার্শেল পাই। ভেতরে প্রত্যেকের নামে আলাদা আলাদা উপহারের প্যাকেট ছিল। বড়দার জন্য ছিল বেশ বড় একটা বাঁশের কৌটো। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কৌটোর ভিতর দিকের গায়ে লেখা ছিল "ঁঅনন্তলাল ঘোষের জন্য"! আমরা সবাই অবাক হয়ে যাই—কেননা বড়দার পরলোক যাত্রার সংবাদ আমরা তাঁকে জানাই নি। যেদিন তিনি জাপান থেকে ফিরলেন সেদিন বাড়ীর ফটকে আমার সংগে তাঁর দেখা হয়। মেজদা কাঁদতে কাঁদতে বললেন: "বড়দা আরে নেই, নারে! বিষ্ণু আমাকে ডকে খবরটা দিয়েছে বটে, কিন্তু জাপান থেকে ফেরার সময়ই আমি তাঁর মৃত্যুর খবর জানতে পেরেছিলুম।"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "তুমি জানলে কি করে?"

মেজদা বললেন, "মনে পড়ে তোর, সবাই মিলে গোরক্ষপুরে সেই বড়দাকে দেখতে যাওয়ার কথা। সেখানে থাকার দ্বিতীয় দিনেই কেন জানি আমার মনে হয়েছিল বড়দা বেশীদিন বাঁচবেন না। সেইদিন সকালেই ভাঁড়ার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি; বৌদি তখন সেখানে বসে কুটনো কুটছিলেন। হঠাৎ বৌদিকে মনে হলো যেন বিধবার সাজে বসে আছেন।

"ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। চোখের সামনে বৌদির এমন অবস্থা হবে—তা আমি দেখতে পারব না, কিছুতেই পারবো না, কিছুতেই না। কিন্তু

একথা আমি কেমন করে বাবাকে বা তোকে বলি—এ যে বলা যায় না। সত্যি করে বলছি, সেইজন্যেই সেদিন জাপানে পালাতে চেয়েছিলাম। জানি, আমার কথাবার্তা চালচলন সেদিন সকলের কাছে ক্ষ্যাপার মতো মনে হয়েছিল। কিন্তু আমিই বা সেই দৃশ্য সইব কেমন করে?

"জাপান থেকে ফেরার পথে সাংহাইতে বাড়ীর সকলের জন্য উপহার পছন্দ করছি—বড়দার জন্য বাঁশের ওপর কারুকার্যকরা সুন্দর একটা বাক্স পছন্দ হলো। কিন্তু হঠাৎ সেটা আমার হাত ফস্‌কে মাটিতে পড়ে ফেটে গেল। নীচু হয়ে তুলতে গিয়ে বাক্সটির মধ্যে বড়দাকে দেখতে পেলুম আর তখনই বুঝলুম বড়দা আর ইহজগতে নেই। মনটা গভীর দুঃখে ভরে গেল। টুকরোগুলো দোকানীকে ফেরত দিতে সে বললো, 'কি ভাবছেন? ভেঙ্গে গেছে তাতে দুঃখ করার কি আছে? দিন আমাকে ওটি, আমি আপনাকে নতুন সেট দিচ্ছি।'

"আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'না ভাই, যার জন্য এটি নিচ্ছিলাম, আমার সেই দাদা এইমাত্র কলকাতায় মারা গেলেন।'"

মেজদার সেই কথা শুনে আমি বাক্যহারা হয়ে যাই। বিস্ময়ে মনে হলো বুঝি নড়বার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছি। সেই সম্মোহিত ভাবটা একটু কাটতে বললামঃ

"তুমি জাপান যাবার কিছুদিনের মধ্যেই বড়দা খুব অসুখে পড়লেন। গোরক্ষপুরের ডাক্তাররা বললেন বড়দার ম্যালেরিয়া হয়েছে, কেননা ঐ অসুখের সব উপসর্গ মিলে যাচ্ছিল। অথচ বড়দার অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগলো। তখন দাদার একজন চিকিৎসক ডাঃ বিনয় রায়*, বাবা এবং বড়দার শ্বশুর মশায়কে বললেন—বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য বড়দাকে কোলকাতায় নিয়ে যাওয়া উচিত। এই ডাক্তার রায় ছিলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের ভগ্নীপতি। যাই হোক্, ডাক্তার রায়ের পরামর্শ মত বড়দাকে গড়পারে নিয়ে আসা হলো। দোতলার মাঝের ঘরটিতে বড়দাকে রাখা হয়েছিল।

"বড়দাকে পরীক্ষা করার জন্য বাবা কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ লেফ্‌টানেণ্ট কর্ণেল ডাঃ জে. টি. ক্যালভার্টকে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। ডাঃ ক্যালভার্ট তো গোরক্ষপুরের ডাক্তারদের ওপর রেগে আগুন। ভুল চিকিৎসা করে ওঁরা বড়দাকে শেষ করে দিয়েছিল। আসলে বড়দার টাইফয়েড হয়েছিল।

"বড়দাকে নিয়ে সাতদিন ধরে তো যমে মানুষে টানাটানি চললো। মনোমোহনদা'ও তখন আমাদের বাড়ীতে থাকতেন। সারাক্ষণ তিনি বড়দার সেবাশুশ্রূষা করতেন, তাঁর মাথায় বরফের ব্যাগ ধরে থাকতেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধার জন্য বড়দাকে অক্সিজেন দেওয়া হয়েছিল। আমি সেই অক্সিজেনের নল ধরে থাকতাম।

---

* ডাক্তার বিনয় রায়ের বাবা সিভিল সার্জেন রায় বাহাদুর যজ্ঞেশ্বর রায় ছিলেন আমাদের খুড়তুতো বোনের স্বামী।

একদিন সকালে বড়দা আমাকে কাছে ডেকে বললেন, "তোমার বৌদিকে একবার শীগ্‌গির ডেকে নিয়ে এসো তো।"

বৌদি এলে বড়দা বললেন, "আমার ডাক এসেছে। তোমায় ফেলে চলে যাচ্ছি বলে কিছু মনে করো না।"

"শুধু ওইটুকুই—আর কিছুই বলতে পারেন নি বড়দা। শুরু হলো ভুল বকুনি আর ছট্‌ফটানি। এইভাবে সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যে তারপর রাত নেমে এলো। মনে আছে রাত বোধহয় তখন দুটো হবে। ব্যাগে বরফের টুকরো ভরতে ঘরের বাইরে একবার গেছি। এসে দেখি বড়দার ছট্‌ফটানি থেমে গেছে —পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন। মনোমোহনদা তাঁর পাশে মাথা নীচু করে বসে আছেন।"

যোগদা সৎসঙ্গ ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন

বি. এ. পাশ করার অল্পকাল পরেই মেজদা স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছ থেকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষাগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় স্বামী যোগানন্দ। গিরিজী মহারাজ তাঁকে সাংগঠনিক কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেন। আগেই লিখেছি—১৯১৬ সালে, তুলসী বসু মহাশয়ের বাড়ীর একখানা ছোট ঘরে মেজদা একটি আশ্রম তৈরী করেছিলেন। দু'জন বালক সেখানে থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতো এবং অন্যান্যরা নিয়মিত সেখানে আসতেন। স্কুলের পাঠ নেওয়ার জন্য ছাত্রদু'টিকে আশ্রমের বাইরে যেতে হতো। তাই মেজদা স্থির করলেন একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করবেন।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের অভাব মেজদা অনেকদিন থেকেই অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি এমন একটা স্কুল স্থাপন করতে চাইলেন যেখানে কেতাবী পড়াশুনার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক চর্চ্চাও সমানভাবে চলতে থাকবে। তিনি অনেকের সঙ্গেই এ'ব্যাপারে আলাপ করেছিলেন, কিন্তু কেউই তাঁকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেননি। শেষে মেজদা মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করেন। মেজদার পরিকল্পনার কথা শুনে আনন্দ বিহ্বল হয়ে মহারাজ বলেছিলেন, 'তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গের দূত হয়ে আমার কাছে এসেছ। মাত্র গতকালই আমি মনে মনে এ'রকম কিছু করার কথা চিন্তা করছিলুম।'

স্কুল স্থাপনের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করা হলো এবং সেই মত কাজও শুরু হয়ে গেল। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গের ডিহিকায় মহারাজের একটা ছোট বাড়ীতে মাত্র সাতটি ছেলে নিয়ে মেজদা তাঁর স্কুল চালু করলেন।

শুরু হওয়ার বছর খানেকের মধ্যেই ছাত্র সংখ্যা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে স্থান সংকুলানের প্রশ্ন দেখা দিল। মহারাজ তাঁর কাশিমবাজার প্রাসাদের কয়েক মাইল দূরে একটি বাড়ি ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। কিন্তু

সেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ছাত্র শিক্ষক সবাই কয়েকদিনের মধ্যে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন প্রাসাদ সংলগ্ন অতিথি ভবনে সাময়িকভাবে বিদ্যালয়টিকে স্থানান্তরিত করা হয়। তবু ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সমানভাবেই বেড়ে চলে। শেষ পর্য্যন্ত মহারাজ বিদ্যালয়ের জন্য তাঁর রাঁচীর বাগান বাড়িটি দিতে মনস্থ করেন। ১৯১৮ সালে বিদ্যালয়টিকে সেখানেই নিয়ে যাওয়া হয়। মহারাজ যে কেবলমাত্র বাড়ি ও তৎসংলগ্ন জমি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন তাই নয়, তিনি বিদ্যালয়ের খরচ সংকুলানের জন্য মাসিক দু'হাজার টাকাও বরাদ্দ করেছিলেন।

মহারাজার ঐ বাগান বাড়িটা ছিল পঁচাত্তর বিঘা জমি নিয়ে। মেজদার ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের পক্ষে জায়গাটা ছিল আদর্শ। জায়গাটিতে শুধু যে নানা মিষ্ট আর সুস্বাদু ফলের বাগান ছিল তাই নয়, সেখানে ছিল অদ্ভুত শান্ত সুনিবিড় বনমর্মরের প্রাণভরানো পরিবেশ। প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমের আদর্শে গড়া এবং উন্মুক্ত আকাশের নীচে অধ্যয়ন আর অধ্যাপনার ঐকান্তিকতায় ভরা বিদ্যালয়ের উপযুক্ত এমন একটি স্থান অল্পই দেখতে পাওয়া যায়।

মাত্র একশো জন ছাত্র নিয়ে এই আবাসিক বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল। শীঘ্রই এর অধ্যয়ন এবং আধ্যাত্মিক চর্চার উচ্চ মানের কথা চারিদিকে দ্রুত এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে, উৎসাহী প্রবেশ লাভেচ্ছুক শিক্ষার্থীদের আবেদনপত্র হাজার ছাড়িয়ে গেল; স্থানাভাব দূর করতে গৃহের সব অংশে ক্লাশ খোলা হলো। কিন্তু তাতেও সকলের জন্য স্থান সংকুলান করা গেল না। প্রচেষ্টার সার্থকতায় মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয় আনন্দে অভিভূত হয়ে যান। তাই তিনি রাঁচী শহরের বাইরে ১৫ একর জমি সমেত তাঁর 'মধুকম' নামক বাড়ীটি মেজদাকে দান করেন। সেখানে মেজদা আদিবাসী ছাত্রদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়টি মাত্র পাঁচজন ছাত্র এবং একজন শিক্ষককে নিয়ে শুরু হয়েছিল। মাত্র দু'বছরের মধ্যেই বিদ্যালয়টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। তখন সেখানে শিক্ষক ও ছাত্রের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে পাঁচ ও একশত জন। শ্রীযুক্তেশ্বরজীর পুরী আশ্রমেও ছাত্রদের জন্য একটি বিদ্যালয় খোলা হয়। সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতেই লেখাপড়া এবং আধ্যাত্মিক চর্চার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে খেলাধুলা, ভ্রমণ. চড়ুইভাতি প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল।

মেজদার সংস্পর্শে যারাই এসেছেন তারাই দেখেছেন—মেজদা তাঁর আধ্যাত্মিক আদর্শ এবং ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা নিয়ে কারোর সঙ্গেই কোন আপোষ করেন নি। কিন্তু তাঁর ব্যবহার ছিল এমনই ভদ্র এবং হৃদয় এমনই স্নেহমাখানো যে, কেউই কখনো নিজেকে বঞ্চিত বা অপমানিত বোধ করেন নি। তাঁর সদা হাস্যময় মুখ সকলকেই আকর্ষণ করতো। আবার যদি কোন সমস্যাকে তিনি তলিয়ে দেখার মনস্থ করতেন, তাহলে কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারতো না। যখন তিনি কাউকে পরীক্ষা করতেন, সে পরীক্ষা হতো খুবই কঠিন।

রাঁচী আশ্রম বিদ্যালয়ের নিয়ম শৃংখলা ছিল খুবই কঠোর। প্রত্যেককে ভোর পাঁচটায় শয্যাত্যাগ করতে হতো। তারপরে সকলে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতো। একঘণ্টার মধ্যে হাত মুখ ধুয়ে এবং ঘর পরিষ্কার করে সকলে আবার ব্যায়াম ও ধ্যান করার জন্য সমবেত হতো। বারো বছরের চেয়ে বেশি বয়সের ছেলেদের মেজদা নিজে আধ্যাত্মিকতার পাঠ দিতেন।

বিদ্যালয়ের আর্থিক স্বচ্ছলতা মোটেই ছিল না—যা আয় হতো তাই দিয়ে কোনরকমে ব্যয় মেটানো হতো। বিদ্যালয়ের আয় বলতে তখন ছিল শুধু মহারাজ মনীন্দ্র নন্দীর মাসিক অনুদান আর থাকা-খাওয়া ও পড়াশুনার জন্য ছাত্রদের মাহিনা। এই আয় থেকে প্রয়োজনীয় সব কিছুর বন্দোবস্ত করা হতো। ছাত্রদের পরিধেয় ছিল দেশজ মোটা কাপড়ের তৈরী পোষাক। কিন্তু তাই বলে কোনদিনও কাউকে অপরিচ্ছন্ন থাকতে হয়নি। আশ্রমের সকলেই নিজ নিজ জামাকাপড় ও ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেন।

মেজদার তীক্ষ্ম দৃষ্টির ফলে আশ্রম-বিদ্যালয়ের সব কিছুর মধ্যে বেশ শৃঙখলা ছিল। কোনরকম অশোভনতা বা দুর্বিনীত আচরণ তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারতো না। এজন্যে মেজদা কিন্তু কখনও কারুর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেন নি। অপরাধীকে কাছে ডেকে তার অপরাধের ভবিষ্যৎ পরিণাম সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর সহৃদয়তা ও সুমধুর অনুশাসনের জন্য অপরাধী দ্বিতীয়বার আর একই অপরাধ করতো না।

ছাত্রদের কাছে মেজদা ছিলেন স্নেহপরায়ণ পিতা ও বন্ধুর মতো। যে কেউ নির্ভয়ে নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হতে পারতো। মেজদা কখনো বা সন্তান স্নেহে কখনো বা বন্ধু বাৎসল্যে তার সেই অসুবিধা দূর করতেন। এমন কি তিনি ওদের খেলার সাথীও হতেন। ওঁর উপস্থিতিই ছিল যেন একটা আশা, একটা উদ্যম, একটা ভরসা।

ছাত্র-শিক্ষক সকলের কাছেই মেজদার মুখের কথা ছিল যেন বেদবাক্য। তিনি তাদের বলতেন—প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবনকে ভবতারিণী মায়ের পায়ে নিবেদন করে যোগ-এ পরিণত করতে পারে। আধ্যাত্মিক জীবনে পূর্ণ পরিণতি লাভের জন্য সচেষ্ট হতে তিনি তাদের উৎসাহিত করতেন। যারা ওঁর সংস্পর্শে এসেছেন তারাই বিশ্বাস করতেন——মেজদা তাঁর সামান্য স্পর্শে বা দুটি একটি উপদেশে তাদের অন্তর বিকশিত করতে পারেন। তাঁরা আরও বলতেন—প্রভু যীশুর মত মেজদাও শিষ্যদের ক্ষমতা অনুযায়ী নিজ আত্মিক শক্তি তাদের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট করার ক্ষমতা ধরতেন।

মেজদা বলতেন : আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে হলে অনন্তকাল ধরে প্রচলিত ও শাস্ত্রীয় নীতি অনুসারে লিখিত 'যম' ও 'নিয়ম' সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হবে। সদাচরণ করা ছাড়াও তিনি সকলকে দেহ ও মনের উন্নতিসাধন করার জন্য সচেষ্ট হতে বলতেন। কারণ অসুস্থ দেহ, অ-সুস্থ চিন্তার আধার। তাছাড়া যে কোন অনুভূতি লাভের জন্যই প্রয়োজন সুস্থ মন, সুস্থ দেহ এবং সুস্থ চিন্তা।

রাঁচীর ক্যাথলিক গির্জার এক ফাদারের সঙ্গে মেজদার খুবই হৃদ্যতা ছিল। তাঁদের দু'জনের মধ্যে প্রায়ই ধর্মীয় বিষয়ে নানা আলাপ আলোচনা হতো। ঐ ফাদার মেজদার আমন্ত্রণে মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে আসতেন এবং ছেলেদের প্রভু যীশুর পবিত্র জীবনকাহিনী শোনাতেন। আর এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ ক্যাথলিক বিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্মের ক্লাশে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পড়ান হতো।

১৯২০ সালে আমেরিকার বোস্টন শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অফ্ রিলিজিয়াস লিবারেলসদের সভায় বক্তৃতা দেবার জন্য মেজদাকে আমন্ত্রণ জানান হয়। শ্রীযুক্তেশ্বরজী মেজদাকে বললেন যে তাঁকে ঐ অনুষ্ঠানে যেতেই হবে। তাঁর অনুপস্থিতির সময় রাঁচী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক নির্বিশেষে সকলেই এক বিরাট শূন্যতা অনুভব করতেন। তারা দিন মাস বছর ধরে অপেক্ষা করেছিলেন কবে আবার তিনি তাদের মাঝে ফিরে আসবেন। তাদের মনে পড়ে—কত জ্ঞানগর্ভ কথাই না তিনি তাদের বলতেন, অপত্যস্নেহে তাদের বুকে টেনে নিয়ে সকল শোক দুঃখ ব্যথা-বেদনা দূর করে দিতেন।

১৯২৯ সালে মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় পরলোক গমন করেন। মেজদা তখন আমেরিকায়। মহারাজের মৃত্যুতে রাঁচী স্কুলের প্রধান আয়ের পথটি বন্ধ হয়ে যায়। নিজের আর্থিক অস্বচ্ছলতার দিনেও মহারাজ কিন্তু বিদ্যালয়ের জন্য অনুদান বন্ধ রাখেননি। তাঁর মৃত্যুর পর উত্তমর্ণগণ কোর্টে নানা মামলা মকোদ্দমা সুরু করে দেন। যাই হোক্, রিসিভারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে মহারাজের পুত্র শ্রীশিরিস চন্দ্র নন্দী ঐ রাঁচী সম্পত্তিটি পূর্বেই নিজের স্ত্রীর নামে ট্রানস্ফার করিয়ে রাখেন।

ইতিমধ্যে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার রাঁচী বিদ্যালয়কে যে সামান্য অর্থ সাহায্য করতেন তাও ১৯৩০ সালে বন্ধ করে দেন, কারণ তাঁরা মনে করেন বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করেন। ফলে বিদ্যালয়টি কঠিন আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। মেজদা চিরদিনই বিদেশী সরকারের অর্থানুকূল্যে অনুগৃহীত পরাধীন ভারতবর্ষের চেয়ে দরিদ্র স্বাধীন ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মেজদা যদি নিজেকে ভগবদ্ সন্ধান সাধনায় সম্পূর্ণ মিশিয়ে না দিতেন, তাহলে দেশ তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মহান্ সৈনিকরূপে নিশ্চয়ই লাভ করতো। এইভাবে রাঁচী স্কুল বাইরের সমস্ত অর্থ সাহায্য লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। 'মধুকমে' স্থাপিত স্কুলটি আর্থিক টানাপোড়েনে উঠে গেল। এদেশে অনেকের কাছেই মেজদা আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন কিন্তু কারুর কাছ থেকেই বিশেষ কোন সাড়া পান্ নি। এইভাবে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত চল্‌লো। সেই বছর মেজদা ভারতে ফিরে আসেন এবং তাঁর চেষ্টায় ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের আর্থিক বুনিয়াদ আবার মজবুত হলো। আমেরিকায় তাঁর বক্তৃতালব্ধ অর্থ সঞ্চয় করে এবং সেখানকার ভক্তমণ্ডলীর আর্থিক সাহায্য নিয়ে তিনি একটা তহবিল গড়ে তোলেন। বাবাও সেই তহবিলে একটা মোটা টাকা দান করেন। এই সমস্ত

টাকা দিয়ে মেজদা শ্রী শিরিষ চন্দ্র নন্দী মহাশয়ের কাছ থেকে বিদ্যালয়ের জমিটা কিনে নেন এবং তার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার বিধিমত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

১৯৩৫ সালে তিনি যখন আবার রাঁচী আশ্রমে ফিরে এলেন, সেদিনের দৃশ্য আমি কখনো ভুলতে পারব না। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে কত পুরাতন ছাত্র যে সেদিন উপস্থিত হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। ভাবলে অবাক্ লাগে সম্পূর্ণ অনাত্মীয় এই সব মানুষ কেন তাঁকে এত ভালবাসে, এত শ্রদ্ধা করে! তাদের স্বতঃ উৎসারিত মন-প্রাণ-ঢালা ভক্তি দেখে আমার চোখের জল আর বাঁধ মানতে চায়নি। মনে হয়, সেই পুরানো দিনগুলি যেন আবার ফিরে এসেছে। অথচ এও দেখেছি মেজদার সামান্য স্পর্শে তারা সব দুঃখ ভুলে গেছে, তাদের মন আবার নতুন উদ্দীপনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে!

মেজদার আমেরিকা যাত্রা

১৯২০ সালে মেজদা যখন রাঁচীর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের আরও সংস্কার নিয়ে ব্যস্ত, সেই সময় তিনি আমেরিকার বোস্টন শহরে অনুষ্ঠেয় ইণ্টার-ন্যাশ্‌ন্যাল কংগ্রেস অফ্ রিলিজিয়াস লিবারেলস্‌দের ধর্মসভায় ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে যোগদানের আমন্ত্রণ পান। অধিবেশনের আয়োজন করেছিলেন অ্যামেরিকান ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। মেজদা একটু ইতস্ততঃ করলেও শ্রীযুক্তেশ্বরজী তাঁকে বললেন—জীবনের বৃহত্তর উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে আমেরিকায় তাঁকে যেতেই হবে।

স্বপ্নভূমি আমেরিকার আমন্ত্রণে মেজদা মনে মনে স্বাভাবিক কারণেই আনন্দ পেয়েছিলেন। তিনি সব সময়ে ভেবেছেন ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক সম্পদের সঙ্গে প্রতীচ্যের কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যদি সংমিশ্রণ ঘটানো যায়, তবেই পৃথিবীবাসী এক সুষম গৌরবময় জীবনের অধিকারী হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাই তিনি অনেক সময় বলতেন—কলম্বাস আমেরিকায় পেঁৗছেও ভেবেছিলেন তিনি ভারতেই এসেছেন।

আনন্দিত হলেও, মেজদা কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটু শংকিতও হয়ে পড়েন। বক্তৃতা বলতে যা বোঝায়, তা তিনি ইংরাজী ভাষায় আগে কখনও দেন নি। মনের এই শংকার কথা জানাতে তিনি গুরুদেবের কাছে ছুটে যান। শ্রীযুক্তেশ্বরজী তাঁকে বলেন: "ইংরাজী বা অন্য যে কোন ভাষায় হোক্, পাশ্চাত্যের লোকেরা যোগের বিষয়ে তোমার কথা শুনবেই।"

বাড়ী ফিরে মেজদা বাবাকে সব কথা বলতে তিনি অবাক হয়েছিলেন। ছেলে যে তাঁর কাছ থেকে অত দূরদেশে চলে যাবে সে'কথা তিনি মনেও ভাবতে পারেন নি। তাছাড়া বাবার ভয় ছিল—মেজদার সঙ্গে তাঁর বোধহয় আর জীবনে দেখাও হবে না।

তাই একটু রাগতস্বরেই তিনি বললেন, "যাবে যে, তা টাকা পাবে কোথায়?"

—"কেন? আপনিই দেবেন। হয়তো ভগবানই আপনাকে সে ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন"—মেজদা একটু হেঁসেই কথাগুলি বলেছিলেন।

—'না, কখ্খনো নয়'।

তাই পরদিন বাবা যখন মেজদার হাতে একটা মোটা টাকার চেক্ দিলেন, তখন মেজদা সত্যিই খুব আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন। বাবা তাঁকে বলেছিলেন, 'এ'টাকা তোমাকে আমি তোমার পিতা হিসাবে দিচ্ছি না—দিচ্ছি, লাহিড়ী মশায়ের শিষ্য হিসেবে। 'ক্রিয়াযোগে'র মুক্তিদায়িনী শক্তির কথা পশ্চিমে গিয়ে প্রচার করবে, সেটাই আমি তোমার কাছে আশা করবো।'

আবেগ মেশানো গলায় মেজদা বলেছিলেন, "আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো বাবা। ঈশ্বরের সেবা করা ছাড়া জীবনে আর কোন আকাঙ্খাই আমার নেই। প্রার্থনা করি, চিরদিন যেন তাঁর আশীর্বাদ পাই।"

এ'সব সত্বেও মেজদার মনের দুশ্চিন্তা কিন্তু কিছুতেই কাটছিলো না। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক পরিবেশ ছেড়ে পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে কিভাবে খাপখাওয়াবেন—সেই ভাবনা সব সময় তাঁকে চিন্তিত করতো! একদিন ভোরবেলা মেজদা গড়পারের বাড়ীর দোতলার ছোট ঘরটিতে বসে প্রার্থনা করছিলেন আর কাঁদছিলেন। ঘরের দরজায় সেই সময় কে যেন টোকা দিল। দরজা খুলতেই মেজদা দেখেন কৌপীনধারী এক জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ঘরে ঢুকে দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। কারুর মুখে কোন কথা নেই। সন্ন্যাসীকে দেখতে অবিকল যুবক বয়সের লাহিড়ী মশায়ের মতো। মেজদা হঠাৎ বুঝতে পারলেন—তাঁর সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি মহাবতার বাবাজী মহারাজ।

মেজদা তখনো পর্য্যন্ত কোন কথা না বললেও সেই সন্ন্যাসী যেন মেজদার মনের চিন্তা বুঝতে পেরেই বললেন, 'হ্যাঁ বৎস, আমিই বাবাজী। ভগবান তোমার প্রার্থনা শুনেছেন। তাই তিনিই আমায় তোমাকে এই কথা বলতে পাঠিয়েছেন: "গুরু আজ্ঞা মান্য করে তুমি আমেরিকায় যাও। ভয় পেয়ো না, তিনি তোমায় রক্ষা করবেন। আমি তোমাকে পাশ্চাত্যে ক্রিয়াযোগ প্রচার করার জন্য নির্বাচিত করেছি। বেশ কয়েক বছর আগে যুক্তেশ্বরের সঙ্গে কুম্ভ-মেলায় আমার দেখা হয়েছিল। তখনই আমি তাকে বলেছিলাম তোমাকে আমি তার কাছে শিক্ষালাভের জন্য পাঠাব।" স্বয়ং অমর মহাবতারের মুখ থেকে সেই আশ্বাসবাণী শুনে মেজদার মন আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠলো। মাথা নীচু করে প্রণাম করলেন সেই মহাগুরুকে। 'জয়স্তু' বলে বাবাজী মহারাজ যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন সেইরকম নিঃশব্দে চলে গেলেন।

অগ্যাস্ট মাসের নির্দ্দিষ্ট দিনে গুরুর আশীর্বাদ আর সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে 'দি সিটি অফ্ স্পারটা' জাহাজে করে মেজদা আমেরিকার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকাগামী সেটাই ছিল প্রথম যাত্রী জাহাজ। মেজদার সঙ্গী হিসাবে যাবার জন্য আমারও প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজ-পত্র প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যদেবতা আমার প্রতি বিরূপ—তাই আর যাওয়া হলো না। পারিবারিক একটা অঘটন আমার যাত্রার বাধা হয়ে দাঁড়ালো।

বোস্টন সম্মেলনে মেজদার 'The Science of Religion' বিষয়ক বক্তৃতা উপস্থিত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করেছিল। বহু জায়গা থেকে বক্তৃতা দেবার জন্য মেজদার কাছে অসংখ্য অনুরোধ আসতে থাকে। শীঘ্রই বোস্টনে তাঁর গুণমুগ্ধের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। সর্বত্রই তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল—শরীর, মন ও আত্মার সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতি বিধানের কালজয়ী যোগ পদ্ধতি। এই যোগের সুপ্রাচীনত্ব যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও উল্লিখিত হয়েছে সেকথা তিনি তাদের কাছে প্রকাশ করে বলেন।

এরপর মেজদা সারা দেশে বক্তৃতা করে বেড়ান। তাঁর বাণী গোটা আমেরিকায় সাড়া জাগিয়ে তোলে। আমেরিকার বড় বড় শহরগুলিতে যেমন নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, ডেনভরে—সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এরপর ১৯২৫ সালে লস্ এইনজেলসের মাউণ্ট ওয়াশিংটনে মেজদা তাঁর বিশ্বব্যাপী মিশনের সদর দপ্তর স্থাপন করেন। তাঁর সাফল্যের সংবাদ আমেরিকার বিখ্যাত সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়। আমেরিকার ধর্মীয় জীবনে এটাকে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা বলে আমরা মনে করতে পারি।

ক্রমে ক্রমে তাঁর বাণী ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর সারাজীবনের সাধনা এই বাণীর মধ্য দিয়ে যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ ছাত্র মেজদার বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে যে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করেছেন, তা বাস্তবিকই এক পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার।

মেজদা বিশ্বাস করতেন পৃথিবীর সকল মানুষ একই পিতার সন্তান। মানুষ যদি এই অবিসংবাদিত সত্যটিকে ভুলে না যায়, তবে সেই চিন্তাই একদিন বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও একতার ভিতটি গড়ে তুলবে।

১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত বাবা প্রতিমাসে মেজদাকে চারশত করে টাকা পাঠাতেন। আমার কাজ ছিল সেই ব্যাংক ড্রাফ্‌ট কেনা ও পাঠানো। একবার আমেরিকাতে একজন মেজদাকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, "আপনি তো কেবল টাকা রোজকার করতেই আমেরিকায় এসেছেন!

তাতে মেজদা বিরক্ত হয়ে রেগে বলেছিলেন: "আপনারা শুনলে অবাক হবেন এই দশ বৎসরে আমি সামান্য টাকাই পেয়েছি। আধ্যাত্মিক সত্য প্রচার করার উদ্দেশ্যেই আমার এদেশে আসা। আমার এই কাজে সাহায্য বাবদ সমস্ত টাকা বাড়ী থেকেই পাই।"

বাবা একবার মেজদাকে চিঠি লিখেছিলেন: "তোমাকে আর কতকাল টাকা পাঠাতে হবে?"

মেজদা তার জবাবে লিখেছিলেন: "বাবা আপনি উপস্থিত টাকা পাঠিয়ে যান। আর যখন প্রয়োজন থাকবে না, তখন সে'কথা সময়মত আমিই আপনাকে জানাবো। তবে এটা জানবেন—যে টাকা এখন আপনি পাঠাচ্ছেন তার সবটাই বংশের মঙ্গলের জন্য নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।"

১২ ভারতে প্রত্যাবর্তন—১৯৩৫ সাল

গৃহে আগমন

১৯৩৫ সালে মাত্র এক বছরের জন্য মেজদা তাঁর পরমপ্রিয় ভারতভূমি এবং অগণিত বন্ধু ও ভক্তদের মাঝে ফিরে এসেছিলেন। এই স্বল্পকালের মধ্যেও তিনি বহু জায়গা ভ্রমণ করে যোগদা বাণী প্রচার করেছেন এবং সারা দেশের নানা জায়গায় কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করেছেন। শুধু তাই নয় তাঁর উপস্থিতি ও নির্দেশের অভাবে যে সব সংস্কার বন্ধ হয়েছিল তাও তিনি সুরু করেছিলেন এবং তাদের উন্নতি ঘটিয়েছিলেন।

তাঁর আগমনের দিন সকালবেলায় বাড়ীতে মহা ধুমধাম লেগে যায়। বাড়ীতে অনেক আত্মীয়-স্বজনের সমাগম হয়েছে। সব ঘর থেকে ধূপধুনার সুমিষ্ট গন্ধ ভেসে আসছে। সিঁড়ি থেকে সদর দরজা পর্য্যন্ত বিচিত্র কারু-কার্যময় আলপনা আঁকা হয়েছে। সুদূর আমেরিকা থেকে এক সন্ন্যাসী-পুত্র তাঁর পিতৃসন্দর্শনে আসছেন, তাই এই সমারোহ।

শিষ্য, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব—বহু লোক সেদিন মেজদাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সপার্ষদ মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয়ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এক সময় বম্বে মেল ধীরে ধীরে স্টেশনে প্রবেশ করলো। মেজদা তাঁর কামরা থেকে অবতরণ করলেন। আমরা সবাই তাঁকে মাল্যভূষিত করলাম। তারপর তাঁর জন্য নির্দিষ্ট গাড়ীতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো ; মহারাজাও সেই একই গাড়ীতে উঠে মেজদার পাশে বসলেন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন অন্য গাড়ীতে তাঁকে অনুসরণ করলেন। মেজদার গাড়িটা চালাচ্ছিল আমাদেরই ছোট ভাই বিষ্ণুচরণ। তার সেকি উৎসাহ! আমি পাইলটের মতো মোটরবাইকে চড়ে শোভাযাত্রার সামনে সামনে যাচ্ছিলাম। বাবা তখন যে বাড়ীতে* থাকতেন সেখানে শোভাযাত্রা উপস্থিত হলে পর চারদিকে শাঁখ বেজে ওঠে, ওপর থেকে পুষ্প ও লাজবর্ষণ চলতে থাকে এবং নহবৎখানা থেকে সানাইয়ের সুমধুর ধ্বনি সমস্ত পরিবেশটিকে অপূর্ব আনন্দময় করে তোলে।

তারপর মেজদা বাবার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দু'জনে পরস্পরকে গভীর আলিংগন করলেন ; মনে হলো যেন তাঁদের এই পুনর্মিলন ঈশ্বরেরই আশীর্বাদ। উপস্থিত সকলের চোখেই তখন আনন্দাশ্রু বইছে। এমনকি বাবার মতো রাশভারী লোককেও দু-একবার চোখ মুছতে দেখেছি।

প্রথম রাঁচী যাত্রা

শ্রীরামপুরে আপন গুরু শ্রীযুক্তেশ্বরজীর সংগে এবং কোলকাতায় নিজ ভক্তদের মধ্যে কিছুদিন কাটাবার পর মেজদা স্থির করলেন মোটরে করে রাঁচী

* বাবা সে সময় ৪/২ রামমোহণ রায় রোডের বাড়ীতে থাকতেন।

যাবেন। সেখানকার স্কুলটি দেখার জন্য তিনি খুবই ব্যাগ্র হয়ে পড়েছিলেন। তখন ওখানকার স্কুল ও আশ্রমের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী সত্যানন্দ।* মেজদা এবং তিনি—উভয়েই উভয়কে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে কাল গুণছিলেন।

মেজদা তাঁর V-৪ ফোর্ড গাড়িটাকে আমেরিকা থেকে এদেশে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তাঁর ভারত ভ্রমণের সঙ্গী রিচার্ড রাইট গাড়িটি চালাচ্ছিল। ঐ গাড়িতে ওঁরা দু'জন ছাড়াও আমাদের বড়দি, বিষ্ণু ও তুলসীদা উঠেছিলেন। আর আমার আট সিলিণ্ডার বুইক্ গাড়িতে উঠেছিল প্রকাশ দাস (পরে স্বামী আত্মানন্দ), হিমাংশু (জাতীয় জিমন্যাস্ট চ্যাম্পিয়ান) এবং আমার ভাগ্নে বিনু। আমার গাড়ির চারটি চাকা নতুন হলেও 'স্টেপনী' দুটির অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল—যে কোন সময় ফেটে যেতে পারে। রাঁচী যাবার সময় আমি তাই মনে মনে গভীর প্রার্থনা করেছিলাম যেন পথে চাকা বদলাবার দরকার হয়ে না পড়ে।

যাত্রা শুরুর আগে আমার টায়ারের অবস্থা দেখে মেজদা সগর্বে বলেছিলেন—'আমার ফোর্ড গাড়ির আমেরিকান টায়ার পাংচার-প্রুফ্। টায়ার ফেটে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।' কিন্তু আমেরিকার টায়ার কোম্পানী তো আর ভারতবর্ষের রাস্তাঘাটের অবস্থা জানতেন না! তাই বর্ধমানের কাছে যেতে না যেতেই মেজদার গাড়ির একটি চাকা ফেটে গেল। রাইট এবং আমি দু'জনে মিলে চাকাটা পাল্টে ফেললাম। যাই হোক্ আবার যাত্রা সুরু হলো। তারপর আসানসোল ছাড়িয়ে কিছুটা দূর যাবার পর রাস্তায় পড়ে থাকা গরুর পায়ের নাল লেগে মেজদার গাড়ির আর একটি চাকাও ফেটে গেল। ফোর্ড গাড়ির একটার বেশি অতিরিক্ত চাকা না থাকাতে আমরা সবাই ভীষণ মুশকিলে পড়ে গেলাম।

মেজদা তো রাস্তার ধারে এক বড় গাছতলায় আস্তানা গেড়ে বসলেন আর বড়দির রান্না করে আনা ছানার ডাল্না খেতে লাগলেন। এদিকে আমরা তো মহাভাবনায় পড়ে গেলাম। কি করা যাবে সকলে ভাবছি এমন সময়ে মনে পড়ল—আসানসোলে বিষ্ণুর পরিচিত এক ভদ্রলোক থাকেন। তৎক্ষণাৎ বিষ্ণু ও ডিক্ রাইটকে সঙ্গে নিয়ে আসানসোলে এসে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে আমাদের অবস্থার কথা জানালাম। আমাদের অনুরোধে ভদ্রলোক একটি স্থানীয় দোকানে ফোন করলেন এবং তাঁর নামে রসিদ কেটে আমাদের দুটি নতুন টায়ার দিয়ে দিতে বল্লেন। ঐ টায়ার কেনার মত টাকা আমাদের সঙ্গে ছিল না, তবে কথা দিলাম ফেরার পথে টাকাটা দিয়ে যাব।

কাজ সেরে মেজদার কাছে এসে ফোর্ড গাড়িতে চাকা লাগিয়ে যাত্রা করতে আমাদের রাত হয়ে গেল। আমরা যখন হাজারীবাগ পাহাড়ের ওপর দিয়ে

* পূর্বাশ্রমে মনোমোহন মজুমদার।

যাচ্ছি তখন বেশ রাত। ভোর থেকে অত পরিশ্রমের পর ক্লান্তিতে আমার চোখ ঘুমে বুঁজে আসছিল। পথে এক জায়গা থেকে আমরা আলুর দম কিনেছিলাম, কিন্তু এত ঝাল যে মুখে দেয় কার সাধ্য। তাই ভাগ্নে বিনুকে বললাম, "যেমনি দেখবি আমি ঢুলে পড়ছি অমনি ঐ ঝাল আলুর দমের কাই আমার মুখে লাগিয়ে দিবি।" এই করে পাহাড়ের যত চড়াই উৎরাই এবং বিপদ্‌জনক বাঁক পার হয়েছিলাম। ইতিমধ্যে ডিক্‌ আমাদের ফেলে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। আমি কেবল ঈশ্বর ও গুরুদেবের কাছে বিরামহীন প্রার্থনা করে চলেছিঃ হে ভগবান্‌ এই নির্জন জঙ্গলে আমার গাড়ির চাকা যেন না ফাটে। সেই প্রার্থনার ফলে কোন বিপদ হয়নি। অবশেষে ভোর তিনটের সময় আমরা রাঁচী বিদ্যালয়ে পেঁছিলাম। তখন সত্যানন্দজী, শিক্ষকগণ ও ছাত্ররা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর শুয়ে পড়েছেন। গাড়ির শব্দ শুনে সকলে হৈ হৈ করতে করতে বেরিয়ে এলেন। মেজদা সত্যানন্দজীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—দু'জনের চোখ থেকে অবিরাম আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ছে! সে এক মধুর দৃশ্য! কত কালের অদর্শন—কেউ কাউকে ছাড়তে চান্‌ না। আদর অভ্যর্থনা-পর্ব শেষ হতে হতে ভোর হয়ে গেল।

রাঁচী বিদ্যালয়ের আর্থিক ভিত মজবুত হলো

রাঁচীতে থাকাকালে সেখানকার বিদ্যালয়ের আর্থিক সংকটের চিত্রটি মেজদার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সত্যানন্দজী মেজদাকে বললেন—মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মারা যাবার পর তাঁর বিষয়-সম্পত্তি কোর্ট অফ্‌ ওয়ার্ডসের অধীনে চলে গেছে। ফলে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া মাসিক অনুদানটিও বন্ধ হয়ে গেছে। সৌভাগ্যবশতঃ মহারাজের দত্তক পুত্র শ্রীশচন্দ্র নন্দী পূর্বেই রাঁচী বিদ্যালয়ের জমিটিকে বিদ্যালয় বাঁচানোর উদ্দেশ্যে নিজ স্ত্রীর নামে হস্তান্তর করিয়ে রেখেছিলেন। সত্যানন্দজী মেজদাকে আরও জানালেন, "বিদ্যালয়টিকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে আমি এবং সকল শিক্ষকবৃন্দ একত্র হয়ে 'ব্রহ্মচর্য্য সঙ্ঘ' গড়ে তুলি। তাকে রেজিস্ট্রিও করা হয়। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ঐ নামে চাঁদা তোলা। ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়টিও ঐ সঙ্ঘের সংগে একত্রে যুক্ত হয়েছে। অতি কষ্টে সামান্য চাঁদা তুলে আমরা কোনরকমে স্কুলটিকে বাঁচিয়ে রেখেছি।"

মেজদা বল্লেন, "তার মানে আমার ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় আর নেই। এখন এটি তোমাদের। যাই হোক্‌, তোমাদের ঐ ব্রহ্মচর্য্য সংঘকে উঠিয়ে দাও। আমি আবার নতুন করে স্কুল খুলবো।"

সত্যানন্দজী তাতে রাজী হলেও অন্যান্য শিক্ষকরা রাজী হলেন না। বিষ্ণু ও হিমাংশু (দু'জনাই জিম্‌নাস্টিকসের চাম্পিয়ান) সেই সব শিক্ষকদের ভীষণ ভয় দেখালো। তখন সকলে খানিকটা রাজী হলেন তবে কিছু টাকা

চাইলেন। ১২০০ টাকায় রফা হলো। ওঁরা সেই টাকা নিয়ে বিদ্যালয় ছেড়ে চলে গিয়ে কিছুদূরে আর একটি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় খুললেন।

কোলকাতায় ফিরে মেজদা পরামর্শের জন্য মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে দেখা করেন। শ্রীশচন্দ্র মহাশয় মেজদাকে বললেন, "জানেনই তো সব স্টেট্ কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডের হাতে চলে গেছে। কি করবো নিতান্ত বাধ্য হয়েই অতি সামান্য ৩০,০০০ টাকা চাইছি।" (ঐ ৭৫ বিঘা জমির দাম কম করেও দেড় লক্ষ টাকা হবে)। মেজদা সেই দামে রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু সমস্যা হলো —অতো টাকা কোথায় পাওয়া যায়! মেজদা বাবার কাছে সাহায্য চেয়ে বললেন "আপনি যদি সাহায্য না করেন তাহলে স্কুলের জন্য ঐ সম্পত্তিটি আমি কিনতে পারবো না। আমার ছোটবেলাকার এবং সারাজীবনের সব স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে। তাছাড়া ওখানকার আবহাওয়া অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। পরিবারের যে কেউ যখন খুশী ওখানে স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য যেতেও পারবেন।"

অল্প বয়সে বাবা অনেক দুঃখের মধ্যে দিয়ে দিন কাটিয়েছেন। তাই শিক্ষা এবং সেবা প্রতিষ্ঠানের কাজে তিনি সর্বদা উৎসাহ দিয়েছেন এবং এই ধরণের প্রতিষ্ঠানে নিজের নাম প্রকাশ না করেও বহু অর্থ দান করেছেন। তাছাড়া গ্রীয়ার পার্কে মেজদা যখন খেলাধুলার প্রতিযোগিতা আয়োজন করতেন, তখন বাবাই হতেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁর উদার হস্তের দান থেকে সমস্ত খরচ-খরচা পূরণ হতো।

মেজদার রাঁচী যোগদা সৎসঙ্গ ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের ঐ সংকটের দিনে বাবা মুক্ত হস্তেই দান করেছিলেন। আমেরিকায় মেজদার সাফল্য দেখে এবং সে দেশের হাজার হাজার মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা জেনে বাবা খুবই গর্ববোধ করতেন। তাই রাঁচী বিদ্যালয়ের জন্য ভূ-সম্পত্তি কেনা বাবদ তিনি খুশী হয়েই মেজদাকে ১০,০০০ টাকা দিয়েছিলেন।

তবুও সব টাকা জোগাড় হলো না। অগত্যা মেজদা তাঁর আমেরিকার সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন্ ফেলোশিপের কাছে চিঠি লিখলেন। তখন মেজদার ঐ প্রতিষ্ঠানটি এখনকার মত অত বড় ও অর্থশালী হয়ে ওঠেনি। যাই হোক্ সেখানকার অন্যান্য ভক্ত এবং বিশেষ করে মিস্টার জেমস্ জে. লীন* বিদ্যালয়টিকে সুদৃঢ় আর্থিক বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠা করতে বাকী ২০,০০০ টাকা পাঠিয়ে দেন। রাঁচীর ঐ জমি বিক্রির টাকা গ্রহণ করতে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয় সত্যই খুব বেদনাবোধ করেছিলেন—কিন্তু গ্রহণ না করেও তাঁর কোন উপায় ছিল না। তাঁর বাবা বহু টাকা ঋণ করে গিয়েছিলেন। সেই ঋণের টাকা তখন তাঁকে শোধ করতেই হবে।

* মিঃ লীন পরবর্তীকালে রাজর্ষি জনকানন্দ নামে সুপরিচিত হন এবং পরমহংস যোগানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর প্রথম আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত হন্।

ঐ জমির বিক্রি-কবলা রাঁচীতে রেজিস্ট্রি করার জন্য আমি, রাজার সচিব, আমার স্ত্রী, দুই শিশু পুত্র এবং বিষ্ণুকে নিয়ে রাঁচীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বিষ্ণুর দুরন্ত গতিতে গাড়ি চালানো দেখে মেজদা বলে দিয়েছিলেন বিষ্ণু যেন গাড়ি না চালায়। তিনি বিষ্ণুকে কোনদিন আমেরিকা থেকে আনা ফোর্ড গাড়ি চালাতে দিতেন না। যাই হোক্, রাঁচী গিয়ে সব কাজ শেষ করে কলকাতা ফেরার সময় দেখলাম বিষ্ণু বিশেষ অসন্তুষ্ট—গাড়ি চালাতে দিচ্ছি না বলে। শহরের বাইরে গাড়ি চালাতে তার ভীষণ ইচ্ছে। অভিমান দূর করতে ওকে শেষ পর্য্যন্ত গাড়ি চালাতে দিলাম বটে, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম মেজদার কথা অমান্য করে কত বড় ভুল করেছি। গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড হয়ে যখন বালী ব্রীজ পার হচ্ছি তখন এক সাহেব পেছন থেকে এসে খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে বিষ্ণুকে অতিক্রম করে গেল। অমনি বিষ্ণুরও জেদ চেপে গেল আর সেও ভীষণ জোরে গাড়ি ছোটাল। অপর গাড়িটিকে হারাবার জন্য সে উদ্দাম বেগে চালাতে লাগলো। আমি এবং রাজার সচিব বার বার বারণ করলেও কোন ফল হলো না। কতবার যে তাকে অতিক্রম করতে গিয়ে অন্য গাড়ির সংগে ধাক্কা লাগার উপক্রম হয়েছিল তার ঠিক নেই। আমরা সবাই প্রাণ হাতে করে দুর্গানাম জপতে শুরু করেছি। যাই হোক্ একবার সুযোগ পেয়ে আপার সারকুলার আর মানিকতলার মোড়ে সে অন্য গাড়িটিকে অতিক্রম করলো। পাশ দিয়ে যাবার সময় অন্য গাড়ির চালককে মুখ ভেঙ্গিয়ে বেরিয়ে গেল। আমরাও বাঁচলাম। মেজদা এলে সব কথা বলাতে তিনি খুব রাগ করতে লাগলেন।

রিচার্ড রাইট

রিচার্ড রাইটের নাম এই জীবনস্মৃতিতে আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি মেজদার সঙ্গী হিসাবে ভারত ভ্রমণে এসে রাঁচী আশ্রমে গিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি হলেন শ্রীশ্রী দয়ামাতার* ভাই। আমেরিকা থেকে আসার সময় তিনিই ফোর্ড গাড়ি চালিয়ে মেজদাকে য়ুরোপ পরিদর্শন করান এবং এদেশে এসেও বেশিরভাগ সময় তিনিই ঐ গাড়িটি চালাতেন। সেকালের রাস্তা-ঘাটের কথা স্মরণ করে তাঁর এই গাড়ি চালানো অবশ্যই কৃতিত্বের দাবী করতে পারে। এদেশে থাকাকালে মেজদা অনেক জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছেন। ডিক্ রাইট সে'সময় মেজদাকে সাহায্য করা ছাড়াও ভক্তদের সঙ্গে দেখাশোনা করা, যোগদা সোসাইটির প্রশাসনিক কাজকর্মে সহায়তা ইত্যাদি নানা বিষয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। মেজদার বক্তৃতার পর প্রতিবারই অনেকে যোগদা সৎসঙ্গের

* দয়ামাতাজী হলেন পরমহংস যোগানন্দজীর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী এবং যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া/সেলফ্ রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপের বর্তমান সঙ্ঘমাতা এবং সভানেত্রী। তিনি ১৯৩১ সালে পরমহংসজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। (১৩শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)—প্রকাশকের মন্তব্য

সদস্য হতে চাইতো। ডিক্ রাইটের কাজ ছিল তাদের নামধাম লিখে রাখা এবং প্রশ্নের জবাব দেওয়া।

একবার মাদ্রাজে মেজদা বক্তৃতা দিচ্ছেন। ডিক্ এবং আমি পিছনে দাঁড়িয়ে শুনছি। খুব মন দিয়ে সে মেজদার বক্তৃতা শুনছিল। তারপর একসময় আমাকে আস্তে আস্তে বললো, "উনি যখন বক্তৃতা করেন তখন পুরোপুরি অন্য মানুষ হয়ে যান্।" তার এ'কথা বলার কারণ হলো—মেজদা যখন বক্তৃতা করতেন তখন তাঁর ভেতর থেকে একটা প্রচণ্ড শক্তি, একটা জ্ঞানের বিচ্ছুরণ হতো। অন্য সময়ে কিন্তু তিনি শিশুর মতো সরলভাবে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, আনন্দ করতেন।

ডিক্ রাইট ছিল এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। ও'রকম পরিশ্রমী বাধ্য ছেলে কখনো দেখিনি বললেই হয়। দিনের কাজ শেষ হতে যত রাত্রিই হোক্ না কেন, কিম্বা দীর্ঘ ট্যুর করে ফিরে যত ক্লান্তই থাকুক না কেন, প্রতিদিন সে তার দিনপঞ্জী লিখে তবে বিশ্রাম করতে যেতো। বহু বিষয়ে তার বিবেক-বুদ্ধি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আর একটা জিনিষ দেখেছি—ভারতের নানা রাজ্যের নানারকম খাবার খেয়েও তার হজমের কোনদিন গোলমাল হয়নি। তাকে কখনও অসুস্থ হতেও দেখিনি।

ডিক্ রাইট ছিল খুবই সরল আর কৌতুকপ্রিয়। আমার লম্বা পাশ-বালিশ নিয়ে শোবার বরাবরই অভ্যাস ছিল। তাই দেখে সে খুব অবাক্ হতো। একদিন সে ঠাট্টা করে বলেই ফেল্লোঃ "আমি তো ভেবেছিলাম বিছানাতে বুঝি তুমি কাউকে লুকিয়ে রেখেছ। তারপর ঢাক্না খুলে দেখি —ওমা এ যে পাশবালিশ।" কিছুদিন পর সেও পাশপালিশ নিয়ে শোবার আরাম বুঝে ফেল্ল। তারপর থেকে মজার ছলে পাশবালিশ নিয়ে দু'জনার খুব কাড়াকাড়ি হতো। আমাদের দু'জনার মধ্যে খুব ভাব হয়েছিল। ও তো একদিন মুখে স্বীকারই করলো, "We like each other very much."

রাইট ছিল দেখতে খুব ফরসা, দীর্ঘাকৃতি ও দোহারা গড়নের। সে ছিল যেমন বুদ্ধিমান তেমনি চট্পটে। সত্যি বলতে কি রাইটের মত শান্ত, কর্মপরায়ণ, কষ্টসহিষ্ণু ছেলে আমি খুব কমই দেখেছি।

একবার আমি মেজদাকে নিয়ে শ্রীরামপুরে যাই। সেখান থেকে ফিরে এসে দেখি রাইট নেই। মেজদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় গেছে?'—শুনলেন একলা সারকাস দেখতে গেছে। মেজদা আমাকে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, 'যাও, সারকাস থেকে ওকে ধরে নিয়ে এসো।' সে সময় কোলকাতায় দু'তিন জায়গায় সারকাস হচ্ছিল। আমি মেজদাকে বললাম—'কোন সার্কাসে সে গিয়েছে আমি কি করে জানব?' মেজদা বললেন—'সব সার্কাসে গিয়ে খোঁজ করে তাকে ধরে নিয়ে এসো।'

মেজদার গাড়ি নিয়েই বেরোলাম। প্রথমে একটা সার্কাসে ঢুকে চারধার তন্ন তন্ন করে দেখেও তাকে দেখতে পেলাম না। পরের সার্কাসে ঢুকে একটু এধার ওধার তাকাতেই সেই পরিচিত লাল মুখটিকে দেখলাম গ্যালারীতে বসে আছে। কাছে গিয়ে বল্লাম মেজদা তাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন। তার মুখ

দেখে বুঝলাম—সার্কাস চলাকালে এভাবে শো থেকে বেরিয়ে আসতে সে খুব দুঃখবোধ করছে। যাই হোক্ কোন আপত্তি না করে সে চুপচাপ আমার সঙ্গে চলে এলো।

বাড়ী আসতেই মেজদা তাকে খুব বকলেন। বললেন, "এ যাত্রায় ভারতে এসে যে সব কাজ আমি করে যেতে চাই, তুমিই তা পণ্ড করবে। কাজের সময় তোমায় কখনোই পাওয়া যায় না।" এই বলে মেজদা রাইটকে কয়েকটা জরুরী বিষয়ে ডিক্টেশন্ দিলেন। আমি আমার ঘরে চলে গিয়েছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখি রাইট তখনও টাইপ করে চলেছে। এমনিতে মেজদার স্বভাব শিশুর মত সরল—মধুর স্নেহভরা মায়া মমতা সকলকে বিতরণ করেন সব সময়। কিন্তু শুধু এ'ভাবেই কোন শিষ্যকে সম্পূর্ণ গড়ে তোলা যায় না। তাই মাঝে মাঝে তাঁকে ভীষণ কঠোর হতে হতো। তিনি ছিলেন কঠিন অনুশাসনের পক্ষপাতী।

কলকাতায় ক্রিয়াদীক্ষাদান ও রাঁচীর সৎসঙ্গ সভা

মেজদা আমেরিকা থেকে ফেরার পর অনেক ভক্তই তাঁর কাছে 'ক্রিয়াযোগে' দীক্ষা নেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। একদিন ৪/২ রামমোহন রায় রোডের বাড়ীতে উত্তর দিকে বিষ্ণুর খোলা ব্যায়ামাগারটিকে টিনের ছাউনি দিয়ে ঢাকা হলো এবং যারা দীক্ষা নেবেন তাদের সকলকে শতরঞ্চির ওপর বসতে বলা হলো। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, "তুমি কেমনভাবে ক্রিয়া অভ্যাস কর আমাকে দেখাও।" অনেক সময় আমি বাবার সঙ্গে বসে ক্রিয়া অভ্যাস করতাম। আমার কোথাও ভুলভ্রান্তি হলে তিনি শুধরে দিতেন। মেজদা আমার ক্রিয়া অনুশীলন পদ্ধতি দেখে সন্তুষ্ট হলেন। দীক্ষাদানের দিন তিনি আমাকে একটা উঁচু টেবিলে বসিয়ে ক্রিয়া সাধনের সঠিক পদ্ধতিটি সকলকে দেখাতে বললেন এবং নিজে প্রত্যেকের কাছে গিয়ে তাদের দীক্ষা দিতে লাগলেন। আমার ক্রিয়া সাধন মেজদাকে সন্তুষ্ট করেছে জেনে আমার যে খুবই আনন্দ হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য।

রাঁচীতে একবার স্থানীয় রাজন্যবর্গের বিরাট সভা হয়। মেজদাও তখন রাঁচীতে ছিলেন। সভা অনুষ্ঠানের জায়গায় একটা বড় প্যাণ্ডেল বাঁধা হয় এবং তার চতুর্দিক বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। রাজন্যবর্গের সভানুষ্ঠানের পর মেজদা সেই একই প্যাণ্ডেলে একটি সাধারণ সভায় বক্তৃতা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাঁচী বিদ্যালয়ের জন্য কিছু চাঁদা সংগ্রহ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। জনতাকে আকর্ষণ করার জন্য বিষ্ণু ও তার ছাত্রদের ব্যায়াম প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানসূচী ঘোষণা করে হ্যাণ্ডবিল ছাপা হলো এবং টিকিট বই ছাপিয়ে তাকে বিক্রি করার জন্য অনেকের কাছে দেওয়া হলো। টিকিটের দাম ধরা হয়েছিল ১০ টাকা, ৫ টাকা ও ২ টাকা। আর যারা দাঁড়িয়ে দেখবে তাদের জন্য মাত্র চার আনা। আমেরিকা থেকে মেজদা ওঁর ছবি দেওয়া বড় বড়

পোস্টার এনেছিলেন। রাইট ও আমি আমাদের গাড়ীর সামনে ও পিছনে সেই পোস্টার লাগিয়ে রাঁচী শহর প্রদক্ষিণ করলাম এবং হ্যাণ্ডবিল বিলোলাম। সেই হ্যাণ্ডবিলে লেখা ছিল: সদ্য আমেরিকা ফেরত পরমহংস যোগানন্দ হিন্দু ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা করবেন। তৎসহ ভারত বিখ্যাত ব্যায়ামবীর বিষ্ণুচরণ ঘোষ ও তাঁর শিষ্যদের ব্যায়াম প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে।

বক্তৃতার আগের দিন বিষ্ণু তো তার দলবল নিয়ে কোলকাতা থেকে রাঁচীতে উপস্থিত হয়েছে এবং আশ্রমে খুব খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দও করছে। যেদিন আমাদের লেকচার ও প্রদর্শনী হবে সেদিন ভাগ্যচক্রে আমি ও রাইট কি মনে করে গাড়িটা নিয়ে একবার প্যাণ্ডেলটা দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি সর্বনাশ—চতুর্দিকের বেড়া প্রায় খোলা হয়ে গিয়েছে। প্যাণ্ডেল খোলা হয়েছে কেন জিজ্ঞাসা করায় জানলাম—রাজাদের সঙ্গে কনট্রাকট্ ফুরিয়ে গেছে তাই কণ্ট্রাক্টরের লোকজন জিনিষপত্র খুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সঙ্গে তাদের আলাদা কোন কনট্র্যাক্ট হয়নি। আমরা খুবই মুশকিলে পড়ে গেলাম। টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। এখন লোকে যদি বিকেলবেলা এসে দেখে খোলা মাঠ, তাহলে আমাদের ঠগ্ জোচ্চর বলে গালাগাল দেবে।

কণ্ট্রাক্টরের সংগে আমাদের যখন কথাবার্তা হচ্ছে তখন সেখানে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমাদের কাছে এসে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা তাঁকে আমাদের বিপদের কথা সব খুলে বললাম। তিনি যে রাঁতুর রাজা তা জানতাম না। তিনি নিজের পরিচয় একটা কাগজে লিখে দিয়ে বললেন—আপনারা আমার বাড়ীতে এই চিঠি নিয়ে যান এবং আমার গুদাম থেকে প্যাণ্ডেল ও বেড়া দেবার যত সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন, সব নিয়ে আসুন। আমি কয়েকটি লোকেরও ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমার খরচে তারা সব তৈরী করে দেবে। আপনাদের কিছু খরচ করতে হবে না। কারণ আমার একান্ত ইচ্ছা পরমহংসজীকে দর্শন করা ও তাঁর অমূল্য বাণী শোনা। তাঁকে আমরা উভয়েই অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জানালাম।

সভার স্থান থেকে তাঁর রাজপ্রাসাদ হলো ৬ মাইল দূরে। আমরা গাড়িতে কয়েকবার সেখানে যাতায়াত করে প্রয়োজনীয় সব মালপত্র সংগ্রহ করে ফেললাম। এখানে বলা আবশ্যক—মেজদা আমেরিকা থেকে যে ফোর্ড গাড়িটা এনেছিলেন তাতে অনেকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। পেছনের অংশটি অদ্ভুত-ভাবে খুলে গিয়ে একটা বিরাট কেরিয়ার হয়ে যেতো। তারই জন্য আমরা প্রয়োজনীয় সব মাল বহন করতে পেরেছি।

বিকেল পাঁচটার আগেই সব আয়োজন সম্পূর্ণ করতে হবে। রাইট ও আমি স্নানাহারের কথা ভুলে গিয়ে প্যাণ্ডেল তৈরী ও ঘেরার কাজে লেগে গেলাম। তখন বেলা প্রায় তিনটে বাজে। সামনেই একটা রেস্টুরেণ্ট ছিল। ভাবলাম ওখানেই কিছু খেয়ে নেব। কিন্তু হা হতোস্মি! রেস্টুরেণ্টে গিয়ে দেখি সব ফুরিয়ে গেছে। কিছুই অবশিষ্ট নেই। অগত্যা সামান্য বিস্কুট আর চা খেয়েই আবার কাজে লাগলাম। যাই হোক্ বিকেল চারটের মধ্যেই প্যাণ্ডেল

বাঁধা, বেড়া দেওয়া, চেয়ার সাজানো, টিকিটের কাউণ্টার—সব কাজ শেষ করতে পেরেছিলাম। মেয়েদের জন্যও পৃথক আসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

প্রদর্শনী শুরু হতে আর মাত্র এক ঘণ্টা বাকি। মেজদা ও বিষ্ণুদের আশ্রম থেকে নিয়ে আসতে হবে। গাড়ীতে উঠে চালাতে গিয়ে দেখি—কৌতূহলী ছেলের দল গিয়ারটি নাড়াচাড়া করে একেবারে বিকল করে রেখেছে। ভগবানের আশীর্বাদে গাড়ির যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আমার সামান্য জ্ঞান ছিল। তাই অল্প-ক্ষণের মধ্যেই বিকল যন্ত্রটিকে আবার সচল করতে পেরেছিলাম। শেষ পর্য্যন্ত কালি ঝুলি মেখে আমরা যখন আশ্রমে পেঁীছলাম তখন সাড়ে চারটে বাজে। আমাদের দেখে মেজদাতো রেগেই আগুণ। জিজ্ঞাসা করলেন : সেই সকালে বেরিয়েছ--কোথায় ছিলে এতক্ষণ ? মেজদাকে সব কথা খুলে বলতে তিনি শান্ত হলেন এবং না জেনে বকুনির জন্য দুঃখও প্রকাশ করলেন। তাছাড়া এই পরিশ্রমের জন্য তিনি আমাদের যথেষ্ট প্রশংসাও করেছিলেন।

আনন্দময়ী মা-র রাঁচী ভ্রমণ

ভারতবর্ষে আনন্দময়ী মা-র আজ অগণিত ভক্ত। তাঁর প্রকৃত নাম নির্মলা সুন্দরী ভট্টাচার্য্য। ত্রিপুরা রাজ্যের খেওড়া গ্রামের এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। এই মহীয়সী নারী নৈর্ব্যক্তিকভাবে সকলকে জগজ্জননীর প্রেম বিতরণের মধ্য দিয়ে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান। আনন্দময়ী মা'র কাছে সকল ধর্মই সমান। বহু ধর্মের মানুষ—এমনকি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীরাও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। তাছাড়া অনেক বিদেশী কূটনীতিবিদ্, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, শিক্ষক, ডাক্তার, শিল্পী প্রভৃতি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁর দিব্য প্রেমলাভ করে জীবনে ধন্য হয়েছেন।

ঈশ্বরভাবের উচ্চাবস্থায় অধিষ্ঠিতা এ হেন মহীয়সী সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে সাক্ষাত করার ইচ্ছা মেজদার মনে অনেকদিনই ছিল। তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু লেখাও তিনি ইতিমধ্যে পড়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে একদিন এক অভাবনীয় পরিবেশে ভবানীপুরে আনন্দময়ী মায়ের এক আত্মীয়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাত হয়। মেজদা রাইটকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

সেদিন তাঁদের সঙ্গে আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তবে অনেক রাত্রে সেখান থেকে ফিরে মেজদা আমাকে বললেন, "আনন্দময়ী মা রাঁচীতে গিয়ে স্কুলটি দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। আনন্দময়ী মা ইতিমধ্যেই জামসেদপুর রওনা হয়ে গিয়েছেন এবং আমরা যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারলে তিনি সেখান থেকেই রাঁচী যাবেন। তুমি তাই কালই গাড়ি নিয়ে জামসেদপুর রওনা হয়ে যাও এবং সেই গাড়িতেই তাঁকে পরদিন রাঁচী নিয়ে এসো। আমি নিজে তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করতে ট্রেনে রাঁচী যাচ্ছি। আমাদের ট্রেন রাত দু'টোয় জামসেদপুর পেঁীছবে। গাড়িটা সেখানে অল্পক্ষণ দাঁড়ায়।

নির্ধারিত দিনে তিনি রাঁচী যাচ্ছেন কিনা সেকথা আমাকে স্টেশনে জানিয়ে দেবে।

"তাছাড়া কাল ভোরবেলা রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সাধুকেও তোমার গাড়িতে তুলে নিতে হবে। তিনি তোমার সঙ্গে জামসেদপুর পর্য্যন্ত যাবেন। আমি তাঁকে বলেছি যে আমাদের গাড়ি জামসেদপুর যাচ্ছে। তিনি সেই গাড়িতে গেলে আমরা খুবই আনন্দিত হব।"

দীর্ঘপথ যেতে হবে, তাই সারারাত ধরে গাড়িটি তেলজল দিয়ে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তাছাড়া উপযুক্ত পরিমাণে পেট্রলও ভর্তি করে নিই। তারপর ভোর ৪টে নাগাদ লর্ড সিন্হা রোড থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুটিকে তুলে নেবার জন্য ভি৮ ফোর্ড গাড়ি নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ি। জামসেদপুর পেঁছিতে অনেক বেলা হয়ে গেল কারণ সাধু মহারাজের অনুরোধে পুরুলিয়ায় আমাদের কিছুক্ষণ থামতে হয়েছিল। পুরুলিয়া ও জামসেদপুরের মাঝে একটা নদী পড়ে। তখন নদীটির ওপর কোন ব্রীজ ছিল না। লোক জোগাড় করে অনেক কসরৎ করে গাড়ীটিকে ঠেলে নদী পার করতে যথেষ্ট সময় লেগেছিল। ফলে জামসেদপুর পেঁছিতে সন্ধ্যে হয়ে গেছল।

জামসেদপুর পেঁছে আমরা সবাই বড়দার মেয়ে অর্থাৎ আমাদের ভাইঝি অমিয়ার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হই। আমার ধারণা ছিল সাধু মহারাজ নিশ্চয়ই নিরামিশাষী—তাই সারা পথ আমরা নিরামিষ খাবার খেয়েছিলুম। অমিয়ার স্বামী সুধীর বোস তার বাড়ীতে আমাদের নৈশাহার করতে বলে হঠাৎ সাধুটিকে জিজ্ঞেস করে তাঁর আমিষ ভোজনে আপত্তি আছে কিনা। সাধুটি অপমানিত বোধ করতে পারেন ভেবে আমি যথেষ্ট শংকিত হয়ে পড়ি। কিন্তু সাধুটি যখন সুধীরের কথায় না বললেন তখন আমি খুবই বিস্মিত হই। আমি তখন জানতাম না যে রামকৃষ্ণ আশ্রমে আমিষ ভোজনের প্রথা আছে।

আহারের পর সুধীরকে আমাদের হঠাৎ আগমনের উদ্দেশ্য জানালাম এবং আনন্দময়ী মা কোথায় আছেন সে কথাও তার কাছে জানতে চাইলাম। সুধীর খবর নিয়ে এসে আমাদের জানালো যে তার বাড়ী থেকে মাইল চারেক দূরে মায়ের শিবির হয়েছে এবং তার চারপাশে রীতিমত মেলা বসে গেছে।

সাধুজীকে তাঁর গন্তব্যস্থানে পেঁছে দিয়ে সুধীর আর আমি আনন্দময়ী মায়ের ক্যাম্পের দিকে রওনা হলাম। সেখানে গিয়ে দেখি আনন্দময়ী মা ভাবে বিভোর হয়ে বসে আছেন—চারিধার লোকে লোকারণ্য। ভ্রমর নামে এক মহিলা—ভক্ত মায়ের নাম-কীর্তন করছে। যাই হোক্, মায়ের অনুষ্ঠানসূচীর তত্ত্বাবধায়ক যিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করে মেজদার সঙ্গে আনন্দময়ী মায়ের রাঁচী ভ্রমণের ইচ্ছাজনিত কথাবার্তা জানাই এবং আমি যে মা'কে রাঁচী নিয়ে যাব বলে কোলকাতা থেকে গাড়ী নিয়ে এসেছি, সেকথাও তাঁকে সবিস্তারে বলি। আমি তাঁকে অনুরোধ করি—আনন্দময়ী মা কখন রাঁচী যাবেন সেকথা আমাকে জানাতে,

* সাধুটির নাম বিস্মৃত হওয়ায় আমি দুঃখিত।

কারণ তাহলে আমি মেজদাকে রাত দু'টোর সময় স্টেশনে গিয়ে সঠিক খবরটি জানিয়ে আসতে পারব। মেজদা যে ঐ দিনই ট্রেনে রাঁচী যাচ্ছেন, সেকথাও আমি তাঁকে জানাই।

আনন্দময়ী মা এবং অন্যান্যের সংগে কথা বলে শেষ পর্য্যন্ত তিনি আমাকে জানালেন যে মা সকালবেলায় রাঁচী যাবেন, তবে সংগে তাঁর ১০/১২ জন ভক্তও যাবেন। কিন্তু অতো লোক একখানি গাড়ীতে যাওয়া কি করে সম্ভব? সুধীর এবং আমাকে নিয়ে মোট সাতজন যেতে পারে। সে কথা তাঁদের বুঝিয়ে বলাতে তাঁরা ট্যাক্সি ভাড়া করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কোন ট্যাক্সি চালককে রাজী করাতে পারলাম না। সমস্ত বিবরণ শুনে ভক্তরা শেষ পর্য্যন্ত যাত্রী সংখ্যা ৫ জন করতে রাজী হলেন—মা, তাঁর স্বামী*, একজন গেরুয়াধারী অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীমতী ভ্রমর এবং আর এক ভক্ত। সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করতে রাত প্রায় দু'টো বেজে গেল। খুব জোরে গাড়ি ছুটিয়ে যখন আমরা স্টেশনে পেঁছিলাম তখন দেখি রাঁচী এক্সপ্রেস স্টেশনে ঢুকছে। ঘুমন্ত মেজদাকে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আবিষ্কার করলাম। তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললাম যে মাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সকালবেলায় রাঁচী রওনা হচ্ছি।

স্টেশন থেকে সুধীর আর আমি আবার আনন্দময়ী মা'র ক্যাম্পে ফিরে এলাম, কারণ মা ঠিক কখন যাত্রা করবেন সেই সময়টি নির্দিষ্টভাবে জানার জন্য। মায়ের সঙ্গীরা আমাদের জানালেন যে ভোরবেলা মা তাঁর ডেরা ডাণ্ডা তুলে ৫/৭ মাইল দূরে এক ভক্তের বাড়ী যাবেন। তাঁরা আমাদের সেখানকার ঠিকানাও বলে দিলেন এবং জানালেন আমরা সেখানে যেন সকালবেলায় গাড়ী নিয়ে উপস্থিত হই। আমি ও সুধীর এ'সব সেরে যখন বাড়ী ফিরলাম তখন ভোর হয়ে গেছে। আরও এক রাত না ঘুমিয়ে কাটালাম। যাই হোক্ সকাল-বেলা মুখহাত ধুয়ে, কিছু জলখাবার খেয়ে আবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নির্দিষ্ট ঠিকানায় পেঁছে দেখি সেখানেও লোকে লোকারণ্য। অত গোলমালের মধ্যেও মা কিন্তু আত্মভোলা বিভোর ভাব নিয়ে বসে আছেন। শ্রীমতী ভ্রমর 'মা মা' বলে ভগবতীর নাম-গান করছেন। এরপর সৎসঙ্গ করে শেষ পর্য্যন্ত রাঁচী যাবার জন্য আমরা যখন গাড়ীতে উঠলাম তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে।

আমরা প্রথমে চাঁইবাসা এবং পরে চক্রধরপুর পার হয়ে ক্রমশঃ পাহাড়ী এলাকার দিকে এগিয়ে চললাম। বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে গাড়ী এগিয়ে চললো। এমনি পথে গাড়ী চালানো খুবই বিপদজনক। পাহাড়ী এলাকায় গাড়ী চালানোর অভ্যাস ছিল বলে খুব অসুবিধা হচ্ছিল না। সাবধানে বিপদ্জনক এলাকাগুলি পার হয়ে গেলাম। সামনে আমি আর সুধীর এবং পিছনে ওঁরা পাঁচজন—সবাই চুপচাপ। কেবল ভ্রমর দিদিই তাঁর সুধাভরা

* দীর্ঘকাল আগে, বিবাহের কিছুদিন পরেই তিনি আনন্দময়ী মা'র ব্রহ্মচারী ভক্তশিষ্য-রূপে সুপরিচিত হন্।

গলায় 'মা মা' গান করে চলেছেন। তাঁর সেই গান আমাদের যাত্রাপথের এক-ঘেয়েমিভাব কাটাতে খুবই সাহায্য করেছিল। শেষ পর্য্যন্ত যখন সোজা মসৃন রাস্তা পেলাম তখন ৭৫/৮০ মাইল বেগে গাড়ী ছোটালাম। তা সত্বেও রাঁচী পেঁাছতে আমাদের বিকেল ৩টে বেজে গেল।

আনন্দময়ী মাকে অভ্যর্থনা করার জন্য মেজদা শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। কোনরকমে অতিথিদের নামিয়ে গাড়ীটি একধারে রেখে সামনের আসনেই ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ি। আমার একটা হাত তখনও স্টিয়ারিং-এ রাখা ছিল।

আনন্দময়ী মা আশ্রম ভ্রমণ করে খুবই আনন্দলাভ করেছিলেন। স্কুলের ছেলেরা এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর সঙ্গ ছাড়তে চায়নি। জগন্মাতার স্নেহধন্যা তিনি, তাই আশ্রম বিদ্যালয়ের শান্ত পরিবেশ এবং আধ্যাত্মিক ভাব তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি সর্বদা ভাবে বিভোর হয়ে থাকেন। একমাত্র মেজদা ছাড়া আর কারোর সঙ্গে তিনি বিশেষ কোন কথাও বলেননি। মধ্যাহ্ন ভোজের উত্তম আয়োজন করা হয়েছিল। বাইরে গাছতলায় বসে সকলে আহার করলেন। বোধ-হয় ঘণ্টা তিনেক বাদেই মেজদা গাড়ীর কাছে এসে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললেন, "গোরা ওঠ্। ওরা জেদ ধরেছে আজই জামসেদপুরে পেঁাছে দিতে হবে। আমি ভেবেছিলাম আনন্দময়ী মা রাত্রিটা এখানেই কাটাবেন। কিন্তু ওঁর সঙ্গীরা এখনই ফিরে যেতে চায়। মায়ের নিজস্ব মতামত কিছুই নেই। সঙ্গীরা যেমন চালাচ্ছেন সেইরকম চলছেন।"

আমি তাঁকে বললাম, "কিন্তু মেজদা আমি যে দু'রাত্রি মোটেই ঘুমোইনি। তার ওপর দু'দিন সারাক্ষণ গাড়ি চালাচ্ছি। এখন আবার গাড়ি চালালে হয়তো অ্যাক্সিডেণ্ট করে ফেলবো।"

মেজদা তখন বললেন, "লক্ষ্মীভাই আমার তুমি ওদের পেঁাছে দাও। আমার কোন অনুরোধ ওরা শুনছে না। অতএব নিয়ে যেতেই হবে। আমি প্রার্থনা করছি এবং যখন আনন্দময়ী মা সঙ্গে থাকছেন, তখন নিশ্চয়ই তোমার কোন বিপদ হবে না। তুমি আমার মর্যাদা রাখ।"

বিনা পেট্রলে গাড়ী চলা

অগত্যা কোন মতে উঠে মুখ হাত ধুয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নিই এবং তারপর ওদেরকে গাড়ীতে তুলে রওনা হই। আমার মাথায় তখন একমাত্র চিন্তা —সন্ধ্যের আগেই পাহাড়ী পথটা কি করে পার হওয়া যায়। একে পথ দুর্গম তার ওপর বাঘ ভালুকেরও ভয় আছে। সোজা রাস্তায় খুব জোরে গাড়ি ছুটিয়েও দুর্ভাগ্যবশতঃ যখন পাহাড়ী এলাকায় পেঁাছলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ মনে পড়লো পেট্রল নেওয়া হয়নি। বেরোবার সময় পেট্রল ভরে নেবো বলে ঠিক ছিল, কিন্তু তাড়াহুড়ায় সব ভুল হয়ে গেছে। ড্যাস্‌বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখি—'পেট্রল মিটার' পেট্রল নেই

বলে 'শো' করছে। এ অবস্থায় একমাত্র ঈশ্বরের নাম স্মরণ করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিল না।

পাহাড়ী পথে গাড়ির ঝাঁকুনিতে শ্রীমতী ভ্রমরের প্রায়ই বমি ভাব আসছিল। তাই মাঝে মাঝেই আমাদের বাধ্য হয়ে গাড়ি থামাতে হচ্ছিল। সে সময় আমি ও সুধীর দুখানা বড় বড় রড্ নিয়ে দু পাশে দাঁড়িয়ে থাক্‌তাম, কারণ যে কোন সময় বাঘ বা অন্য কোন বন্য জানোয়ার এসে পড়তে পারে। মনে আমার সারাক্ষণের চিন্তা—বিনা পেট্রলে গাড়ি আর কতক্ষণ চলবে! মনে মনে ভগবানের কাছে আকুল প্রার্থনা জানাতে থাকি। পাহাড়ের ঢালু পথে গাড়ি নিয়ে নামবার সময় গীয়ার নিউট্রালে রেখে ইঞ্জিন বন্ধ করে চালাতে নেই, কারণ তাতে স্পীড বেড়ে যায় আর গাড়িও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কিন্তু আমার পক্ষে ঐ অন্যায় কাজটি করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ঢালু পথে নামবার সময় আমি বাধ্য হয়ে সুইচ্ বন্ধ করে ইঞ্জিন অফ্ করে হাই স্পীডে নামতে লাগলাম। কেবল পাশে বসা সুধীরকে বললাম কষে হ্যাণ্ড ব্রেক্ ধরে রাখতে—আমার পায়ের ব্রেক্ কাজ না করলে সে যেন আমাকে সাহায্য করতে পারে। এইভাবে সমস্ত পাহাড়টা পার হয়ে আমরা চক্রধরপুরে পেঁছালাম। তারপর পেট্রল নেবার জন্য একটা পাম্পে যাই। সেখানে গিয়ে পেট্রল মাপা কাঠিটি পেট্রল ট্যাংকে ঢুকিয়ে দেখি ট্যাংক খালি—একদম ড্রাই। অবাক্ হয়ে ভাবি—বিনা পেট্রলে কি করে গাড়ি এতটা পথ এলো। আনন্দময়ী মা এবং মেজদার মহিমা ছাড়া এ'রকম ঘটনা কখনোই সম্ভবপর হতে পারে না।

যাই হোক গাড়িতে পেট্রল ভরে নিয়ে আবার আমাদের যাত্রা শুরু হলো। কিছুদূর যাবার পর মনে হলো গাড়িটার ওপর যেন কণ্ট্রোল থাকছে না—পেছনটা কেবলই বেঁকে একপাশ হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি খুব আস্তে আস্তে চালিয়েও দেখলাম সেই একই ব্যাপার হচ্ছে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম কেননা রাস্তার দু'পাশে গভীর খাদ। বাধ্য হয়ে কি ব্যাপার জানবার জন্য গাড়ী থামিয়ে অন্ধকার রাস্তায় নামলাম। গাড়ি থেকে নামতেই গোড়ালী পর্য্যন্ত পা'টা কাদায় বসে গেল। হেড লাইট জ্বালিয়ে দেখি—অন্ধকারে দুটি ছেলে একটি বাইসাইকেল নিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে আছে—এক পাও এগোতে পারছে না। সাইকেলের মাডগার্ডের মধ্যে বিরাট কাদা জমে তাকে অচল করে দিয়েছে। এমনকি তাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমাদের অনুরোধ করলো গাড়িতে তাদের একটু লিফট্ দিতে। কিন্তু গাড়ির ভেতরের অবস্থা দেখিয়ে তাদের নিবৃত্ত করলাম।

রাস্তার অবস্থা আমাকে কিন্তু বিশেষ ভাবিয়ে তুললো। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই এই রাস্তা দিয়ে গিয়েছি—তখন দেখেছি বেশ শুক্‌নো, কাদার লেশমাত্রও নেই। একটু চিন্তা করতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এ'-অঞ্চলে রাস্তা মেরামত করার কাজে 'মোরাম' ব্যবহার করা হয়। দেখতে ঢেলার মতো—গাড়ি চলাচলের ফলে সেগুলি মিহি গুঁড়ো হয়ে যায়। আজও দিনের বেলায় তা রাস্তায় ছড়ানো হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে এক পশলা হালকা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় মোরামগুলি ভিজে নরম হয়ে কাদার মতো হয়ে গেছে।

জুতো থেকে কাদা পরিষ্কার করে গাড়িতে উঠে খুব সাবধানে সেই জায়গাটি পার হয়ে যাই। এরপর জামসেদপুর পর্য্যন্ত বাকি রাস্তাটায় আর কোন অঘটন ঘটেনি। আনন্দময়ী মা'র ক্যাম্পে যখন পেঁছাই তখন রাত শেষ হতে আর বেশি বাকী নেই।

আনন্দময়ী মা এবং তাঁর ভক্তদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুধীর আর আমি প্রায় ভোরে বাড়ি পেঁছালাম। চা ও জলখাবার খেয়েই আবার কোলকাতায় রওনা হতে হলো। সুধীরও আমার সঙ্গে ছিল। একথা আমার পক্ষে অবশ্যস্বীকার্য যে সুধীরের সহায়তা না পেলে এতদিন ধরে এত দীর্ঘপথ গাড়ি চালানো আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না। হাতে আমার গ্লাভস থাকা সত্ত্বেও পাহাড়ী পথে সমানে তিন দিন গাড়ী চালাবার ফলে হাতে বড় বড় ফোসকা পড়ে গিয়েছিল। এই তিনদিন চোখের পাতা এক করতে পারিনি বললেই হয়। মনে আছে বাড়ী ফিরে আমার আর দাঁড়াবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা ছিল না। সোজা বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম। সব চেয়ে বড় কথা—কথা বলার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত আমার ছিল না।

মনে পড়ে মেজদা যখন কোলকাতায় ফিরে সব বৃত্তান্ত শুনলেন তখন আমায় কি ভীষণ আদরটাই না করেছিলেন। সেকথা আজও ভুলিনি। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেনঃ "জীবনে তোর কোনদিন কোন বিপদ হবে না।"

এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় যোগদান

মেজদা যখন আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন সেই সময় এলাহাবাদে কুম্ভমেলা হয়েছিল। 'পূর্ণ কুম্ভমেলা' প্রতি বারো বছর অন্তর হরিদ্বার, এলাহাবাদ, নাসিক ও উজ্জয়িনীতে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া প্রতি ছ'বছর অন্তর এই চারটি স্থানে 'অর্ধ-কুম্ভমেলা'ও হয়ে থাকে। ১৯৩৬ সালে প্রয়াগে অর্ধকুম্ভ মেলা হয়েছিল। জানুয়ারী মাসে রাইট, বিষ্ণু, প্রভাসদা এবং আমি মেজদার সঙ্গে এই অতুলনীয় ও অপরূপ ধর্মমেলা দর্শন করতে গিয়েছিলাম। আমরা প্রভাসদার বড় ভাই ঁপ্রসাদ দাস ঘোষের বাড়ীতে উঠি। বছরের এই সময়টায় এখানে প্রচণ্ড শীত। আমরা তাই নানারকমের গরমের পোষাকে সজ্জিত হয়ে ভোরবেলা যেখানে কুম্ভমেলা হচ্ছে সেখানে হাজির হতাম। অত ভারী পোষাকেও কিন্তু শীত মানতো না—সারা অঙ্গে কাঁপুনি ধরিয়ে দিতো।

কুম্ভমেলার মতো অদ্ভুত ও আশ্চর্য্যজনক দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এই অত্যদ্ভুত দৃশ্য যাঁরা না দেখেছেন তাঁদের বোঝাই কেমন করে! গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলের কাছে বিশাল জায়গা জুড়ে সাধুদের আখড়া বসেছে। সাধুরা পাহাড়ের গুহা এবং জঙ্গলের আশ্রয় ত্যাগ করে মেলায় সমবেত হয়েছেন। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী পুণ্যকামনায় এবং এই সব সাধুদর্শন মানসে সেখানে দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন। এদের সকলের খাদ্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের যোগান দিতে মেলার চতুর্দিকে অসংখ্য স্টল করা হয়েছে।

তিথি অনুযায়ী কুম্ভমেলায় স্নানের দিন ধার্য্য হয়। পুণ্য তিথিতে মেলার সমবেত সাধু ও পুণ্যার্থীরা সঙ্গমে স্নান করেন। তাঁরা প্রার্থনা করেন—জীবনের সকল পাপ ধুয়ে মুছে দিয়ে আবার যেন তাঁরা ঈশ্বরের চরণে নিজেদের উৎসর্গ করতে পারেন।

এই সব সাধুদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন নাগা সন্ন্যাসীর দল। মাথায় তাঁদের দীর্ঘ জটা এবং আক্ষরিক অর্থেই তাঁরা সম্পূর্ণ নিরাবরণ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অথবা উত্তাপ থেকে শরীরকে বাঁচাবার জন্য তাঁরা সর্বাঙ্গে ভস্ম মেখে থাকেন। পুণ্যস্নানের শুভ দিনে এই নাগা সন্ন্যাসীর দলই সর্বপ্রথম সঙ্গমে অবগাহন করার অধিকারী। আমরা যখন সেখানে উপস্থিত হই তখন দেখি নাগা সন্ন্যাসীর দল শোভাযাত্রা করে স্নান করতে চলেছেন। রাস্তার দুধারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অসংখ্য সাধু দাঁড়িয়ে আছেন—অনেকে আবার ধুনী জ্বালিয়ে বসেও আছেন। তাকিয়ে দেখি, নাগা সন্ন্যাসীদের যিনি প্রধান তিনি হাতীর পিঠে চলেছেন। পেছনে অনেকে হাতি আর ঘোড়ার পিঠে তাঁকে অনুসরণ করছেন। অনেকে আবার তলোয়ারও ঘোরাচ্ছেন—সবার শেষে কয়েক শো নাগা সাধু পায়ে হেঁটে চলেছেন।

রাইট আর আমি একধারে দাঁড়িয়ে এই অপরূপ শোভাযাত্রা দেখছিলাম। সে অবশ্য শোভাযাত্রার ফটো তুলতেই বেশি ব্যস্ত। তাই দেখে হঠাৎ একজন ষণ্ডা দেখতে নাগা চোখ পাকিয়ে বলে উঠলো 'ক্যামেরা তোড় দেগা'। রাইট আমাকে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলো—লোকটা কি বলে গেল?

আমি নাগার কথাটি পুনরাবৃত্তি করে বললাম—"অনেক ফটো তো তুলেছ। আর তোলবার চেষ্টা কোরো না। ক্যামেরা লুকিয়ে ফেল।" বিদেশীরা অনেক সময় হিন্দু সাধুদের ছবি তুলে বিকৃতভাবে নিজেদের দেশে তাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করে। তাই প্রচার বিমুখ সাধুরা নিজেদের ছবি তুলতে দিতে আপত্তি করে থাকেন।

মেজদা তাঁর যা কিছু টাকাকড়ি সব ইদানীং আমার কাছেই রাখতেন। আমিই যখন যা কিছু প্রয়োজন কেনাকাটা করতুম। তিনি বলতেন "গোরা বুঝেসুঝে খরচ করে কিন্তু বিষ্ণুটা বড়ই খরচেদার।" আমার কাজে খুশী হয়ে মেজদা বলতেন—আমি হলাম তাঁর সেক্রেটারী। সে'কথা তিনি তাঁর চিঠিতেও লিখেছেন। ভিড়ের মধ্যে আমরা ঘুরছি হঠাৎ মেজদা আমার হাতে দলা পাকানো কতকগুলো টাকা দিয়ে বললেন: "গোরা, এ'গুলো রেখে দাও। ভিড়ের মধ্যে কে আমার হাতে গুঁজে দিল বুঝতে পারলাম না।" খুলে দেখি একশো টাকার পাঁচখানি নোট। মেজদা বললেন, "ভগবানই আমাদের রাস্তার খরচ পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

প্রভাসদার শাশুড়ী মস্ত জমিদার গৃহিণী। তাঁর তিন কন্যা—কোনো পুত্র সন্তান নেই। সব মেয়েরই বেশ ভালো ঘরে বিবাহ হয়েছিল। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছিল এক ধনী ও প্রতিষ্ঠিত উকিলের সঙ্গে, মেজ মেয়ের প্রভাসদার এবং ছোট মেয়ের প্রভাসদার ছোট ভাই ডাক্তার প্রকাশ ঘোষের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। প্রভাসদার শ্বশুর মশায়ের অকাল মৃত্যুর পর তাঁদের বড় মেয়েটি এক ছেলে ও চার

মেয়ে রেখে হঠাৎ মারা যান। প্রভাসদার শাশুড়ী গভীর শোকে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে নিজে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনে অনাড়ম্বরভাবে বসবাস করতে থাকেন। মন্দিরে পূজা অর্চনা এবং ভগবানের নামগান করেই তিনি দিন কাটাতেন। মাঝে মাঝে মেয়ে-জামাইরা বৃন্দাবনে গিয়ে তাঁর সংগে দেখা করে আসতেন। আমিও একবার বৃন্দাবনে বেড়াতে গিয়ে তাঁর সংগে দেখা করতে যাই। যিনি স্বামীর জীবদ্দশায় প্রচুর ভোগসুখে দিন কাটিয়েছেন, তিনিই আজ কত সহজ সরল নিরাড়ম্বর জীবন কাটাচ্ছেন—তাই দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর জামাইরা সবাই কৃতী পুরুষ—যে কেউ তাঁকে প্রচুর সুখস্বাচ্ছন্দে রাখতে পারে। তাছাড়া তাঁর নিজেরও যথেষ্ট অর্থ ছিল। তা সত্বেও সব ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনীর মতো জীবনযাপন করতেন।

আমরা শুনেছিলাম উনিও কুম্ভমেলায় যাবেন। অনেক খুঁজে খুঁজে শেষে এক জায়গায় তাঁর সন্ধান পাই। একটা সামান্য আটচালার ঘরে তিনি বসে আছেন—পরণে ভোরবেলার গঙ্গা স্নানের ভিজে কাপড়। প্রচণ্ড শীত আর বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া—তবুও তিনি শুকনো কাপড়ে গা মুছবার তাগিদ অনুভব করেন নি। এটা এক রকমের কঠোর ব্রত। ব্রতের ক'দিন স্নান করে গা মুছতে নেই এবং দিনে মাত্র একবার যৎসামান্য আহার করতে হয়। স্বপাকে হবিষ্যান্ন খাওয়াই নিয়ম। আমরা অত গরম পোষাকে যেখানে কাঁপছি, সেখানে তিনি কি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনই না পালন করছেন—না দেখলে বিশ্বাস করাই কঠিন। আমরা সাধারণতঃ 'প্রসাদ'দার বাড়ীতেই দুপুরের খাওয়াটা সারতাম—তারপর সারাদিন মেলাতলায় ঘুরে বেড়াতাম।

সেই বিশাল মেলায় নানা সম্প্রদায়ের অসংখ্য সাধু এসে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ হয়তো নগ্ন দেহে কণ্টক শয্যায় শুয়ে আছেন, কেউ বা কৃচ্ছ্রসাধনার জন্য নানারকম যোগ মুদ্রা অবলম্বন করে বসে আছেন—তাঁদের সেই বিচিত্র দেহ ভঙ্গিমা দেখে কিন্তু মনে হতো না তাঁরা কোনরকম শারীরিক ক্লেশ অনুভব করছেন। আবার কাউকে দেখা যেতো ধুনীর সামনে বসে ভগবদ্ আলোচনায় নিমগ্ন। মেজদা কিন্তু এইসব সাধুদের মধ্যে থেকে সত্যকার সাধু খুঁজে বেড়াতেন। একবার হঠাৎ একজন ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এসে আমাদের বললেন—উন্নত সাধু দেখতে চান তো আমার সঙ্গে আসুন।

পণ্টুন ব্রীজের ওপর দিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে আমরা ভীড় কাটাতে কাটাতে তাকে অনুসরণ করে চলেছি। মেলা ক্ষেত্রের কলরব এখন অনেক পেছনে। হঠাৎ সামনে কয়েকটা খড়ের আটচালা আর ঝোপড়ি দেখতে পেলাম। তখন বেশ রাত হয়েছে। চারদিক অন্ধকার। এক সময় সে একটা ছোট তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর বললো—ভেতরে ঢুকে যান। ঢোকবার পথটি এত ছোট যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। লোকটির কাছ থেকে লণ্ঠন নিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকে দেখি—মেঝেতে খড় বিছানো এবং তার ওপর কৌপীনধারী এক সাধু পদ্মাসনে বসে আছেন। তাঁর দু'চোখে মনে হলো যেন দিব্য জ্যোতি পরিস্ফুট। বেশ মনে আছে মেজদা আমাকে কানে কানে বলেছিলেন—"ভাল করে চেয়ে দেখ এই জ্যোতির্ময় মূর্তি। ইনি একজন খাঁটি সাধু পুরুষ।"

আলাপ পরিচয় হতে জানলাম তাঁর নাম করপাত্রী মহারাজ। খুব সহজ সরল জীবনযাপন করেন—টাকা পয়সা নেন্ না এবং আগুনও স্পর্শ করেন না অর্থাৎ রন্ধন কার্য্য করেন না। পথ চলতে চলতে ভক্তরা যে ফল মিষ্টি দেন তাই খেয়েই তাঁর দিন কেটে যায়। পুণ্যতোয়া নদীর তীরগুলি ধরে তিনি এখান ওখান ভ্রমণ করে বেড়ান। আমাদের গাইড আগেই বলেছিল যে উনি একজন মস্তবড় পণ্ডিত—ভক্তদের গীতা ও ভাগবৎ পাঠ করে শোনান, অর্থও বুঝিয়ে দেন। মেজদা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনার এখানে তো কোন বইপত্র দেখছিনে? কিভাবে আপনি লোকশিক্ষা দেন?"

করপাত্রীজী বললেন, "আমার ওসবের প্রয়োজন হয় না। যারা ধর্ম সম্বন্ধে শুনতে বা জানতে ইচ্ছুক তাদের আমি স্মৃতি থেকেই সকল প্রশ্নের জবাব দেই।" তাঁর এই আত্মানুভূতি লাভ আমাদের অসীম আনন্দ দিয়েছিল। আজও আমি সেই জ্যোতির্ময় মুখখানি মানসনেত্রে দেখতে পাই।

এরপর সেই গাইডটি আমাদের গঙ্গার ওপারে আর এক সাধুর কাছে নিয়ে গেল। শুনলাম—উনি নাকি বহু লোকের দুরূহ রোগ সারিয়ে দেন। দেখলাম তিনি একটি উঁচু প্রশস্ত জায়গায় ধুনী জ্বালিয়ে বহু ভক্ত পরিবৃত হয়ে বসে আছেন। আমরাও তাঁর পদতলে গিয়ে বসলাম। মেজদা অতি বিনীতভাবে বললেন, "শুনছি আপনি নাকি বহু লোকের রোগ সারিয়ে দেন?" সাধুটি হিন্দীতে বললেন, "তাতে কি হয়েছে? আপনিও তো সেই শক্তিতেই অনেককে রোগমুক্ত করেছেন।" মেজদা একেবারে চুপ। প্রণাম করে আমায় সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় মেজদা বললেন, "একজন শক্তিধর সাধু দেখলাম।"

একদিন বিকেলে প্রসাদদার বাড়ীতে বসে আছি। তাঁর মেজ মেয়ে ছায়া হয় পাঁচিলে উঠে খেলা করছিল কিংবা গাছ থেকে ফলটল পাড়তে পাঁচিলে উঠতে গিয়েছিল। হঠাৎ সে পা ফস্‌কে পড়ে যায়। ছায়ার বয়স তখন আট কি দশ বছর। চীৎকার শুনে সেখানে গিয়ে দেখি সকলে তাকে ধরাধরি করে নিয়ে আসছে। মেয়েটির একেবারে অচৈতন্য অবস্থা। সকলে বললো ওর শিরদাঁড়ায় লেগেছে, বোধহয় শিরদাঁড়া ভেঙ্গেও গেছে। বাস্তবিক ঠিক্ কোমরের কাছ বরাবর শিরদাঁড়াটা বেশ ফুলে উঠেছে। বৌদি অর্থাৎ ছায়ার মা খুব কাঁদছেন। সকলে ভাবছেন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে কি না।

মেজদা সকলকে সরিয়ে দিয়ে মেয়েটির কাছে গিয়ে বসলেন এবং তাকে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে পিঠে ঠাণ্ডা জল ছিটোতে ছিটোতে কি যেন সব বলতে লাগলেন। সকলে চারদিকে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এইভাবে প্রায় মিনিট ১৫/২০ জল ছিটানো চললো। তারপর আঘাতের স্থানে হাত রেখে মেজদা প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চোখ বুঁজে জপ করতে লাগলেন। তারপর মেয়েটিকে হঠাৎ হাত ধরে টেনে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে বললেন, "যা, তোর কিছু হয়নি। ভাল হয়ে গেছিস্।"

ছায়া দাঁড়িয়ে উঠে হঠাৎ এত লোক দেখে অবাক্ হয়ে লজ্জিতভাবে ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর আঁচলে মুখ লুকালো। এরপর মেজদা

নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগ করে মেলায় যাবার জন্য নিজের গাড়ীতে গিয়ে বসলেন। সেদিন মেজদার সেই ভগবৎ শক্তির মহিমা প্রকাশ দেখে আমরা অবাক ও মুগ্ধ হয়েছিলাম।

কলকাতায় প্রত্যাবর্তন

পরদিন ভোর চারটের সময় এলাহাবাদ ত্যাগ করে আমরা কোলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমরা ঠিক করেছিলাম আগ্রা, বৃন্দাবন, দিল্লী, মীরাট (বড়দার একদা কর্মস্থল), বেরিলী, গোরক্ষপুর (আমাদের শৈশবকাল এখানেই কেটেছিল) এবং বেনারস হয়ে বাড়ী ফিরব।

তখন আমিই গাড়ি চালাচ্ছিলাম। সবে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে, এমন সময় সেই জনশূন্য রাস্তায় হঠাৎ সামনে থেকে একটা গাড়ি এসে আমাদের পথ আটকে দাঁড়াল। তার চালক আমাদের হাত নেড়ে গাড়ি থামাতে বললো। সেই গাড়ি থেকে নেমে ৫/৬ জন জোয়ান—মাথায় পাগড়ী পরা এবং পাগড়ীর কাপড়েই মুখ ঢাকা—আমাদের গাড়িটিকে চারদিক ঘিরে দাঁড়াল। গাড়ির সামনের সিটে ছিলাম আমি, বিষ্ণু আর রাইট এবং পিছনের সিটে ছিলেন মেজদা, বড়দার মেয়ে অমিয়া এবং বিষ্ণুর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে। লোক-গুলি আমাদের কিছুক্ষণ ভাল করে দেখে আবার নিজেদের গাড়ীতে উঠে চলে গেল।

আমরা সবাই একসঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ইতিমধ্যে সবাই কথা বলতে শুরু করেছে। একটা বিষয়ে সকলেই একমত হলুম যে তারা ডাকাত দল—আমাদের যা কিছু আছে সব কেড়ে নেবার তালে ছিল। ইচ্ছে করলে তারা আমাদের অনেক ক্ষতিও করতে পারতো। তবে গাড়িতে একজন সাধু এবং একজন সাহেবকে দেখে তারা বুঝতে পেরেছিল এখানে বিশেষ সুবিধে হবে না—তাই তারা প্রস্থান করেছিল।

বৃন্দাবনে আমরা স্বামী কেশবানন্দের বিশাল আশ্রমে অবস্থান করি। স্বামীজী ছিলেন লাহিড়ী মহাশয়ের এক অতি উন্নত শিষ্য। তিনি দীর্ঘকায়, সবল এবং তাঁর মাথায় ছিল লম্বা জটা। চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ সুপরিস্ফুট। আমি, মেজদা ও রাইট সহ সেই পরমশ্রদ্ধেয় ঋষিপুরুষের একখানি ফটো তুলে-ছিলাম। ছবিটি 'অটোবাইওগ্রাফি অফ্ এ যোগিতে' প্রকাশিত হয়েছে।

মেজদার ইচ্ছে হয়েছিল বৃন্দাবনের কয়েকটা মন্দির রাইটকে দেখাবেন। কিন্তু বৃন্দাবনের সুপ্রাচীন মন্দিরগুলিতে বিদেশীদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। মেজদা আমাদের বললেন রাইটকে ধুতি পরিয়ে দিতে। কিন্তু রাইট এত লম্বা যে ধুতি পা ছাড়িয়ে হাঁটু পর্য্যন্ত উঠে গেল। মেজদা রাইটকে মালাও পরাতে বলেছিলেন। নিজেরা হাসি চেপে এইরকম কিম্ভূত পোষাকে তাকে তো মন্দিরে ঢোকানো হলো। কিন্তু মন্দিরের পুরোহিতরা আপত্তি জানালে মেজদা বললেন রাইট হিন্দু হয়ে গেছে। মন্দিরের ভেতর থেকে বেরিয়ে দেখি বাইরে

অনেক বিদেশী ঘোরাঘুরি করছেন। তারা রাইটের এই অদ্ভুত পোষাকের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। প্রচণ্ড অস্বস্তিতে বেচারার মুখ লাল হয়ে ওঠে। শেষে আর না পেরে মুখ ঢেকে তাড়াতাড়ি গাড়ির মধ্যে গিয়ে লজ্জা বাঁচায়।

এরপর আমরা আগ্রা, দিল্লী হয়ে মীরাটে যে বাড়ীতে বড়দা থাকতেন সেটি দেখে বেরিলীতে যাই। সেখানে মেজদার বাল্যকালের বন্ধু দ্বারকাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হয়। বেরিলী থেকে আমরা গোরক্ষপুর হয়ে বেনারস যাই।

বেরিলী থেকে বেনারস পর্য্যন্ত এই পথটা সারারাত আমাকে একলাই গাড়ি চালাতে হয়েছিল। সেকি প্রচণ্ড বৃষ্টি! কাদা জলের মধ্যে হাতের স্পষ্ট লাইটের সাহায্যে পথ নির্দেশের রোর্ড পড়ে পড়ে কোনরকমে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। এদিকে বাকীরা সব গাড়ির মধ্যে গভীর ঘুমে নিমগ্ন। যাই হোক্ ভোরের দিকে বেনারস ঢুকে দেখি রাস্তায় কোন লোক নেই! আমাদের গন্তব্য ছিল বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়—কিন্তু কোন্ পথে সেখানে যাব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। অনেক খুঁজে শেষ পর্য্যন্ত বিষ্ণুর ছাত্র—ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল এডুকেশনের ডাইরেক্টর—মণি রায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হই। পরের দিন মণি রায়, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে সাক্ষাত করাবার জন্য আমাদেরকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যান। সেখানেই বিখ্যাত রামমূর্ত্তি—যিনি বুকে হাতি নিয়ে সবাইকে চমকিত করে-ছিলেন—তাঁর দেখা পাই। একটি পা কাটা, হাতে ক্রাচের ভর দিয়ে রামমূর্ত্তি—আমাদের সামনের সোফায় এসে বসলেন। শুনলাম খেলা দেখাতে গিয়ে একটা দু'টন রোলার বুকের ওপর দিয়ে নিয়ে যাবার সময় দুর্ভাগ্যক্রমে সেটি পায়ে গাড়িয়ে পড়ে পা'টিকে জখম করে দেয়। ফলে পা শেষ পর্য্যন্ত বাদ দিতে হয়। অতবড় বিখ্যাত বীরবরের ঐ অবস্থা দেখে মনে আমরা বড়ই ব্যথা পেয়েছিলাম। মালব্যজী দয়া করে তাঁকে নিজের বাড়ীতে স্থান দিয়েছেন।

এছাড়া বেনারসে আমরা দুই পীঠস্থান বাবা বিশ্বনাথের মন্দির এবং লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ী দর্শন করে কলকাতায় ফিরে আসি।

স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজীর মহাপ্রয়াণ

কুম্ভমেলা থেকে কোলকাতায় ফিরেই মেজদা ঠিক করলেন শ্রীরামপুরে শ্রীযুক্তেশ্বরজীর কাছে যাবেন। কিন্তু খবর পেলেন যে যুক্তেশ্বরজী পুরী চলে গিয়েছেন। ৮ই মার্চ মেজদা এবং আমি রামমোহন রায় রোডের বাড়ীতে বসে কথাবার্তা বলছি, এমন সময় মেজদা সংবাদ পেলেন যে শ্রীযুক্তেশ্বরজীর এক কোলকাতার শিষ্য অতুল চৌধুরী, পুরী থেকে একখানি টেলিগ্রাম পেয়েছেন। তাতে লেখা আছে, "Come to Puri at once." টেলিগ্রামের বিষয়বস্তু মেজদাকে খুব উৎকণ্ঠিত করলেও, সেইদিন সন্ধ্যায় পুরী যাত্রা না করে তিনি বললেন বাবার কাছ থেকে দু'খানা রেলের পাশ নিয়ে পরদিন রাত্রে পুরী যাত্রা

করবেন। আমি তখন জানতাম না কেন তিনি এমন ভুল করলেন।* পুরী রওনা হবার আগে অতুল চৌধুরীর সই করা আর একখানা টেলিগ্রাম মেজদা পেলেন যাতে লেখা ছিল, "Come quickly. Giriji Maharaj never so ill."

৯ই মার্চ রাতের ট্রেনে মেজদা, রাইট এবং আমি পুরী রওনা হলাম। পরদিন ভোরবেলা ট্রেন পুরী স্টেশনে পেঁছুতেই মেজদা উদ্বিগ্নভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন "বেঁচে আছেন কিনা বল্‌তো গোরা?"

আমি বললাম, "নিশ্চয়ই। গিয়ে তাঁকে ঠিক জীবিত দেখতে পাবো।"

মেজদা একটু চুপ করে থেকে বল্লেন, "গত রাত্রে শুয়ে আছি, হঠাৎ দেখি দু'টো হেড লাইটের মতো আলো আমার সামনে ঘুরছে। তখনই আমি বুঝেছি গুরুদেব আর নেই।"† এই বলে মেজদা অঝোরে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন "কাল না এসে আমি কি ভুলই করেছি!"

আশ্রমে ঢুকেই জানতে পারলাম আমাদের আশংকাই সত্যি—যুক্তেশ্বরজী আর নেই। সেই দুঃসংবাদ শুনে আমরা কাঁদতে লাগলাম। শ্রীযুক্তেশ্বরজীর ঘরে ঢুকে দেখি—তিনি দেয়ালে ঠেসান দিয়ে পদ্মাসনে মহাসমাধিস্থ হয়ে বসে আছেন। মেজদার কান্না আর কিছুতেই থামে না।

* পরমহংস যোগানন্দজী তাঁর 'Autobiography of a Yogi' বা 'যোগিকথামৃত' গ্রন্থে লিখেছেনঃ

"৮ই মার্চ ট্রেন ধরবার জন্য বাড়ী থেকে বেরোতেই অন্তরের মধ্যে এক দৈববাণী শুনতে পেলাম—পুরীতে আজ রাত্রে যেও না। তোমার প্রার্থনা সফল হবার নয়।"

দুঃখে যন্ত্রণায় অভিভূত হয়ে বললুম, "প্রভু, পুরীতে গেলে যে তোমার আমার মধ্যে জীবনমৃত্যুর টানাটানি চলবে, সে তো তোমার ইচ্ছা নয় দেখছি। সেখানে গেলে তো গুরুদেবের জীবন বাঁচাবার জন্যে আমার অবিরত প্রার্থনা তোমায় সবই বিফল করে দিতে হবে। তবে কি আরও উচ্চতর কর্তব্যের আহ্বানে তাঁকে তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে?"

"আমার অন্তরের বাণী শিরোধার্য করে সে রাত্রিতে আমি পুরী যাত্রা স্থগিত রাখলুম।"

(প্রকাশকের মন্তব্য)

† 'Autobiography of a Yogi' বা 'যোগিকথামৃত' সেই অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে পরমহংসজী লিখেছেনঃ

...আমাদের ট্রেন যখন পুরীর দিকে ছুটে চলেছে, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মূর্তি তখন হঠাৎ আমার সম্মুখে আবির্ভূত হলো। তাঁকে দেখলুম আসনে উপবিষ্ট, অত্যন্ত গম্ভীর মূর্তি, তাঁর দুইধারে দুইটি আলো।

করজোড়ে অনুনয় করে বললুম,—"সব কি শেষ হয়ে গেছে?"

তিনি একটু মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তার পরদিন পুরী প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তখনও ক্ষীণতম আশা, এমন সময় একটি অপরিচিত লোক আমার কাছে উপস্থিত হয়ে বললে, "শুনেছেন কি, আপনার গুরুদেব দেহরক্ষা করেছেন?" বলেই আর একটিমাত্র কথা না কয়েই লোকটা চলে গেল; লোকটা যে কে, কোনদিন জানতে পারিনি...বুঝলুম যে নানা উপায়ে আমার গুরুদেব আমায় এই হৃদয়-বিদারক ঘটনা জানাতে চাচ্ছেন।" (প্রকাশকের মন্তব্য)

অতুল্যবাবুর কাছে শুনলাম: তিনি যখন মেজদাকে টেলিগ্রাম করতে যাচ্ছেন সেই সময় গিরিজী মহারাজ টেলিগ্রামখানি দেখতে চান। অতুল্যবাবু তাঁর তারে 'seriously ill' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছিলেন। গিরিজী মহারাজ ঐ শব্দ দুটির জায়গায় 'never so ill' কথা কয়টি লিখতে বলেন। মেজদা সে' কথা শুনে আরো জোরে কেঁদে উঠে বলতে থাকেন—আমি নিজেকে কখনই ক্ষমা করতে পারবো না। কেন আমি একদিন পরে আসতে গেলুম!

যে ঘরে শ্রীযুক্তেশ্বরজীর মরদেহ ছিল, মেজদা রাইটকে বললেন সেই ঘর ছেড়ে সে যেন কোথাও না যায়। তারপর মেজদা এবং আমরা সবাই সমুদ্রে স্নান করতে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্বে প্রার্থনা জানাতে গেলাম। পবিত্র পুরীধামে যারাই তীর্থ করতে আসেন তারাই সমুদ্রে স্নান করে থাকেন কারণ এটাকে তারা একটা বড় পুণ্য কাজ বলেই মনে করেন। ইতিমধ্যে আমাদের অনুপস্থিতির সময় রাইট সাহেব কোন বিশেষ কাজে অল্পক্ষণের জন্য ঘরের বাইরে গিয়েছিল। আমরা ফিরে এসে দেখি গিরিজী মহারাজের হাতের নবরত্ন তাগাটি নেই। এই অসাবধানতার জন্য মেজদা রাইটকে খুব বকেছিলেন।

তারপর আশ্রমের বাগানে যেখানে এখন সমাধি-মন্দির আছে, সেই জায়গায় গর্ত খুঁড়ে একটা চৌবাচ্চার মতো তৈরী করা হলো এবং ইট ও সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো হলো। এরপর সেই গর্তে দু ফুটের মত উঁচু করে লবণ ঢালা হলো। স্বামী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত সুপ্রাচীন সমাধিদান অনুষ্ঠানটি মেজদাই পরিচালনা করেন। তারপর আমরা শ্রীযুক্তেশ্বরজীর পদ্মাসনে উপবিষ্ট মরদেহটিকে অতি যত্নে সেই সমাধি গহ্বরে নামিয়ে দেই—তাঁর দেহ জগন্নাথ দেবের* মন্দিরের দিকে ফেরানো ছিল। দেহ সমাহিত করার পর সমাধির উপর কেবল চারদিকে চারটি বাঁশ পুঁতে মাথায় একটি আটচালা করে দেওয়া হয়।

এদিকে প্রয়াত মহাগুরুর দেহের সমাধিদান পর্ব যখন চলছে, তখন রাইট ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য সেই দৃশ্য তার মুভী ক্যামেরায় ধরে রাখতে ব্যস্ত ছিল। অতুল্যবাবু তাঁর প্রয়াত গুরুর শোকে এতই বিচলিত হয়েছিলেন যে কিছুটা বিরক্ত হয়েই তিনি রাইটকে বলেন, "Stop your camera, please,' আমরা আজ জন্মের মত ওঁকে হারালাম। আর কোনদিন দেখতে পাবো না!"

গিরিজী দেহ রাখার অনেক আগে থেকেই সুধীর বলে মেজদার রাঁচী ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্তেশ্বরজীর কাছে সর্বদা থাকতো এবং তাঁর সেবাযত্ন করতো। পুরী ত্যাগ করার আগে মেজদা সুধীরকে গৈরিক বসন দান করে তাকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত করেন। তখন থেকে তাঁর নাম হয় স্বামী সেবানন্দ।

শ্রীযুক্তেশ্বরজী নিজেই মেজদাকে তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীরূপে

* জগন্নাথ অর্থাৎ জগতের নাথ বা প্রতিপালক। ভারতে পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরকে একটি অতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র রূপে গণ্য করা হয়।

মনোনীত করে যান। গিরিজী মহারাজের নির্দেশ মতো মেজদা যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়ার অধীনে, পুরী আশ্রমের পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন শ্রীযুক্তেশ্বরজী। পরে মেজদা তাকে সুসংগঠিত করে আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রী করেছিলেন। পুরী থাকাকালেই মেজদা স্বামী সেবানন্দকে সোসাইটির প্রতিনিধিরূপে পুরী যোগদা আশ্রমের ইন্‌চার্জ নিযুক্ত করেন। গিরিজী মহারাজ দীর্ঘকাল আগে তাঁর পূর্বাশ্রমের কড়ার নামে ঐ আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে যখন তিনি আশ্রমটি মেজদাকে দিয়ে যান এবং যোগদা সোসাইটিকেও রেজিস্ট্রী করা হয়, তখন থেকেই আশ্রমের নামকরণ হয় যোগদা আশ্রম। মেজদার নির্দেশ মতো স্বামী সেবানন্দ ঐ নামে আশ্রমটি রেজিস্ট্রীও করেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মহাসমাধি লাভের কয়েকমাস পরে মেজদা আমেরিকায় ফিরে যান। তাঁর সেই বিদায় আমাদের মনে গভীর মর্মবেদনা সৃষ্টি করেছিল।

১৩ শেষের দিনগুলি
ও
এক ক্রমবিকাশশীল মিশন

কলকাতায় যোগদা কেন্দ্র স্থাপন

১৯৩৬ সালে মেজদা তো আমেরিকায় ফিরে গেলেন। তারপর আমিও ১৯৩৭ সালে পেটের একটা টিউমার অপারেশন করার জন্য ভিয়েনা গেলাম। অপারেশন সফল হয়েছিল এবং আমি কোলকাতায় ফিরে এসেছিলাম। ১৯৪২ সালে বাবা তাঁর ৪/২ রামমোহন রায় রোডের বাড়ীতে দেহরক্ষা করেন। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল। বাবার উইল অনুযায়ী রামমোহন রায় রোডের বাড়ী বিষ্ণুর অধিকারে আসে। সৌভাগ্যক্রমে আমি ৪নং গড়পার রোডের বাড়ীটি পাই। বাড়ীটি ছিল বাবা এবং মেজদার সাধনা-পূত। কয়েক বছর বাদে আমেরিকা থেকে লেখা একখানা চিঠিতে মেজদা আমাকে ঐ বাড়ীতে একটি ধ্যানকেন্দ্র গড়ে তুলতে বলেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "It is the place where I found God" এবং এখানেই "a worldwide movement has started which is continuously developing."

এরপর আমি ওখানে সাপ্তাহিক সভা শুরু করে দেই। অনেক ভক্ত আসতে আরম্ভ করেন। প্রত্যেক মঙ্গলবার আমরা বৈঠকখানা ঘরে মিলিত হতাম। আমি ভগবদ্গীতা ও মেজদার লেখা পাঠ করতাম, তারপর ধ্যান করা এবং ভজন ও কীর্তন গাওয়া হতো। দক্ষিণেশ্বর যোগদা মঠ থেকে স্বামী আত্মানন্দ তাঁর দলবল নিয়ে আসতেন। ধ্যানকেন্দ্রটি কিছুদিন চলার পর মেজদা আমায় লিখেছিলেন, "৪নং গড়পার বাড়ীতে সেণ্টার করে তুমি যে আনন্দ আমায় দিয়েছ তা বলে বোঝাতে পারবো না। তিন বছর এইরকম সেণ্টার চালাবার পর তুমি আমেরিকার লস্ এইনজেলসে আমাদের সদর কার্যালয়ে ভ্রমণ করার জন্য পাথেয় পাবে এবং আসতে পারবে।" সে সময় মেজদা ভারতবর্ষে আর একবার আসার জন্য মনে মনে পরিকল্পনা করছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তা আর হয়ে উঠছিলো না। তারপর হঠাৎ মেজদা লোকান্তরিত হলেন। মেজদার মহাসমাধিলাভের সময় আমাদের গড়পার যোগদা কেন্দ্রটি ইতিমধ্যেই প্রায় ৪/৫ বছর চালু হয়েছিল। দুর্ভাগ্য আমার—আমেরিকায় গিয়ে মেজদাকে দেখার সুযোগ আর এলো না।

তুলসীদার বাড়ীর পিছন দিকের সামান্য একখণ্ড জমি মেজদা তুলসীদার কাছ থেকে কিনেছিলেন। ঐ জায়গাটিতেই ছিল মেজদার প্রথম আশ্রম। মেজদার 'মহাসমাধি'র কিছুকাল পরে ঐখানে একটা 'হল' তৈরী করা হয় এবং স্বামী আত্মানন্দ ৪নং গড়পার কেন্দ্রটিকে এই নতুন জায়গায় সরিয়ে নিয়ে

আসেন। মেজদার এক ভক্ত ডাঃ সরোজ দাসকে* কেন্দ্রটি পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ও আমাদের খুড়তুতো ভাই স্বর্গত প্রভাস ঘোষের সহপাঠী। তখন থেকে সেখানেই প্রতি শনিবার আমাদের সভা বসতো। আমি প্রতিবার 'ব্রহ্মানন্দম্' পাঠ করে সভার কাজ শুরু করতাম। কিছুক্ষণ ধ্যান করার পর মেজদার লেখা বই এবং ভগবদ্গীতা থেকে পাঠ করে শোনানো হতো। এরপর আমি কয়েকটি যোগ সংগীত গাইতাম। সবশেষে আমি 'নমো নমস্তে' গানখানি গাইতাম এবং তারপর প্রসাদ বিতরণ করা হতো। এই সভাগৃহে আমরা মেজদার জন্ম ও মৃত্যুদিন, লাহিড়ী মহাশয়ের আবির্ভাব এবং শ্রীযুক্তেশ্বরজীর স্মরণে জলবিষুব সংক্রান্তি দিবসটি পালন করতাম। সেইসব দিনে বহু ভক্তের সমাগম হতো। এইভাবে আমরা কলকাতায় মেজদার একটা কেন্দ্র করার ইচ্ছাকে পূরণ করার চেষ্টা করে চলেছি।

স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজীর সমাধি মন্দির

১৯৫০ সালে মেজদা আমাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "গোরা, মনে আছে বোধহয়, যখন ভারতে ছিলাম তখন তোমাকে আমার সেক্রেটারী বলতাম? আমার প্রিয় গুরুদেবের সমাধিক্ষেত্রের ওপর একটা মন্দির তৈরী করার আমার খুব ইচ্ছা। তাঁর কৃপাতেই আমি সবকিছু পেয়েছি। এই মন্দির তৈরী করার ভার তোমাকেই নিতে হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমি আমেরিকা থেকে অনেক ভক্তকে আধ্যাত্মিক ভারতে নিয়ে যেতে পারবো। কিন্তু তার আগে আমি চাই গুরুদেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি সুন্দর সমাধি মন্দির তৈরী হোক্।"

মেজদা যখন ১৯৩৫ সালে ভারতে ফিরে আসেন সে'সময় ৪নং গড়পার রোডের মেরামতির কাজ দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আমি একলা সব কিছু তত্ত্বাবধান করে বাড়ীটা তিনতলা বানিয়েছিলাম। তিনি অন্তর্দর্শী ছিলেন—কার ভেতর কি ক্ষমতা আছে সহজে বুঝতে পারতেন। আমার মধ্যে স্থাপত্য সম্বন্ধে জ্ঞান আছে দেখেই তিনি আমাকে শ্রীযুক্তেশ্বরজীর 'সমাধি মন্দির' তৈরী করার ভার দেন।

সেই সময় আমার সংসারের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। আমার ছেলেদের তখন কোনো রোজগার ছিল না। তা সত্ত্বেও মেজদার অনুরোধ রক্ষা করার জন্য কলকাতায় আমার সমস্ত শিল্পকর্ম স্থগিত রেখে পুরী চলে যাই।

* ডাঃ সরোজ দাস ১৯৭৮ সালের ২রা মার্চ পরলোকগমন করেন। এই বিশ্বস্ত ভক্তের মৃত্যুতে যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়া, বিশেষ করে গড়পার যোগদা কেন্দ্রের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল। (প্রকাশকের মন্তব্য)

আমার সঙ্গে ছিলেন ধীরাজদা বা স্বামী ধীরানন্দ।* তিনি হলেন আমার মেজ মামার বড় ছেলে—একজন অবসরপ্রাপ্ত অ্যাকাউনট্যেন্ট। পুরীর স্টেট্ ব্যাংকে আমরা দুজনে মিলে একটা যৌথ অ্যাকাউণ্ট খুলি। মন্দির নির্মাণের জন্য মেজদা আমেরিকা থেকে যে টাকা পাঠান তাই দিয়ে এই অ্যাকাউণ্ট খোলা হয়। ধীরাজদা হিসাব রাখতেন আর আমি মন্দির তৈরীর কাজকর্ম দেখাশোনা করতাম।

মেজদা নিযুক্ত স্বামী সেবানন্দই আশ্রমের কার্য পরিচালন করতেন। রবিনারায়ণ নামে একটি ব্রাহ্মণ বালক যক্ষ্মারোগ নিরাময়ের আশায় একসময় পুরী আসে। রোগ ভাল হবার পর সেবানন্দ তাকে আশ্রমেই রেখে দেয়। সে সেবানন্দর কাজে সাহায্য করতো এবং নানা ফাইফরমাস খাটতো। মন্দির তৈরীর মাল-মশলা থেকে শুরু করে রাজমিস্ত্রি যোগাড় করে দেওয়া প্রভৃতি নানা কাজে সে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করতো। আমাকে সে প্রায়ই বলতো যেন আমেরিকাতে পরমহংসজীর কাছে তার সুখ্যাতি করে লিখি। আমি সত্য সত্যই মেজদাকে ওর প্রশংসা করে চিঠি লিখেছিলাম।

মন্দিরের নক্শা এবং খুঁটিনাটি বিষয়ে মেজদা খুবই চিন্তিত ছিলেন এবং কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে জানতে চেয়ে তিনি আমাকে অনেক চিঠিও লেখেন। সেই সব পত্রে তিনি তাঁর মনের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছেন। আসলে আমাদের কাজ কোনো পূর্বঅংকিত-নক্শা অনুযায়ী শুরু করা হয়নি। কাজের অগ্রগতির সঙ্গে সেখানে মনের ভাব সংমিশ্রিত হয়েছে।

মেজদা লিখেছিলেন: "মনে রাখবে, আমাদের প্রতীক সোনালী পদ্ম যেন মন্দিরের মাথায় থাকে।" সে' চিঠি পেয়ে কলকাতায় এসে আমার এক আর্টিস্ট বন্ধুর সাহায্যে ৫ ফুট উঁচু একটি পদ্মের নক্শা করি যাতে প্রতি পাতা আলাদা দেখানো হয়েছে। তারপর কাঁসারীপাড়ায় তামার পদ্ম-পাপড়ি তৈরী করে সেগুলিকে ফিট্ করার ফ্রেমও তৈরী করি। মন্দির তৈরী হয়ে গেলে আমি নিজে সেই ফ্রেম যথাস্থানে আটকে একটি একটি করে পাতা তাতে জুড়ে দিই। তাছাড়া মন্দিরের ভেতর অলংকরণের প্রতিটি বিষয়ের দিকে আমি সযত্ন দৃষ্টি রাখতুম—যেমন বেদী কোথায় হবে, জ্ঞানাবতারের মার্বেল মূর্তিটি কোথায় স্থাপন করা হবে, মোজাইক টালির ডিজাইন কি হবে ইত্যাদি। মন্দিরের কাজ শেষ হলে পর তার ভেতর এবং বাইরের ছবি—বিশেষ ঐ তামার তৈরী পদ্মের ছবি মেজদাকে পাঠাই। সেই সঙ্গে পদ্মটা কিভাবে তৈরী এবং ফিট্ করা হয়েছে তারও একটা নিখুঁত খসড়া করে পাঠিয়ে দিই। মন্দিরের ওপর সেই পদ্মের ছবি দেখে মেজদা লিখেছিলেন: "আমি তোমার কাছে বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ। আমি কয়েকটা পদ্ম আমেরিকাতেও বানিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তোমার মত পদ্ম তৈরী করতে পারেনি। What I couldn't do in America, you have done there."

* ইনি এবং স্বামী ধীরানন্দ অর্থাৎ মেজদার বাল্যবন্ধু শ্রীবাসু কুমার বাগ্চী এক ব্যক্তি নন।

আমাদের মন্দিরের কাজ যখন প্রায় শেষ হতে চলেছে সেই সময় আনন্দময়ী মা তাঁর পুরী আশ্রম পরিদর্শনে আসেন। তিনি আমাদের মন্দিরের কথা শুনেছিলেন ; তাই আমি গিয়ে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করতে তিনি তাঁর নিজের আশ্রম মেরামতের জন্য একজন ওস্তাদ মিস্ত্রি আমার কাছে চাইলেন। 'আমাদের কাজ শেষ হয়ে এসেছিল বলে হেড্ মিস্ত্রিকেই তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেই। খুব খুশী হয়ে আনন্দময়ী মা একদিন আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করে খুব যত্ন করে খাওয়ালেন।

এর কয়েকদিন পরে মন্দিরের চারদিকের বারান্দার মেঝের কাজে যখন হাত দিয়েছি, সেই সময় স্বামী আত্মানন্দের কাছ থেকে টেলিগ্রামে খবর পেলাম পরমহংসজী ৭ই মার্চ দেহরক্ষা করেছেন। সংবাদের আকস্মিকতা আমাকে হতবুদ্ধি, বিমূঢ় করে তুললো। দুঃখে শোকে মুহ্যমান হয়ে কাঁদতে কাঁদতে কলকাতা আসার ব্যবস্থা করছি এমন সময় 'মহাসমাধি'র সাত দিন আগে লেখা মেজদার একখানা চিঠি পেলাম। তাতে অনেক উপদেশের পর শেষ লাইনে লিখেছেনঃ জীবনতো শেষ হয়ে এলো। কি করে জানতে পেরেছিলেন জীবন শেষ হয়ে এলো। যখন ঐ চিঠি পেলাম তখন আর তিনি এ জগতে নেই।

দেহরক্ষার একমাস আগে মেজদা আমাকে একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন —পুরীতে তিনি এমন কিছু সম্পত্তি কিনতে চান যার আয় থেকে পুরী আশ্রমের ব্যয়ভার মেটানো যাবে। এতাবৎ খরচের যাবতীয় টাকা মেজদা আমেরিকা থেকে পাঠাতেন এবং তাছাড়া দক্ষিণেশ্বরের যোগদা মঠ থেকেও একটা মাসিক অনুদান আসতো। মেজদা চেয়েছিলেন এই পবিত্র আশ্রম এবং সমাধি-মন্দিরটি চিরকাল উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ হয়। আমি উঠে পড়ে কয়েকটা ছোট বাড়ী কেনবার চেষ্টা করছিলাম যাতে সেইসব বাড়ী ভাড়া দিয়ে সেই টাকায় পুরী আশ্রমের খরচ চলে যায়। ইতিমধ্যে হঠাৎ বজ্রপাতের মত মেজদার মৃত্যু সংবাদ এলো—তাই আমার আর সেখানে একদিনও থাকতে ইচ্ছে হলো না। আর আমার এই যে ছবি এঁকে রোজগার বন্ধ করে, সংসারকে অতি কষ্টের মধ্যে রেখে প্রায় এক বছর পুরীতে মন্দির তৈরী করার জন্য কাটিয়ে-দিলাম—তার মর্ম হায় ক'জন লোকই বা আজ বুঝবে। তাই আবার কলকাতা-তেই ফিরে এলাম। আমার একান্ত প্রিয় মেজদার বিয়োগব্যথা দূর করতে একমাত্র মহাকালই বোধহয় পারে—আর কারোর পক্ষে সে সম্ভাবনা দেখিনে।

পরমহংস যোগানন্দের মহাসমাধি

১৯৩৬ সালে মেজদা ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকায় ফিরে যান। তারপর থেকে মহাবতার বাবাজী এবং স্বীয় গুরু স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজী নির্দেশিত সুপ্রাচীন এবং বিশ্বজনীন 'ক্রিয়াযোগে'র অধ্যাত্ম বিজ্ঞানকে বিশ্বময় সম্প্রসারিত করার জন্য তাঁর যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি/সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলো-শিপের কাজে তিনি নিজেকে আরও গভীরভাবে নিযুক্ত করেন। ১৯৪২ সালে

ক্যালিফোর্নিয়ার হলিউডে সর্বধর্মের জন্য তিনি সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপ মন্দির নির্মাণ করেন; তারপর স্যান্ ডিয়েগোতে ১৯৪৩ সালে আর একটি মন্দির তৈরী হয়। ১৯৪৭ সালে লং বীচে* সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন মন্দির তৈরী হয় এবং ১৯৪৯ সালে প্যাসিফিক্ প্যালিসেডে (Pacific Palisades) সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপ লেক্ স্রাইন নির্মাণের জন্য একটি মনোরম জায়গা লাভ করেন। এখানেই তিনি সর্বধর্মীয় মানুষের সমাবেশের জন্য এক প্রাকার বিহীন মন্দির তৈরী করেন। মহাত্মা গান্ধীর চিতাভস্মের কিঞ্চিৎ অংশ এই মন্দিরে রাখা আছে। মন্দিরের পাশেই আছে একটি নয়নাভিরাম হ্রদ। ১৯৫০ সালে মন্দিরটি উৎসর্গ করার সময় মেজদা এর নামকরণ করেন ওয়ার্ল্ড পিস্ মিম্যারিয়্যাল (World Peace Memorial)। সেখানে গান্ধীজীর স্মৃতি বেদীর ওপর আমার স্বহস্তে আঁকা মহাত্মাজীর একখানি তৈলচিত্র রাখা আছে। ১৯৫১ সালে হলিউডের মন্দির সংলগ্ন একটি প্রেক্ষাগৃহ এবং ইণ্ডিয়া কালচারাল সেণ্টারের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়। সেটির উৎসর্গ অনুষ্ঠানে ক্যালিফোর্নিয়ার লেফ্টানেণ্ট গভর্ণর গুড্উইন জে. নাইট এবং ভারতের কন্সাল-জেনারেল শ্রী এম. আর. আহুজা উপস্থিত ছিলেন।

মেজদা গভীর ধর্মভাব ভরা বহু প্রবন্ধ ও মূল্যবান বই লিখে গেছেন। তাঁর সেই লেখা পৃথিবীর অগণিত মানুষের মনে নতুন প্রেরণা জাগিয়েছে। তাঁর আধ্যাত্মিক মহাগ্রন্থ 'Autobiography of a Yogi' (যোগিকথামৃত) ইতিমধ্যেই ষোলটি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এবং বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক রূপে মনোনীত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হলো Man's Eternal Quest, The Science of Religion (ধর্ম বিজ্ঞান), Whispers from Eternity (দিব্যবাণী), Metaphysical Meditations (আধ্যাত্মিক ধ্যান) ইত্যাদি। তাছাড়া অসংখ্য মানুষ ঘরে বসেই সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন/যোগদা লেশনস্গুলি পাঠ করে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করে থাকেন।

মেজদা ১৯৫২ সালের ৭ই মার্চ তারিখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেদিন লস্ এইনজেলসের বিল্টমোর হোটেলে আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রী বিনয় রঞ্জন সেনের সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়। মেজদা সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন। স্বরচিত 'মাই ইণ্ডিয়া' নামক কবিতা পাঠ করে তিনি বক্তৃতা শেষ করেন। এই কবিতার শেষ পংক্তিগুলি হলো, "Where Ganges, woods, Himalayan caves and men dream God—I am hallowed; my body touched that Sod." কবিতাটি আবৃত্তি করার পর 'কূটস্থে' দৃষ্টি সংলগ্ন করে মেজদা মহাসমাধিতে লীন হন্।

* বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে যোগদানেচ্ছু ভক্তবৃন্দের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হতে থাকায় উপাসনা স্থানটিকে পরবর্তীকালে ক্যালিফোর্নিয়ার ফুলারটনের বৃহত্তর মন্দিরে স্থানান্তরিত করা হয়।

শ্রীশ্রী দয়ামাতা

মেজদার একটা ঐশী দূরদর্শিতা ছিল। মেজদা যে তাঁর সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপ/যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়ার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারিণীরূপে শ্রীশ্রী দয়ামাতাকে পূর্বেই মনোনীত করেছিলেন— তা থেকেই এই বক্তব্যের প্রমাণ মেলে। সেই মত দয়ামাকে অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি দীক্ষা ও শিক্ষা দিয়েছিলেন। সর্বোপরি তাঁর দয়ামাতা নামটি দেওয়াও সার্থক হয়েছে—সত্যই যেন তিনি মূর্তিমতী প্রেম ও দয়া। মন তাঁর শিশুর মত সরল, যা আমি আর কারোর মধ্যেই দেখিনি। ঐশ্বরিক দয়া ও ভালবাসা দিয়েই যেন তিনি সকলকে ঘিরে রেখেছেন। দেশবিদেশের ভক্তরা, যারা দয়ামাকে প্রত্যক্ষ দেখেছেন এবং যারা তীর্থদর্শনের জন্য এই ৪নং গড়পার রোডের বাড়ীতে এসেছেন, তারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন, "প্রকৃত অর্থেই তিনি (দয়ামা) মা। পরমহংসজী তাঁর অন্তরে সদা বিরাজমান।" আমিও তাদের সঙ্গে এ'ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। আমার মনে হয় সত্যসত্যই মেজদা দয়ামাতাজীর অন্তরে বাস করছেন। তাই তাঁর হৃদয় অত মাধুর্য্য আর দাক্ষিণ্যে ভরা। সর্বদাই যেন তিনি ভগবৎ সান্নিধ্যের আনন্দে ডুবে আছেন। দয়ামাতা অতুলনীয়া—তাঁর তুলনা একমাত্র তিনি নিজেই।

পরমহংসজীর যোগদা সঙ্ঘের কাজকর্ম উপলক্ষে ১৯৫৮ সালে দয়ামাতা এবং আনন্দমাতা* ভারতবর্ষে আসেন। তখন একদিন দয়ামা তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে এই ৪নং গড়পার রোডের বাড়ীতে এসেছিলেন। সেই সময় এখানকার একটা সিনেমা হলে চৈতন্যলীলা সিনেমাটি চলছিল। আমি তাঁদের সকলকে নিয়ে রাত্রের শোতে সিনেমাটি দেখতে যাই। প্রভাসদা'ও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমাদের আসন ছিল ব্যালকনিতে। ছবির প্রায় শেষ দিকে যখন শ্রীচৈতন্যদেব 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলতে বলতে উন্মত্তের ন্যায় গৃহত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, সেই দৃশ্য দেখে দয়ামাতাজী চেয়ারের পিছন দিকে হেলে পড়ে 'সমাধি'স্থ হয়ে পড়েন। শো শেষ হবার পর সবাই চলে গেলেও দয়ামা'র সমাধিভঙ্গ হয় না। হলের কর্মীরা আলো নেভাতে এসে মাতাজীর ঐরূপ ভাবাবস্থা দেখে, ব্যালকনিতে একটা মৃদু আলো জ্বালিয়ে রেখে নীচে অপেক্ষা করতে থাকেন। আমরা সকলেই সেই নিস্তব্ধ প্রায়ান্ধকারে দয়ামার আশপাশে বসে থাকি। এইভাবে আরও এক ঘণ্টা কেটে যায়। তারপর ধীরে ধীরে দয়ামার সমাধিভঙ্গ হয়। আমরা তাঁকে সযত্নে নীচে নামিয়ে আনি। অপেক্ষমান কর্মীদের দেখে তাদের দেরী করে দেওয়ার জন্য মা তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা

* আনন্দমাতাজী ১৯৩২ সাল থেকে পরমহংস যোগানন্দজীর একজন বিশ্বস্ত সন্ন্যাসিনী শিষ্যা। তাছাড়া তিনি পরিচালক মণ্ডলীর একজন সদস্যা এবং সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপ/যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়ার উচ্চপদস্থ কর্মী। তিনি শ্রীশ্রী দয়ামাতাজীর সহোদরা।

করেন। তারা তৎক্ষণাৎ সকলে করজোড়ে প্রণাম করে বলে ওঠেন, "আজ আমাদের সিনেমা হল পবিত্র হলো, আর আমরাও ধন্য হলাম!"

মেজদা আজ দয়ামাতাজীর মধ্যে দিয়ে, সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপ /যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়ার কর্মের মধ্যে দিয়ে এবং তাঁর আশীর্বাদপূত লক্ষ লক্ষ ভক্তজন হৃদয়ে অমর হয়ে আছেন।

জীবন-সায়াহ্নে আজ আমার মেজদার লেখা সেই কথা কয়টি মনে পড়ছে, যেখানে তিনি বলেছেন ঃ

"ভগবানের এই নাট্যখেলায় তোমার ভূমিকা সুখের বা দুঃখের—যাই হোক্ না কেন—সুচারুভাবে অভিনয় করে যাও। তুমি আমার ভাই ; তোমার জীবন যেন ভগবৎ সেবায়, আমাদের গুরুগণের সেবায় এবং ওয়াই. এস্. এস্. চিন্তাধারা সারা ভারতে ছড়িয়ে দেবার কাজে উৎসর্গীকৃত হয়। আমি তোমার জন্য খুবই গর্ববোধ করি...."

প্রার্থনা করি আমি যেন মেজদার সেই আশা পরিপূর্ণ করতে পারি।

পরিশিষ্ট

মেজদার ভাই ও ভগ্নীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

আমরা চার ভাই ও চার বোন। বড় ভাই অনন্তদার জন্ম হয় রেঙ্গুনে। বড়দিদি রমাশশী এবং মেজদিদি উমাশশী—দু'জনেরই জন্ম মজঃফরপুরে। বাবা-মায়ের দ্বিতীয় পুত্র মেজদার জন্ম হয় গোরক্ষপুরে। তারপর সেজদি নলিনী—জন্ম কলকাতা। তৃতীয় পুত্র—এই লেখকের জন্মও হয় গোরক্ষপুরে। চতুর্থ কন্যা পূর্ণময়ী বা থামো এবং চতুর্থ পুত্র বিষ্ণুচরণ বা বিষ্ণু—দু'জনেরই জন্মস্থান লাহোর।

বড়দা—অনন্ত

বাহ্যতঃ খুব কঠিন প্রকৃতির হলেও এবং আমাদের অর্থাৎ ভাই-বোনদের কড়া অনুশাসনের মধ্যে রাখলেও, আমাদের বড়দা কিন্তু অন্তরে ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ও দয়ালু প্রকৃতির মানুষ। মা যখন মারা যান দাদার তখন অল্প বয়স। তা সত্বেও মাতৃস্নেহ বঞ্চিত ভাইবোনদের কথা ভেবে তিনি তাদের আপন বুকের পাঁজরের মত ভালবাসতেন এবং সুশিক্ষা দেবার চেষ্টা করতেন। বাবার মত দাদাও মিতব্যয়ী ছিলেন। ১৯০৮ সালের ১৭ই অগ্যাস্ট বড়দা অ্যাকাউনটেণ্ট-শিপ্ পরীক্ষা পাশ করেন এবং পি. ডব্লু. ডি-তে (Public Works Department) অ্যাকাউনটেণ্টের চাকরী নেন। মীরাটে তাঁর কর্মজীবন শুরু; অবশ্য পরে তাঁকে অন্যত্রও বদলী করা হয়। ১৯০৯ সালে তাঁকে গোরক্ষপুরে বদলী করা হয়; তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের শেষ কটা দিন তিনি এখানেই কাটান। প্রতি বছর ছুটির সময় পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি কলকাতায় আসতেন।

মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে বড়দা মারা যান। উনি মারা যাবার পর আমি গোরক্ষপুরে গিয়ে তাঁর জিনিষপত্র নিয়ে আসি। তার মধ্যে ছিল একটা ডায়েরী। সযত্নে লেখা বড়দার সেই ডায়েরী দেখে বাবা এবং আমি—দু'জনেই খুব অবাক হয়ে যাই। ছুটীতে কলকাতায় বেড়াতে এসে বোনদের কাকে কত টাকা দিয়েছেন এবং কার কার বিবাহে কত টাকা সাহায্য করেছেন— সব কিছু নিখুঁতভাবে ডায়েরীতে লেখা আছে।

নিজের জিনিষপত্রের প্রতি ওঁর অসীম যত্ন ছিল। যেমন ওঁর সাইকেল —বিশ বছর ধরে ব্যবহার করছেন অথচ দেখলে মনে হতো যেন সদ্য শোরুম থেকে নিয়ে এসেছেন। বড়দার গান বাজনারও শখ ছিল। ভাল এস্রাজ বাজাতে পারতেন।

মিতব্যয়ী ছিলেন বলেই অল্পদিন চাকরী করেও বড়দা অনেক টাকা জমাতে পেরেছিলেন। বাবা, দাদার অফিস থেকে পাওনা টাকা দিয়ে বৌদির নামে গভর্ণমেণ্ট পেপার কিনে দেন। বড়দা গোরক্ষপুর থেকে বাবার পরামর্শ

ছাড়া একটিও কাজ করতেন না। বাবাও আবার প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে বড়দার পরামর্শ নিতেন।

মৃত্যুকালে বড়দা স্ত্রী, এক ছেলে গগন ও এক মেয়ে অমিয়াকে রেখে যান।

বড়দি—রমাশশী

বড়দির ডাক নাম ছিল টুনি। স্নেহময়ী মায়ের মতই ছিলেন তিনি--তাঁকে 'দেবী' বললেও বোধহয় বাড়িয়ে বলা হয় না। দেখলে মনে হতো যেন এক সদাহাস্যময়ী শান্ত প্রতিমা। মা কালীর ভক্ত ছিলেন ; সুখে-দুঃখে মনে-প্রাণে সর্বদা মা কালীকে স্মরণ করতেন। আমরা যখন লাহোরে, সেই সময় বড়দির সঙ্গে কোলকাতার সতীশ চন্দ্র বোসের বিবাহ হয়। বড়দির শ্বশুর ডাঃ কেশব চন্দ্র বোস অত্যন্ত নাস্তিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। বড় জামাইবাবুরও তাঁর বাপের মতই নাস্তিক মনোভাব ছিল। নিজের শোবার ঘরের এককোণে মা কালী ও লক্ষ্মীর ছবি রেখে বড়দি রোজ পুজো করতেন। তারজন্য জামাই-বাবু তাঁকে অত্যন্ত হেনস্তা করতেন। পরে বড়দি মেজদার শরণাপন্ন হয়ে কিভাবে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়ে জামাইবাবুকে মনের দিক থেকে পরিবর্তন করিয়ে দেন সেকথা মেজদার 'অটোবাইওগ্রাফি অফ্ এ যোগি'তে বিস্তারিত-ভাবে বর্ণনা করা আছে। মা কালীর কাছে একলা বসে বড়দিকে কথোপকথন করতেও দেখেছি। পাশে এসে দাঁড়িয়েছি কিন্তু কোন হুঁশ নেই—যেন অন্য জগতের লোক! দেখেছি বিড়বিড় করে কথা বলছেন মায়ের সঙ্গে, আর চোখ দিয়ে তাঁর আনন্দাশ্রু বইছে। সে মুখের ঐশ্বরিক ভাব মনে হলে এখনও আমার চোখে জল আসে।

বড়দির শ্বশুরবাড়ী হলো ৪নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন—আমাদের ৪নং গড়পার রোডের বাড়ীর খুব কাছেই। বড়দির কাছে মায়ের স্নেহ ভালবাসা পেতাম বলে আমি প্রায়ই বিকেলবেলা তাঁদের বাড়ীতে চলে যেতাম। বড়দি আমাকে একটি গান শিখিয়েছিলেন এবং ছাদে বসে প্রায়ই সেই গানটি আমাকে গাইতে বলতেন। ছোটবেলায় আমার গলার স্বর মিষ্টি ছিল। আমি গাইতাম আর বড়দি আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতেন—তাঁর দুই চোখ বেয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়তো।

নীল গগনে, নীল আবরণে
আবরি রেখেছ বুঝি প্রাণধনে।
খোল আবরণ বারেক নয়নে
দেখে মন-প্রাণ জুড়াইবে॥*

* গানটির পরমহংস যোগানন্দজী কৃত ইংরাজী অনুবাদ এবং তার সুর 'Cosmic Chants' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। (প্রকাশকের মন্তব্য)

গানটির অর্থ তিনি একবার আমায় বুঝিয়ে বলেছিলেনঃ "আকাশের দিকে চেয়ে দেখ—মনে হবে কে যেন এক বিরাট নীল কাপড়ের চাঁদোয়া দিয়ে ভগবানের জ্যোতির্ময় রূপকে ঢেকে রেখেছেন। আর ঐ যে তারাগুলি চক্‌চক্‌ করছে—ওরা হলো নীল কাপড়ের গায়ে ছোট ছোট গর্ত। ঐ গর্তের মধ্যে দিয়েই ওপারের জ্যোতির সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছে।" এছাড়াও তিনি বলতেন—সর্বদা অনন্ত আকাশ আর অসীম সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকতে পারলে মন বড় হয়।

পদ্যের ভাষায় তাঁর দু'টি অমূল্য উপদেশ আজও আমার স্পষ্ট মনে আছেঃ

একদা ছিল না জুতা চরণযুগলে
দহিল হৃদয়-মন সেই ক্ষোভানলে।
পথে যেতে দেখি এক পদ নাহি যার
তখনি জুতার ক্ষোভ ঘুচিল আমার॥

বড়দি আমায় বলতেনঃ "সর্বদা তোমার চাইতে যারা বেশী কষ্টে আছে, তাদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করবে। তাহলে আর অভাব ও দুঃখ জানবে না।"

সুখ দুঃখ সম্বন্ধে তাঁর অন্য আর একটি কবিতা আমি সর্বদা স্মরণ রেখেছিলাম বলে জীবনে অনেক বড় ঝড়-ঝাপটা, পুত্রশোক, অর্থহানি, অভাব অনটনের মধ্যেও নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পেরেছিলাম। সেই কবিতাটি হলোঃ

সুখ দুঃখ এই ভবে
মানবে সহিতে হবে।
সদা সুখভোগ কারো ঘটেনা কখনো,
সতত দুঃখেতে কারো কাটেনা জীবন॥
যারে তুমি ভাব মনে
বড় সুখী এ ভুবনে,
কত দুঃখ আছে তার জান কি কখনো?
কত নিশা যাপে সে যে করিয়া রোদন॥
দিবা-রজনীর মত
সুখ-দুঃখ অবিরত
চক্রবৎ ঘোরে সদা মানব জীবনে।
চিরসুখী চিরদুখী নাইকো ভুবনে॥
নির্মল সুখ ভবে
চিরদিন নাহি রবে,
মনে করি সুখ দিনে হবে সাবধান।
সুখে মত্ত হয়ে যেন না হারাও জ্ঞান॥

বিপদে পড়িবে যবে,
হতাশ নাহিকো হবে,
পোহাবে দুখের নিশা সুখের উদয়।
ঈশ্বর ইচ্ছায় হবে জানিও নিশ্চয়॥

একদিন সন্ধ্যায় ৪/২ রামমোহন রায় রোডের বাড়ীতে এসে দেখি বড়দির ছেলে রামগতি, বাড়ী ফেরার জন্যে একটি ভাড়া গাড়ি এনে বাইরে চেঁচামেচি করে তার মাকে ডাকছে আর বলছে: "শীগ্‌গির এসো। গাড়োয়ান গোলমাল করছে—চলে যাবে বলছে।" আমি ভিতরে ঢুকে দেখি বড়দি বাড়ীর পিছনের একটা অন্ধকার ভাঁড়ার ঘরে উঁচুতে টাঙ্গানো ধুলোমাখা বাবা ও মায়ের ছবি নামিয়ে পরিষ্কার করছে। আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করি, "বড়দি, ছবি দুটি কি আপনি নিয়ে যাবার মতলব করছেন নাকি?" অতি মিষ্টি করে তিনি বললেন, "ওরে নারে—যাঁদের দৌলতে আজ তোদের এত বাড়বাড়ন্ত তাঁদের ছবি অতি অযত্নে রয়েছে। তাই একটু পরিষ্কার করছি। আবার যথাস্থানে টাঙ্গিয়ে দেবো।" বড়দির কথা শুনে আমি মর্মাহত এবং লজ্জিত হয়েছিলাম। সত্যই তো—আজ যে আমরা এত সুখে আছি সে তো কেবল বাবা-মার জন্যেই। তাঁরা আমাদের কত ভালবাসতেন, আমাদের জন্যে কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন। অথচ তাঁদেরই ছবি অন্ধকারে অযত্নে ফেলে রেখেছি। বড়দির কাছে মাথানত করে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলাম। তারপর বললাম—"আপনার ছেলে কিন্তু ওদিকে ভীষণ চেঁচামিচি করে ডাকাডাকি করছে।"

উনি শুনে বললেন, "ডাকুক্ গে। এ'বাড়ীতে আমার এটিই শেষ কাজ। আমাকে তা শেষ করতেই হবে।" সত্যিই সেটা বড়দির শেষ কাজ ছিল। তারপর তিনি আর এ'বাড়ীতে কোনদিন আসেন নি। কিছুদিন বাদেই বড়দি দেহরক্ষা করেন।

বড়দি যেদিন মারা যান সেদিন তিনি বিষ্ণুর স্ত্রী আর তার জামাই বন্ধুকে নিজের বাড়ীতে রাত্রে খাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ওরা খেয়ে-দেয়ে যখন বাড়ী যায় তখন রাত দশটা। বড়দি তখন একদম সুস্থ। তারপর মাঝরাতে রামগতি আমাদের টেলিফোনে খবর দিল যে বড়দি রাত ১১-৩০টায় মারা গেছেন। শুনেই গাড়ী নিয়ে তৎক্ষণাৎ ওদের বাড়ী ছুটলাম। গিয়ে দেখি—বড়দির মৃতদেহ খাটে শোয়ান আছে। হাসি হাসি মুখ; দুটি হাত বুকের ওপর রাখা। একহাতে জপের মালা, আর একহাতে 'গীতা'।

পরে জামাইবাবুর কাছে শুনেছিলাম—প্রতিরাতে যেমন করতেন সে রাতেও তেমনি বড়দি জামাইবাবুর পদসেবা করছিলেন। পা টিপে জামাইবাবুকে ঘুম পাড়াতেন। সেদিন পা টিপতে টিপতে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমাকে যেতে হবে। কে যেন আমাকে ডাকছে।' এই বলে জামাইবাবুর পা ছেড়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঠাকুরঘর থেকে গীতা আর জপের মালা নিয়ে এসে স্বামীর পায়ে প্রণাম করে পাশেই শুয়ে পড়লেন। সংগে সংগে তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

বড়দিকে দেখে তখন মনে হচ্ছিল যেন কত আরামে ঘুমোচ্ছেন। মহাসমাধির পরে সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপের (যোগদা সৎসঙ্গ) আন্তর্জাতিক সদর অফিসে ফুল শয্যায় শায়িত মেজদার স্বর্গীয় হাসিমাখা মুখের ছবি দেখে সঙ্গে সঙ্গে আমার বড়দির সেই হাসিভরা মুখ মনে পড়েছিল।

আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয়—মৃত্যুর কিছুদিন আগে বড়দি একখানি লালপাড় শাড়ি, সিঁদুর আর আলতা কিনে এনে ছেলের বৌকে দিয়ে বলেছিলেন, "বৌমা এ'গুলি ঠিক করে রেখে দাও। রাতবিরেতে হয়তো কখনও দরকার হতে পারে।" বৌমা প্রতিবাদ করা সত্বেও বড়দি জোর করে তার হাতে সেগুলি তুলে দিয়েছিলেন।

তাঁর আসন্ন মৃত্যুর কথা বড়দি কেমন করে জেনেছিলেন জানিনা। বড়দি মারা যেতে আমরা দ্বিতীয়বার মাতৃহারা হয়েছিলাম। এখনও, এত বয়সেও, বড়দির স্নেহ ও ভালবাসার কথা এবং তাঁর সেই সৌম্যমূর্তি মনে হলেই চোখ জলে ভরে যায়। ওঁর মত অমন একটি ভক্তিমতী স্ত্রীলোক আর দেখতে পেলুম না। তিনি স্বামী, এক ছেলে ও চার মেয়ে রেখে মারা যান।

মেজদি-উমা

আমাদের মেজো বোন অর্থাৎ উমাদিকে বড়রা সবাই 'মুনি' বলে ডাকতেন। আমরা ছোটরা, তাঁকে মেজদিই বলতাম। তাঁর মুখটি ছিল যেমন সুন্দর সদাহাস্যময়, মনটিও ছিল তেমনি শিশুর মত সরল। মেজদি আমাকে 'সন্তু' বলে ডাকতেন। তাঁর দাদাশ্বশুরের নাম গোরাচাঁদ ছিল বলে আমাকে গোরা বলে ডাকতে পারতেন না। তখনকার দিনে আমাদের দেশে গুরুজনের নাম মুখে আনা দোষ বলে মনে করা হতো।

সে সময়কার বিখ্যাত ধনী কণ্ট্রাক্টর শ্রী গোরাচাঁদ বসু মল্লিকের নাতি শ্রী সত্যচরণ বসুমল্লিকের সঙ্গে মেজদির বিয়ে হয়। মেজদির তিন ছেলে ও এক মেয়ে। মেজ ছেলে বিজয় মল্লিক ব্যায়ামে ও কীর্তনে খুব নাম করেছিল। তাকে 'কীর্তন সাগর' উপাধি দেওয়া হয়। মেজদির বড় ছেলের নাম বিশু আর ছোট ছেলের নাম বিনু। মেয়ের ডাকনাম ছিল রাণী।

সেজদি—নলিনী

সেজদি আমার চাইতে মাত্র তিন বছরের বড় ছিলেন। পিঠোপিঠি ভাইবোন, তাছাড়া খেলার সাথী বলে বড়দের মত আমিও তাকে 'নলি' বলেই ডাকতাম। শুনতে পেয়ে বাবা একদিন ভীষণ বকুনি দিলেন, বললেন: নলিনী তোমার চেয়ে বয়সে বড়; তাই সেজদি বলেই ডাক্‌বে। সেই থেকে তাকে আমি সেজদি বলেই ডাক্‌তাম।

সেজদির বিয়ে হয়েছিল ডাঃ পঞ্চানন বোসের সঙ্গে। আমাদের এই ৪নং গড়পার রোডের বাড়ীতেই বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের কিছুকাল পরেই সেজদির মারাত্মক টাইফয়েড হয়। মেজদা তখন জাপানে বেড়াতে গেছেন। তিনি যখন সেদেশ থেকে ফিরলেন তখন সেজদির প্রায় শেষ অবস্থা—অজ্ঞান হয়ে আছে। মেজদা এক সপ্তাহ তার কাছে থেকে আরোগ্যলাভের উপযোগী বহুবিধ যৌগিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে তাকে সুস্থ করে তুললেন। এর আগে ডাক্তাররা সেজদির জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। তাই সেজদিকে নিরাময় হতে দেখে তাঁরা কম বিস্মিত হননি। তবে এই রোগেতে সেজদির দুটি পা-ই পঙ্গু হয়ে যায়। সেজদি মনের দুঃখে সব সময় কাঁদতো। তার সেই দুঃখ দেখে ব্যথিত হয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে মেজদা তার কাছে যান এবং তার ওপর নিরাময়ের অনেক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেন। তিনি এ'ব্যাপারে নিজ গুরু স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজীর দিব্য সাহায্যও গ্রহণ করেন। যুক্তেশ্বরজী অবশ্য আগেই বলে দিয়েছিলেন যে সেজদি একমাসের মধ্যে ভাল হয়ে যাবে এবং বাস্তবিকপক্ষে ঠিক একমাসের মাথায় সেজদি একদম ভালো হয়ে গেছলো। সেই অদ্ভুত আরোগ্যলাভ দেখে তার চিকিৎসক-স্বামী এবং আমাদের পরিবারের সকলেই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়। সেজদি দেখতে খুব ক্ষীণ ছিল। মেজদা তার সেই রোগও ভাল করে দেন। তার আগেই অবশ্য সেজদি, মেজদার এক বড় ভক্ত-শিষ্যা হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়বার আরোগ্যলাভের পর মেজদার প্রতি তার ভক্তি আরও বেড়ে যায় এবং মেজদার সব আধ্যাত্মিক নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে থাকে। এই সেজদিই আবার মেজদার প্রতিটি ধর্মীয় উৎসব পালনের সময় যখন যেমন টাকার প্রয়োজন হতো, হারমোনিয়ামের মধ্যে লুকিয়ে সেই টাকা পাঠাতেন। শুধু তাই নয় বিষ্ণুর যখন যেমন টাকার দরকার হতো, সেই টাকাও সে সেজদির কাছ থেকেই নিয়ে আসতো। সেজদি ছিল অত্যন্ত সরল আর স্নেহময়ী। সেজদির মাত্র দু'টি মেয়ে—অন্নপূর্ণা ও মিনু।

লেখক—সনন্দলাল

আমার জন্ম হয় ইংরাজী ১৮৯৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। গোরক্ষপুরে যে ঘরে মেজদা জন্মেছিলেন সেই ঘরেই আমার জন্ম। গোরক্ষপুরের বিখ্যাত সাধু গোরক্ষনাথের নাম অনুসারে আমার নাম রাখা হয়েছিল গোরক্ষ-নাথ ঘোষ। সেইজন্যই আমার ডাকনাম 'গোরা'। পরে কলকাতা হিন্দু স্কুলে ভর্তি করার সময় ভাইদের নামের মধ্যে একটা ধ্বনিগত সাদৃশ্য রক্ষার জন্য বড়দা বাবার অনুমতি নিয়ে আমার নাম রাখেন সনন্দ। আমার স্পষ্ট মনে আছে প্রথম যেদিন আমি স্কুল থেকে বাড়ী আসি সেদিন পথে সারাক্ষণ মনে মনে আওড়াতে থাকি—আমার নাম সনন্দলাল।

আমি যখন হিন্দু স্কুলে ক্লাশ সেভেন-এ পড়ি, তখনই আমার অংকন বিদ্যায় হাতেখড়ি হয়। আমার মায়ের চিত্রাংকণের হাত ছিল অপূর্ব। বোধ-

হয় জন্মসূত্রেই তাই ঐ বিদ্যায় আমার একটা অধিকার এসেছিল। আমার ছবি সেই বয়সেই শিক্ষক মশায়দের এবং অন্য বহু লোকের প্রশংসালাভ করেছিল। এমন কি আমার আঁকা শ্রীকৃষ্ণের একখানা ছবিকে বাঁধিয়ে টাঙ্গিয়েও রাখা হয়। সেই আমার অংকণপটুতার প্রথম স্বীকৃতিলাভ।

আমার যখন মাত্র বারো বছর বয়স সেই সময় মেজদা আমাকে তাঁর বক্স ক্যামেরাটি দিয়েছিলেন। তারপর কলেজে ঢুকে একটা ভালো ক্যামেরা কিনে সখের ফটোগ্রাফি আরম্ভ করি। আমার তোলা ফটো সর্বত্র প্রচুর প্রশংসা পেতে থাকে। তখন ছবি তোলাকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে মনস্থ করি। এই বিষয়ে প্রচুর উৎসাহবোধ করতাম। সর্বদাই মনে হতো যেন এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে ঐ পথে চালিত করছে। কোন আর্ট স্কুলের ছাত্র না হয়েও আমি রং ও তুলির ব্যবহারে দক্ষতালাভ করেছিলাম।

আমি ছিলাম মেজদার আবাল্যসঙ্গী। তাঁর সংস্কৃত শিক্ষক শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি ‘ক্রিয়াযোগ’ সাধন পদ্ধতি শিক্ষা করি। মেজদার সঙ্গে যখন শ্রীরামপুরে যাতায়াত করতাম তখন সেখানেও শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছে ‘ক্রিয়া’ দীক্ষা গ্রহণ করি। কলকাতায় বাড়ীতে বসে সেই যোগভ্যাস করতাম। দীর্ঘকাল পরে মেজদা যখন আমেরিকায় এবং বাবারও মৃত্যু হয়েছে, সেই সময় আমি পুরীধামে গিয়ে লাহিড়ী মহাশয়ের শেষ জীবিত শিষ্য শ্রীভূপেন্দ্র নাথ সান্যাল মহাশয়ের কাছ থেকে উন্নত স্তরের ক্রিয়াযোগে দীক্ষা গ্রহণ করি।

মেজদার নানা ভঙ্গীমার শত শত ছবি আমি এঁকেছি এবং সেগুলি পৃথিবীর নানা দেশে বিভিন্ন এস্. আর. এফ্ সেণ্টারে রাখা আছে। ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসিফিক্ প্যালিসেডের সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপের লেক্ স্রাইনের মহাত্মা গান্ধী ওয়ালর্ড পিস্ মিম্যারিয়ালের উৎসর্গ অনুষ্ঠানে প্রদর্শনের জন্য মেজদা যখন আমার আঁকা মহাত্মা গান্ধীর তৈলচিত্রটিকে মনোনীত করেন, তখন বাস্তবিকই অন্তরে আনন্দ ও গর্ববোধ করেছিলাম। সেই প্রাকারহীন উন্মুক্ত মন্দিরে মহাত্মা গান্ধীজীর চিতাভস্মের কিছুটা অংশ রাখা আছে। বর্তমানে চিত্রটি ক্যালিফোর্নিয়ার হলিউডে অবস্থিত সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপ আশ্রম সেণ্টারের ‘ইণ্ডিয়া হলে’ টাঙ্গানো আছে।

উত্তরকালে দণ্ডায়মান অবস্থায় আমার আঁকা রবীন্দ্রনাথের একখানি ছবি শুধু ভারতেই নয়, বিদেশেও উচ্চখ্যাতি অর্জন করেছিল। মহাকবি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাকে একখানি প্রশংসাপত্র পাঠিয়েছিলেন। আজও আমার আঁকায় বিরাম নেই। আমার ঐকান্তিক বাসনা যেন চিত্রের মাধ্যমে মেজদার উপদেশ ও বাণীকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে পারি। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সেই কাজে নিযুক্ত থাকবো।

আমার নিজের পরিবার বলতে এখন আছে আমার স্ত্রী, মধ্যম ও একটিমাত্র পুত্র শ্রীমান্ হরেকৃষ্ণ ঘোষ, একমাত্র কন্যা শ্রীমতি শেফালী মুখার্জী এবং পৌত্র শ্রীমান সোমনাথ ঘোষ। আমার প্রথম পুত্র শিশুকালেই মারা যায়। আমার তৃতীয় পুত্র শ্যামসুন্দর ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামায় গুলির আঘাতে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে প্রাণ হারায়।

থামু

থামুর জন্ম লাহোরে। সে আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট। মা যখন মারা যান তখন আমার বয়স পাঁচ আর থামুর দুই। ছোটবেলা থেকেই ঘর-সংসারের কাজে তার একটা স্বাভাবিক দক্ষতা দেখা গিয়েছিল। যখন তার মাত্র বারো বছর বয়স, সেই সময় থেকে সে বাবার এক ক্ষুদে সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করতো। খুব হিসেবী বলে সংসার খরচের যাবতীয় হিসেব সেই রাখতো। বাবার অফিসের পোষাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং তাঁর অন্যান্য কাজে সাহায্য করা তার নিত্যকারের কাজ ছিল। ঐ ছোট্ট শান্ত মানুষটি বাড়ীর সকলের সেবা ও যত্ন করতো।

শ্রীরামপুরের অরিন্দম সরকারের সঙ্গে থামুর বিবাহ হয়। অরিন্দম এম. এস্. সি. পাশ—চাকরী করতো বেঙ্গল নাগপুর রেলে। কঠিন পরিশ্রম করে সে এজেন্টের পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টেন্ট হয়েছিল। তাদের এক পুত্র ও চার কন্যা। অরিন্দম খুব পরোপকারী ছিল এবং অন্যের চাকরী করে দেওয়ার ব্যাপারে সব সময় সাহায্য করতো। দুর্ভাগ্যক্রমে চাকরীতে আরও উন্নতি হবার মুখে হঠাৎ হৃদ্‌রোগে সে মারা যায়। তাদের ছেলেটি তখন কলেজে বি. এ. পড়ছে। পরিবারের সবাই আশা করেছিল পাশ করে সে বাবার সাহায্যে বি. এন্. রেলে একটা চাকরী পেয়ে যাবে। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরকম—তাই অরিন্দম হঠাৎ মারা গেল। থামু এখনও বেঁচে আছে, তবে তার স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়।*

বিষ্ণু

বিষ্ণু যখন দশমাসের তখন মা মারা যান। মা'র দুধ ও সেবাযত্ন পায়নি বলে ছোট থেকেই সে খুব রুগ্ন ও দুর্বল ছিল। মেজদা যখন রাঁচীতে প্রথম ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গা বলে ওকে সেখানে নিয়ে যান। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রথম গ্রুপের সে ছিল অন্যতম একজন ছাত্র। মেজদার কাছেই বিষ্ণু প্রথম যোগ ব্যায়াম শিক্ষা করে ও রোগমুক্ত হয়। তারপর কলকাতায় এসে সে হিন্দু স্কুলে ভর্তি হয়।

আমার স্বাস্থ্য বেশ ভালই ছিল এবং আমি নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চাও করতাম। আমার উৎসাহে বিষ্ণু ব্যায়াম শিক্ষা করতে থাকে এবং আমিই তাকে ব্যায়াম করা শেখাই। ক্রমশঃ একাগ্রতা এবং পরিশ্রম দ্বারা চমৎকার শরীর গঠন

করে। বি. এস্. সি. পাশ করার পর বিষ্ণু আইন পরীক্ষাও পাশ করে। কিছুদিন সে আইন প্র্যাক্টিশ করেছিল। কিন্তু শরীর চর্চা এবং 'হঠযোগে'র প্রতিই তার বেশী আকর্ষণ ছিল ; তাই ঐ পথটাকেই সে জীবনের সাধনা হিসেবে বেছে নেয়। সে একটা শরীর চর্চার স্কুল খোলে এবং অনেক তরুণ তাতে যোগদান করে। কিছুদিনের মধ্যেই তার এবং ছাত্রদের সুনাম ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে পড়ে। তারা আমেরিকা ও য়ুরোপ ভ্রমণ করে যোগ ব্যায়ামের কৌশল প্রদর্শন করেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। আমেরিকায় থাকার সময় বিষ্ণু সেখানকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছিল। তাছাড়া লণ্ডনের 'মিঃ ইউনিভার্স' প্রতিযোগিতায় সে অন্যতম বিচারক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল। ভারতবর্ষ থেকে সেই প্রথম এবং একমাত্র লোক যে এই সম্মান লাভ করেছে। পরে কোলকাতায় নিজের বাড়ীতে 'ঘোষ কলেজ অফ্ ফিজিক্যাল্ এডুকেশন' (Ghosh College of Physical Education) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে। ভারতবর্ষের বিখ্যাত ধনকুবের শ্রী যুগলকিশোর বিড়লাজী ভারতের তরুণদের জন্য তার কাজে ভীষণ সন্তুষ্ট হয়ে বালীগঞ্জে একখণ্ড জমি কিনে একটি বৃহৎ ব্যায়ামাগার তৈরী করে দেন। এর নাম 'বজ্‌রংগ ব্যায়ামাগার'*। এখনও পর্য্যন্ত আমি সেখানকার অন্যতম ট্রাস্টি।

একবার কিছু জাপানী ট্যুরিস্ট বিষ্ণুর ব্যায়াম কৌশল দেখে এতই মুগ্ধ হয়েছিল যে, তারাও জাপানে 'হঠযোগে'র একটা কেন্দ্র গড়ে তোলে। সেদেশে এখন যোগ ব্যায়াম খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিষ্ণুর ছোট মেয়ে করুণা বর্তমানে জাপানে কয়েকটা শরীরচর্চা কেন্দ্র চালাচ্ছে।

আমাদের গড়পারের বাড়ীতেই শ্রী রসিকলাল রায়ের কন্যা আশালতা রায়ের সঙ্গে বিষ্ণুর বিয়ে হয়। তাদের একটি ছেলে বিশ্বনাথ ও দুটি মেয়ে আভা এবং করুণা। বিশ্বনাথ ছিল বিষ্ণুর একজন সেরা ছাত্র। ব্যায়াম প্রদর্শন করার জন্য প্রায়ই সে নিজের দলবল নিয়ে জাপানে যেতো। একবার এক ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় গোল্ড কাপ জিতে নিজের এবং ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯৭০ সালের ৯ই জুলাই বিষ্ণু হঠাৎ মারা যায়। নিজের ছেলের এতবড় কৃতিত্বের কথা সে জানতে পারেনি।

আজকাল ভারতবর্ষে সাধারণ লোকের মধ্যে বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে যোগ ব্যায়াম শিক্ষা করার যে বিপুল উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে, তার মূলে বিষ্ণুর অবদান অনেকখানি। তার অগণিত শিষ্যের মধ্য দিয়ে সে এখনও আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে।

* বিশাল শক্তি এবং রামচন্দ্রের ভক্তরূপে খ্যাত হনুমান্‌জীর আর এক নাম হলো বজরংগ। ইন্দ্রের অস্ত্র 'বজ্র' কথা থেকে এই নামটির উৎপত্তি, যার অর্থ হলো হনুমান ছিল বজ্রের মত শক্তিশালী। (প্রকাশকের মন্তব্য)

বিভিন্ন ডায়েরী থেকে পাওয়া মেজদার কিছু কাহিনী

আমার পত্নী পারুলের ডায়েরী থেকে:

পারুল তার ডায়েরীতে লিখছে: "১৯২০ সালে তিনি (পরমহংস যোগানন্দ) প্রথম আমেরিকায় গেছিলেন। যাবার দিন অন্য সকলের সঙ্গে আমিও প্রণাম করলুম। আশীর্বাদ করে বললেন, 'মা, গতবারের ছেলেটি গেছে তার জন্যে দুঃখ কোরো না। এবারও তোমার একটি ছেলে হবে মা। খুব তাড়াতাড়ি হবে। এ বেঁচে থাকবে, তবে আঁতুড় ঘরেই ওকে 'শান্তি তাগাটি' পরিয়ে দিও। ষোল বছরের মধ্যে যেন খুলোনা।"

ঠিক ষোল বছর পরেই মেজদা আমেরিকা থেকে ফিরেছিলেন এবং নিজের হাতেই শান্তি তাগাটি খুলে দিয়েছিলেন।

আমার প্রথম সন্তান জন্ম থেকেই মাতৃস্তন পায়নি, কারণ আমার স্ত্রী ওর জন্মের পর থেকে বেশ কিছুদিন পর্য্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। তাই জন্মাবধিই সে রুগ্ন ছিল এবং দ্বিতীয় জন্মদিন আসার আগেই তার মৃত্যু হয়। সেই সময় মেজদা তাঁর রাঁচী ব্রহ্মচর্য স্কুলে ছিলেন। আমি, আমার স্ত্রী, আমার শ্বশুর মশাই— প্রত্যেকে আলাদা আলাদা চিঠিতে ছেলেটির জন্য প্রার্থনা করতে মেজদাকে অনুরোধ জানাই। কিন্তু তিনি কারোর চিঠির জবাব দিতেন না। তারপর ওর মৃত্যু সংবাদ জানাতে তিনি লিখেছিলেন: "আমাদের বৌমা (আমার স্ত্রী) এবং তোমাদের ছেলের সব কিছুই আমার জানা ছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলুম ভগবান ওকে রাখবেন না। তাই যখনই তুমি বা তোমরা আমাকে ওর কথা লিখতে—আমি কোন উত্তর দিতুম না। আমি চাইনি আগে থেকেই তোমাদের শোকসন্তপ্ত করে তুলি।"

এ সম্বন্ধে পরে মেজদাকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বলেছিলেন: "একদিন সকালের দিকে উঠোনের চৌবাচ্চার জলে স্নান করছি। বড় বৌদি এসে বললেন, 'ঠাকুরপো, তুমি যে জ্যাঠামশাই হবে এবার।' কিছু বুঝতে না পেরে ভ্রূ কুঁচকে বলেছিলুম 'তার মানে?' 'মানে আবার কি গো—গোরার যে শীঘ্রই ছেলে হবে।'—বৌদি বললেন।

মেজদা বললেন, "সে কথা শুনে আমার চোখের সামনে সিনেমার মতন মৃত শিশুর একটা ছবি ফুটে উঠলো। বললাম, 'বেশী দিনের জন্য নয়।' বৌদি ধমকে বললেন, 'কী সব অলুক্ষণে কথা বলছো তুমি? এখনো জন্মালোই না।' বলেছিলুম, 'তুমি দেখে নিও।'

থামুর ডায়েরী থেকে:

আমাদের পরিবারের ছোটরা সবাই মেজদাকে খুব ভালবাসতো। বিশেষ করে ছোট বোন থামু অর্থাৎ পূর্ণময়ীর মেজদার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল অসীম।

মেজদাও তাকে খুবই স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। থামু তার ডায়েরীর এক জায়গায় লিখেছে: বাড়ীর অন্যান্যদের সামনে মেজদা আমাকে থামু বলে ডাকলেও, আড়ালে আমাকে স্নেহভরে 'মাথু' বলেই ডাকতেন।

থামু তার ডায়েরীতে লিখেছে: "একবার আমার খুব জ্বর হয়েছিল। সারা গায়ে ব্যথা। মাথার অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছিলুম। বাবা চিন্তিত হয়ে পড়বেন ভেবে তাঁকে কিছুই জানাইনি। অন্যদিনের মত সেদিনও বাবার অফিসের পোষাক পরিষ্কার করে ঠিক্‌ জায়গায় রেখেছি। তাঁর প্রয়োজনীয় সব জিনিষ হাতের কাছে এগিয়েও দিয়েছি। ঠিক্‌ সময়ে বাবাকে অফিসে রওনা করিয়ে দিয়ে আমি কোনরকমে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে বুকের উপর দু' হাত জোড় করে ভগবানকে বললুম, 'হে ঠাকুর, আমার সব কষ্ট দূর করে দাও। মাথার যন্ত্রণা সব ভাল করে দাও। আমার জন্যে বাবাকে যেন চিন্তায় পড়তে না হয়।'

"কিছুক্ষণ পরে পায়ের শব্দে বুঝতে পারলুম মেজদা নীচে নামছেন। এক ঝলক উঁকি দিলেন আমার ঘরে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে করতে কখন যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলুম, খেয়াল নেই। হঠাৎ মনে হলো—কে যেন আমার মাথায় হাত বুলোচ্ছে। চেয়ে দেখি—মেজদা মাথার কাছে দাঁড়িয়ে।

"বললুম, এই না তুমি বাইরে গেলে? কখন এলে?"

"মেজদা বললেন, তোমার যে খুব কষ্ট হচ্ছে। তুমি তো ঠাকুরের কাছে বলছিলে—আমার সব কষ্ট দূর করে দাও, বাবাকে যেন চিন্তায় না পড়তে হয়। তাইতো আমি ফিরে এলুম। আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, তুমি ঘুমোও।"

"মেজদার স্পর্শ খুব ভালো লাগছিল। বুঝতে পারলুম আমার সব কষ্ট আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাচ্ছে। চোখ জুড়ে ঘুম আসছে। তারপর ঘুম ভাঙতে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি একটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম—কী আশ্চর্য্য! আমার কোন কষ্ট নেই! আমি সুস্থ।"

থামুর ডায়েরীর আর এক জায়গায় লেখা আছে:

"একদিন বড়দি (রমা), সেজদি (নলিনী), বড় বৌদি (অনন্তর স্ত্রী) আর আমি বসে আছি। মেজদা আমাদের ভগবানের কথা শোনাচ্ছেন। হঠাৎ তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার আর বেশী দেরী নেই।' শুনে সকলে তো অবাক্‌। আমি ভাবলুম তবে কি আমার মরণ এগিয়ে এসেছে?"

"মেজদা আমার মনের চিন্তা ধরতে পেরেছিলেন। হো হো করে হেসে উঠলেন। পিঠে স্নেহ আদরের আলতো চাপড় দিয়ে বললেন, 'তুমি যা ভাবছো তা নয়গো মেয়ে। তুমি খুব তাড়াতাড়ি শ্বশুরবাড়ীর ঘর গুছোতে চলেছ।'। আমার তখন বিয়ের কোনো কথা হয়নি। তাই মেজদার কথা শুনে লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে উঠলো। বড় বৌদি, বড়দি, সেজদি সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'খুব তাড়াতাড়ি তো বুঝলুম, তবু কত দিনের মধ্যে?' মেজদা সে' কথার কোন উত্তর দিলেন না। নিজের বিয়ের কথা শুনলে বা জানতে পারলে সব মেয়েরই রোমাঞ্চ জাগে। আমার মনেও নিশ্চয়ই

সে'রকম কিছু হয়েছিল। মেজদার কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য দিন গুণতে শুরু করেছিলুম। দু'মাসের মাথায় আমার বিয়ে হয়ে গেল।"

মেজদার প্রতি তার ভক্তির কথা বলতে গিয়ে থামু লিখেছে:

"আমাদের ৪নং গড়পার রোডের তেতলার ছোট ঘরটিতে মেজদা সাধনা করতেন। একদিন সন্ধ্যার দিকে মেজদা আমাকে তাঁর সাধনার ঘরে ডেকে নিয়ে যান। সেখানে তিনি আমাকে শ্রীভগবানের নামজপ করতে শেখান এবং অদ্ভুত এক জ্যোতি দর্শন করান। সেই থেকেই আমার ঈশ্বর-প্রীতি শুরু হয়। দাদার প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা ছাড়াও যোগানন্দজীকে তখন থেকে অত্যন্ত ভক্তি করতেও শুরু করি। সে সময় আমার বয়স ছিল মাত্র দশ বছর।"

ডায়েরীর অন্যত্র এক জায়গায় থামু লিখেছে:

"আমার খুব সুন্দর একরাশ চুল ছিল। একদিন যোগানন্দজী আমার মাথার চুল নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, 'বাঃ, তোমার চুল বড় সুন্দর হয়েছে। আচ্ছা ধরো, তোমার এই সুন্দর চুল সব যদি আমি কেটেদি, তাহলে তোমার খুব দুঃখ হবে?' মনে আছে বলেছিলুম—কিচ্ছু না। আবার তো মাথা ভর্তি চুল গজিয়ে উঠবে। যোগানন্দজী জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার চুলের একগোছা তুমি নিজে ছিঁড়ে ফেলতে পারো? বলেছিলুম, 'হ্যাঁ পারি।' এরপর ছেঁড়ার জন্য একগোছা চুল আঙুলে জড়িয়ে যথাশক্তিতে টেনেছিলুম।

"যোগানন্দজী বললেন, 'থাক্, থাক্। তোমাকে দিয়েই আমার কাজ হবে।'"

মেজদার অসামান্য মানসিক শক্তির কিছুটা পরিচয় আমার মত থামুও পেয়েছিল। কারণ সে লিখছে:

"একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে যোগানন্দজী আমাকে তাঁর সাধনার ঘরে নিয়ে গেলেন। দেখলুম সেখানে জীতেনদা আর বাসুদা রয়েছেন। ওঁরা যোগানন্দজীর একধারে বন্ধু এবং ভক্ত। যোগানন্দজী আমাকে কাছে বসিয়ে সস্নেহে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। জানিনা কখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলুম। তিনি আমাকে, আমাদের বাড়ীর ঠিক উল্টোদিকে মূক ও বধির বিদ্যালয়ের মাঠে যারা ফুটবল খেলছিল তাদের নাম জিজ্ঞাসা করলেন; তাদের বাড়ীর ঠিকানাও জানতে চাইলেন। পরে শুনেছি সব কিছু একেবারে ঠিক্ ঠিক্ বলেছিলুম।"

আর এক পাতায় লেখা আছে:

"একবার ঐ স্কুলের মাঠে একজন ছেলে তার গায়ের দামী কোটটি খুলে একটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে খেলছিল। অন্য একজন ছেলে সুযোগ বুঝে সেটি নিয়ে সরে পড়ে। আগের ছেলেটি যোগানন্দজীর কাছে এসে সব বলাতে তিনি আমাকে দিয়ে কোটটি কোথায় পাওয়া যাবে জেনে নিয়েছিলেন। আমি নাকি বলেছিলুম ৭নং গড়পার রোডের বাড়ীতে সেটি পাওয়া যাবে এবং সত্য সত্যই নাকি কোটটি সেই বাড়ী থেকেই বেরিয়েছিল।"

বড়দির ডায়েরী থেকে

"আমি ছোটবেলা থেকেই মা কালী, মা কালী করতুম। আর কোনো ঠাকুর জানতাম না বা পূজা করতুম না। সাধক মহাত্মা শ্রীরামপ্রসাদের সঙ্গীত, অধুনা যাকে সকলে কালী কীর্তন আখ্যা দিয়েছে—সেই গানের একখানি বই বাবার ছিল। দুপুরে মা শোবার আগে সেই বইখানি মাথার গোড়ায় রাখতেন আর এক একটি করে গান গাইতেন। তারপর মা ঘুমোলে আমি চুপি চুপি পড়তুম। ঐ বই পড়ার ফলে মা কালীর প্রতি অনুরাগ আমার দিন দিন বেড়ে চলছিল বোধ হয়। আমার বয়স সে'সময় ছয় কি সাত। তখন থেকেই অন্ধকার ঘরে বসে ধ্যান করতুম।

"যে ঘটনার কথা বলছি সেই সময় আমার মেজভাই মুকুন্দের (স্বামী যোগানন্দ গিরি) বয়স ছিল দেড় বছর। তখনই তার বেশ কথা ফুটেছে। সর্বদা কি জানি কেন আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো, আর আমার বড় অনুগতও ছিল। মাকে বাদ দিলে বাড়ীর মধ্যে আমাকে আর বাবাকেই বেশী ভালবাসতো। আমি যখন রামপ্রসাদের কালীকীর্তন গাইতাম, তখন সে গম্ভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে শুনতো। আমি তখন জানতুমই না যে, তার ভক্তিউর্বরা হৃদয়-ক্ষেত্রে মা ভগবতীর প্রতি ভক্তিভাবের বীজটিকে আমিই বপন করে দিচ্ছি।

"সেদিন ছিল রবিবার, গরমকাল। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ঠাণ্ডা বলে বাবা নীচের বৈঠকখানা ঘরে শুতেন। সেদিন কিছুক্ষণ বাদে ঘুম থেকে উঠে বাড়ীর ভেতরে এসে দেখেন—মুকুন দোতলায় উঠবার কাছে সিঁড়িতে বসে পা ঝুলিয়ে একাগ্র মনে মাথা হেঁট করে উচ্চৈঃস্বরে কালী কালী বলে গান করছে। তাই দেখে বাবা অবাক্ হয়ে মাকে ডেকে বল্লেন, 'দেখো, দেখো—মুকুনকে দ্যাখো! কোথা থেকে ও শিখলে এই নাম?' বাবা মা দু'জনেই কিছুক্ষণ একভাবে মুকুনের পানে চেয়ে রইলেন। বাবা মাকে বারণ করে বললেন, 'ওর ঐ একাগ্রতা ভেঙ্গনা।' তারপর নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করতে লাগলেন, 'ও কি করে কালীনাম শিখলো? আমরা তো কৃষ্ণনাম কীর্তন করি, তবে ওকে কে কালীকীর্তন শেখালো?' যাই হোক্ এরপর তারা যে যার নিজের কাজে চলে গেলেন। আমি তো এদিকে ভয়ে অস্থির। লুকিয়ে লুকিয়ে মুকুনের সব ব্যাপার দেখতে লাগলুম। আর মনে মনে কান নাক মললুম—মুকুন সঙ্গে থাকলে আর কখনও গান করব না।"

শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ কথিত

জ্ঞানামৃত

[মেজদার দেওয়া নানাবিধ উপদেশ আমি লিপিবদ্ধ করে রাখতাম। তাঁর সেই অমূল্য উপদেশের কিছু অংশ এখানে নিবেদিত হলো।]

"নিষ্কাম কর্ম" কাহাকে বলে ?

ধ্যানকালে 'মূলাধার' থেকে 'আজ্ঞাচক্র' পর্যন্ত যে 'ক্রিয়া' করা হয়, তাহাকেই 'নিষ্কাম কর্ম' বলে। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধির দ্বারা আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। আত্মজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মানন্দলাভের কোন সম্ভাবনা নাই।

মানুষের কর্মে অধিকার আছে, কিন্তু কর্মফলে কোনো অধিকার নেই।* ফল কামনা বর্জিত হয়ে অর্থাৎ নিষ্কাম হয়ে কর্ম করে যেতে হবে।

'নিষ্কাম কর্মযোগে'র অপর নাম 'বুদ্ধিযোগ'। বৈষয়িক ব্যাপারে বুদ্ধিপূর্বক কোন কাজ না করলে যেমন তা সু-সম্পন্ন হয় না, সাধনাতেও ঠিক সেইরকম বুদ্ধিযোগ পূর্বক ক্রিয়া না করলে ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় না। কামনাপরায়ণেরা চিরকাল কামনার বোঝা বয়েই মরে। এই বোঝা হলো উৎকণ্ঠা বুদ্ধি আর হতাশা। অতএব বুদ্ধিযুক্ত কর্মকৌশলই হলো প্রকৃত যোগ।

একাগ্রচিত্তে বিন্দু ধরে থাকলেই মনের ওপর আধিপত্য জন্মায়। দেহ ও ইন্দ্রিয়গত বাধা আপনা-আপনি ক্ষয় হয়। বুদ্ধি 'সহস্রা'র সেই বিন্দু মধ্যে স্থির হলে বিশ্বজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে ব্রহ্মময় ভাবপ্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থার নাম 'নির্বিকল্প সমাধি'। সে সময় অহং-জ্ঞান দূর হয়ে যায় বলে এবং ভোক্তা না থাকায় ইহজন্মের বা প্রারব্ধ সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মসকল ইহলোকেই নষ্ট হয়ে যায়।

জীবের 'আমি', 'মহান্ আমাতে' মিশলে এক বই দুই থাকে না। তখন ভূত-ভবিষ্যৎ জ্ঞান থাকে না—কি দিয়া কি শুনিবে। বুদ্ধি পরমাত্মায় নিশ্চলা অভ্যাস ও পটুতাবশতঃ সমাধিতে যখন স্থির থাকবে তখন তুমি 'তত্ত্ব-জ্ঞান' প্রাপ্ত হবে। 'সমাধি'র মাধ্যমে যোগি যখন বাহ্য বিষয়ে কামনা বাসনা ও মোহশূন্য হবে, তখন জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থাতেই তার মধ্যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ বুদ্ধি উদিত হবে।

* "কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি।"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২—৪৭

জীবন্মুক্ত অবস্থা

"দুঃখে স্থির, সুখেতেও স্পৃহাশূন্য যিনি, যিনি রাগ, ভয়, ক্রোধহীন—তাহাকেই স্থিতপ্রাজ্ঞ বলে।" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২-৫৬) স্থিতপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি সাংসারিক বিষয়ে থাকেন না। সুতরাং কর্মজনিত দুঃখে উদ্বিগ্ন হন্ না। তিনি সুখেরও ইচ্ছা করেন না। তাঁহার মন বিশ্বব্যাপি পরমাত্মাতে লীন থাকায় তিনি 'মুনি' অর্থাৎ মনকে অন্তঃবৃত্তিশীল করিয়াছেন। তাঁহার চিত্ত আনন্দ ব্রহ্মরূপে সকলকেই দর্শন করে। তাঁহার অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? এই অবস্থাকেই 'জীবন্মুক্ত' অবস্থা বলে।

'জীবন্মুক্ত' যিনি তিনি জন্ম ও মৃত্যুতে অবিচল থাকেন। সাধারণ অজ্ঞ লোকের ন্যায় তিনি ঐশ্বর্যাদি প্রাপ্তিতে সুখীও হন্ না কিংবা দুঃখে বিষাদ প্রকাশও করেন না। সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ প্রভৃতি যে কোন অবস্থা তাঁর ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

আত্মাতে রতি করতে ইচ্ছা হলে মনকে অন্তর্বৃত্তিশীল করতে হয়। বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গুলিকে গুটিয়ে এনে অন্তরের দিকে চালিয়ে দিলে এক অপরূপ রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের অনুভূতি জাগে। তাতেই ভক্ত সমূহের জ্ঞান জন্মায়। নিম্নস্থ পাঁচটি চক্রে এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের এক একটি ইন্দ্রিয়ের বিশিষ্ট প্রকাশ এক একপ্রকার শব্দের দ্বারা অনুভূত হয়। যখন শক্তি ও চেতনাকে মেরুদণ্ডে গুটিয়ে এনে চক্রগুলি ভেদ করে উর্ধমুখী করা হয়, তখন এক একটি ইন্দ্রিয়-ক্ষমতা পরবর্তী উচ্চতর ইন্দ্রিয় শক্তির সঙ্গে মিশে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত 'নাদ' বা 'ওম'কারে পরিণত হয়। তখন চিত্ত সেই শব্দে আকৃষ্ট হয়ে 'পরমাত্মায়' সমাহিত হয়। চিত্তের বর্হির্বৃত্তিশীলতা নষ্ট হলেই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন পেঁচকাদি জন্তুগণ কেবল রাত্রিকালেই দেখিতে পায় কিন্তু দিবাভাগে দেখিতে পায় না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ চক্ষু উন্মীলন করিয়া থাকিলেও তাহাদের দৃষ্টি কেবল ব্রহ্মেই থাকে, বিষয়ে থাকে না। তখন তার কাছে জলে বিষ্ণু স্থলে বিষ্ণু—বিষ্ণুময়ং জগৎ। আত্মাতেই সমস্ত বিরাজ করছে, আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নেই। ইহাই 'আত্মজ্ঞ' পুরুষের চরম সিদ্ধান্ত ও স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ। একেই বলে 'জীবন্মুক্ত' অবস্থা।

বিষয় আসক্তি

"ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২—৬২, ৬৩

অর্থাৎ "বিষয় ধ্যান করলে পুরুষের সেই বিষয়ে আসক্তি জন্মায়। আসক্তি থেকে কাম এবং কাম থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ থেকে মোহ আসে এবং

মোহ হলে স্মৃতি লোপ হয়। স্মৃতি লোপ হলে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধি নাশ হলে স্বয়ং বিনষ্ট হয়।"

যখন অন্তরাকাশ বিষয়-মেঘে ঢাকা থাকে তখন চৈতন্যকে আলোকিত করার জন্য সেখানে জ্ঞানের জ্যোতিপ্রকাশ হয় না।

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ

'প্রাণে' মন দেওয়া বা 'প্রাণায়ামে'র নামই "কর্মযোগ" এবং ধ্যান সাধনার সাহায্যে 'মনে' মন দেওয়ার নাম 'জ্ঞানযোগ'। সুতরাং 'প্রাণে' মন দেওয়া হলেই 'ক্রিয়া' করা হয়। আভ্যন্তরীণ 'কর্মযোগ' বা ভগবৎসাযুজ্য লাভের জন্য 'প্রাণায়াম' করাই হলো 'ক্রিয়াযোগ'। গুরুর উপদেশে সুষুম্না মার্গে ষট্‌চক্রে আত্মমন্ত্র বিন্যাস করলেই অর্থাৎ ক্রিয়া করলেই প্রাণে মন দেওয়া হয়। প্রাণ ঐ চক্র সকল ভেদ করে সুষুম্নাতে স্থিত হয়।

আর আজ্ঞায় মন স্থির করে 'সহস্রা'রস্থ নাদ বিন্দু লক্ষ্য করে 'শ্রবণ', 'মনন' ও 'নিদিধ্যাসন' দ্বারা 'তত্ত্ব' নির্ণয় করলে 'মনে' মন দেওয়া হয় (জ্ঞান যোগ)।

যখন যোগি আজ্ঞা চক্র ভেদ করে 'নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মপদে' লক্ষ্য স্থির করলেন তখনই তাঁর 'নিষ্কামতা' প্রারম্ভ হলো। যতক্ষণ প্রাণের চালনা আছে ততক্ষণ কর্মও আছে। কিন্তু যখন যোগি 'সমাধি' অবস্থায় সেই 'পরমপদে'র আশ্রয়-লাভ করতে পারলেন, তখন তাঁর ঐ যে প্রাণ চালনা রূপ কর্ম ছিল তা একেবারে দূর হয়ে গেল। তখন তিনি 'নিষ্কর্ম সিদ্ধি' পেয়ে গেলেন।

'ক্রিয়া' করতে করতে মন যখন অন্তরস্থিত 'নাদ'ধ্বনি শুনে মোহিত হয়, তখন 'সহস্রা'র থেকে সুধাক্ষরণ হতে থাকে। সেই সুধা 'প্রাণ'কে ইন্দ্রিয় থেকে আকর্ষণ করে মেরুদণ্ডের 'চক্র' ভেদ করে 'বৈশ্বানরে' ক্ষেপণ করতে হয় (খেচরী মুদ্রা)। সমস্ত দেহ আধ্যাত্মিক শ্রীমণ্ডিত ও শক্তিমণ্ডিত হয়। শুধু তাই নয় যিনি এইরূপ করতে পারেন তাঁর শরীর লাবণ্যময় হয় ও জ্যোতি ফুটে ওঠে।

যোগী কোনো নির্জন স্থানে বসে নিজ হস্তদুটির সাহায্যে কর্ণদ্বয় বন্ধ করে 'প্রাণায়াম' অভ্যাস করবেন। সাধকের চৈতন্য মেরুদণ্ড ধরে যতই ঊর্ধ্বমুখী হবে ততই তিনি দক্ষিণ কর্ণে নানাপ্রকার শব্দ শ্রবণ করবেন। সর্বাগ্রে 'মূলাধারে' ঝিল্লিরব, তারপরে 'স্বাধিষ্ঠানে' বংশীধ্বনি, এবং "মণিপুর" চক্রে হার্পের বাজনার মত শব্দ তাঁর শ্রুতিগোচর হবে। সাধক যখন চেতনাকে 'অনাহত' চক্রে নিয়ে যেতে সক্ষম হবেন তখন 'ঘণ্টাধ্বনি'র মত ধ্বনি শুনতে পাবেন। সেই অবস্থায় তাঁর উন্নত আধ্যাত্মিক জাগরণের সূচনা। সেই শব্দে মন সংহত করলে ভক্ত আরও উচ্চতর চক্র-নির্গত ধ্বনি শুনতে শুনতে শেষ পর্য্যন্ত পবিত্র ওঁকার ধ্বনি শুনতে পাবে। সাধক আরও গভীর তপস্যায় নিমগ্ন হলে পর 'কূটস্থে' অথবা হৃদয়ের দ্বাদশদল পদ্মের মধ্যস্থলে (অনাহত চক্র) দিব্য জ্যোতিদর্শন করবেন। সেই জ্যোতিই 'পরম ব্রহ্ম'। যোগীর চিত্ত সেই ব্রহ্মে সংযোজিত হলে পর ব্রহ্মরূপী হরির পরমপদে লয় প্রাপ্ত হয়ে যায়।

কার্য্য ও কর্ম

মন যখন দর্শন, কামনা ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সহযোগে বিষয়ে যায়, তখন যে রূপে প্রাণপ্রবাহ হয় তাহাই কার্য্য। আর মন যখন বিষয় ছেড়ে আত্মার দিকে যায় তখন যে রকম প্রাণের গতি হয় তাহাই 'কর্ম'। 'কার্য্য' বাইরের; 'কর্ম' ভিতরের কাজ।

'কর্ম'কে সঠিকভাবে বোঝাবার জন্য তাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়, যথা 'কর্ম', 'বিকর্ম' ও 'অকর্ম'।

১। 'কর্ম'—যে রকম করে শ্বাস ত্যাগ করলে জীবভাবের ক্রমশঃ উন্নতি বা বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ জীবভাবকে শিবভাবে স্থাপিত করে, তাহারই নাম কর্ম। অর্থাৎ যে রকম প্রাণচালনে 'জীবাত্মা' 'পরমাত্মায়' মিলিত হয় তাকেই কর্ম বলে।

২। 'বিকর্ম'—যে কর্মের জন্য জীবকে সংসারে আসতে হয়, শরীর ধারণ করতে হয়, বিষয়ে নামতে হয়—তাই হলো বিকর্ম। ইহাই পূর্বকৃত সঞ্চিত কর্মের ফলশ্রুতি এবং ইহাই প্রারব্ধ কর্মরূপে জীবকে ফলভোগ প্রদান করে।

৩। 'অকর্ম'—'কর্ম' যখন পরিসমাপ্ত হয় তখন তাকে বলে ''অকর্ম''। এটি হয় যখন 'আমিত্ব' 'আমায়' গিয়ে মেশে। সেই অবস্থায় 'আত্মচৈতন্যে' যে স্থিরভাব আসে তাহাই 'অকর্ম' বা 'নিষ্কর্ম'। অর্থাৎ 'প্রাণ'প্রবাহ যখন ''ইড়া'' এবং 'পিঙ্গলা'র মধ্য দিয়ে 'সুষুম্নায়' স্থিত হয় এবং আত্মা, পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তাকেই 'অকর্মে'র অবস্থা বলে। তখন 'আমি'ও নাই, 'জগত'ও নাই। সবই 'নির্বাণ' অবস্থা।

'কর্ম' সাধককে 'মায়াতীত' করে আত্মায় স্থির করবার চেষ্টা করে। আর 'বিকর্ম' তাকে বিষয়মুখী করে ইন্দ্রিয়াসক্ত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায়। প্রতিদিন নিয়মিত 'ক্রিয়াযোগে'র অভ্যাস দৃঢ় হলে 'বিকর্ম' বেগ ক্রমে ক্ষীণ হয়। 'কর্মে'র শক্তিবৃদ্ধি এবং 'বিকর্মে'র শক্তি যখন দুর্বল হতে থাকে, তখন স্বল্পক্ষণ স্থায়ী 'সমাধি'র অনুভূতি আসে। 'বিকর্ম'কে যতই জয় করা যায় ততই 'সমাধি' অবস্থার সময় বাড়তে থাকে। দীর্ঘক্ষণ 'সমাধি' মগ্ন অবস্থায় থাকতে থাকতে সাধকের অহং-চেতনা লোপ পায় এবং জীবাত্মা পরমাত্মায় স্থিত হয়। এই অবস্থায় সাধক কর্ম করলেও তার কিছুই করা হয় না এবং তাকে 'বিকর্ম' ভোগে অভিভূত হতে হয় না। তিনি 'কর্ম' 'অকর্ম'—দুই-ই সমান দেখেন। কাজে কাজেই তাঁর 'কর্মে' 'অকর্ম' এবং 'অকর্মে' 'কর্ম' দেখা দেয়। ইহাই 'জীবনমুক্ত' অবস্থা। এই 'জ্ঞান' অর্জন করলে 'কর্মে'র পরিসমাপ্তি ঘটে।

মন

ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলের মধ্যে মনই শ্রেষ্ঠ। মন যা সিদ্ধান্ত করে বা যেদিকে যায়, সাধারণ ইন্দ্রিয়গণ সেই দিকেই অনুগমন করে। সুতরাং

যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ মনের বশ তাই মনকে শুদ্ধ করলে পর ইন্দ্রিয়গণও শুদ্ধ হয়ে যায়। মনকে যদি 'মূলাধারাদি' চক্র থেকে উত্থিত করে 'সহস্রা'রে নিয়ে গিয়ে আত্মার সঙ্গে মিলিত করা যায়, তবে মনের ইতরবৃত্তিগুলি আধ্যাত্মিক সত্তামণ্ডিত হয় ; ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির নাশ হয়। শেষে মনের 'আত্ম'মিলনের সঙ্গে সঙ্গে মন ও ইন্দ্রিয় সব আত্মময় বা ব্রহ্মময় হয়ে যায়। এটিই স্বাভাবিক নিয়ম। এ জিনিষ আপনিই হয়—কোনো চেষ্টা করতে হয় না। চেষ্টার মধ্যে কেবল আসক্তিবিহীন হয়ে 'প্রাণ ক্রিয়া' করে যাওয়া।

সর্বজ্ঞানী আত্মার সাথে মিলনের ফলে চিত্তশুদ্ধি হলে পর সাধক অন্তর্বাসী 'জ্ঞানে'র কাছে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যান। চেতনার এই যে সূক্ষ্ম পরিবর্তন যা আত্মাকে সমস্ত জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি এনে দেয়, তা কেবল তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ নির্দেশিত সাধনপথেই পাওয়া যায়। তত্ত্বের স্বরূপ প্রকাশ দ্বারা সাধকের মনকে আকৃষ্ট করার জন্যে তত্ত্বদর্শী পুরুষগণের আবির্ভাব হয়। তখন সাধকের সংশয় দূর হওয়ায় সাধক পূর্ণ জ্ঞানাবস্থায় উপনীত হন্। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন ঃ আমি 'মন' ও 'বুদ্ধি'র অতীত। ভক্ত এই দুটিকে আমাতে মেলাতে পারলেই 'তুমি' আর 'আমি' এক হয়ে যায়। 'কর্ম' দ্বারাই ভক্তি আসে আর ভক্তির দ্বারাই 'জ্ঞান' লাভ হয়।

কূটস্থ

যোগি ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্তী 'কূটস্থে' গভীরভাবে দৃষ্টি সংযোগ করলে পর সেখানে একটি আলোর আবির্ভাব হয়। তার মধ্যস্থলে একটা কালো ছিদ্র লক্ষ্য করা যায় যাকে 'ভ্রামরীগুহা'* বলে। এই গুহার চারদিক উজ্জ্বল ছটা বিশিষ্ট জ্যোতির দ্বারা আবৃত এবং 'আবরণ' ও 'বিক্ষেপ' এই দুই মহাশক্তি দ্বারা রক্ষিত। সাধক ঐ গুহার দিকে দৃষ্টি দিলেই তা অদৃশ্য হয়ে যায় ঃ 'বিক্ষেপ' তার দৃষ্টিকে অন্যাদিকে সরিয়ে দেয় এবং 'আবরণ' সেই দৃষ্টিপথে মায়াজাল প্রসারিত করে দেয়। ব্রহ্মচর্য্য, সাত্ত্বিক আহার, বিষয়ভোগের আসক্তি ত্যাগ, দৃঢ় সহিষ্ণুতা ও প্রাণক্রিয়া বা 'প্রাণায়াম'—এই সকল অভ্যাস দ্বারা শরীরে সাত্ত্বিক তেজের বৃদ্ধি হয়। তখন 'কূটস্থে' অভ্রভেদী দৃষ্টিশক্তি জন্মায়। যোগির ভেতর তখন অন্ধকার ভেদ করার ক্ষমতা জাগে। তখন 'ভ্রামরী' গুহামুখে দৃষ্টিপাত করলেই গুহার মুখ সুবিস্তৃত হয়ে তার

* আক্ষরিক অর্থে মধুপূর্ণ গুহা ; অর্থাৎ 'অমৃতে'র আধার। জগন্মাতা দুর্গার অপর একটি নাম হলো 'ভ্রামরী'। এর অপর একটি অর্থ 'ঘূর্ণমান'—এক্ষেত্রে 'আধ্যাত্মিক নয়নের' কথা বোঝাচ্ছে। এই জ্যোতি গাঢ় বর্ণ ধারণ করে অত্যুজ্জ্বল নীল ও সোনালী বর্ণের সুড়ঙ্গের আকার নেয়, আর তারই মাঝে দেখা দেয় একটি শুভ্র নক্ষত্র। এই উপলব্ধি থেকেই মহাজাগতিক চেতনা জাগ্রত হয়। (প্রকাশকের মন্তব্য)

অভ্যান্তরভাগ দৃষ্টিগোচর হয়। তখন অন্তরাকাশ সহস্রগুণ জ্যোতির্ময় হয় এবং অন্ধকার অংশটি 'কূটস্থ চৈতন্যে'র (খৃস্ট বা কৃষ্ণ চৈতন্য)* গাঢ় অত্যুজ্জ্বল নীল বর্ণ ধারণ করে এবং তারই মাঝখানে মহাজাগতিক চৈতন্যের উজ্জ্বল নক্ষত্রালোক দৃষ্টিমধ্যে আসে। সেইসময় 'আবরণ' ও 'বিক্ষেপ' শক্তি আপনা-আপনি নিস্তেজ হয়ে যায় এবং উভয়ের নাশেই ধর্মের তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়।

যতদিন আমি-ই কর্তা এই জ্ঞান থাকে, যতদিন ঈশ্বরে পূর্ণ আত্মসমর্পণ না হয়, ততদিন ঈশ্বরলাভ হয় না। জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হলে পর ইন্দ্রিয়সকল স্বাভাবিকভাবেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তাদের আর নিগ্রহের প্রয়োজন হয় না।

'ক্রিয়াযোগ' সঠিকভাবে অভ্যাস করলে ভক্তের মনে আনন্দভাব জাগে—হৃদয় তৃপ্তিতে ভরে যায়। ভুল পদ্ধতিতে 'ক্রিয়া'ভ্যাস করলে ভক্তের মনে সন্তুষ্টিতো জাগেই না, বরঞ্চ বিরক্তিতে মন ভরে ওঠে। কিন্তু এ'রকম রাগ ও বিদ্বেষের বশবর্তী হওয়া মোটেই উচিত নয়। কারণ ঐরূপ রাগ ও দ্বেষ যোগীর শত্রু বা বিঘ্নস্বরূপ—ও থাকলে মোক্ষ হয় না। ঐসব অসুবিধায় বিরক্ত না হয়ে ভক্ত আপন কর্তব্য পালন করলে আত্মপ্রীতিলাভ করে। তখন দেহ বা মনের চঞ্চলতা ভক্তের যোগসাধনায় বিঘ্নসৃষ্টি করতে পারে না।

স্বধর্ম ও পরধর্ম

'স্ব' বলতে নিজেকে বোঝায় আর প্রকৃত 'স্ব' 'আত্মা'কেই বোঝায়। 'আত্মা' কি রকম? আত্মা হলো সচ্চিদানন্দস্বরূপ অর্থাৎ নিত্যস্থায়ী জ্ঞান এবং আনন্দ স্বরূপ। আর 'ধর্ম' বলতে বোঝায় শাশ্বত বিধি বা ন্যায়পরায়ণতা, শৃংখলা, অস্তিত্ব—এবং ঐ সকল নীতিসমূহকে পালনের জন্য কর্তব্য কর্ম করা। সুতরাং 'স্বধর্ম' বলতে বোঝায় নিত্যস্থায়ী জ্ঞানময় আনন্দাবস্থা।

'পর" অর্থাৎ অন্য বা ভিন্ন। 'পরধর্ম' বলতে 'ধর্মে'র বিপরীত বোঝায়। 'ধর্ম' যেহেতু সত্যের সমষ্টিবাচক তাই 'পরধর্ম' হলো মায়া, যা আত্মার প্রকৃত স্বরূপকে আবরিত করে রাখে এবং তাকে 'ত্রিগুণ' ও 'চতুর্বিংশতি তত্ত্বে'র† বন্ধনে আবদ্ধ করে। ফলে আত্মানন্দ লাভের পরিবর্তে আত্মসচেতনতা এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞান জন্মায়।

* খৃস্ট ও কৃষ্ণ কেবল পদবীমাত্র। ব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্র বিরাজমান পরমাত্মার সর্বজনীন চৈতন্যকেই তাঁরা প্রকাশ করে থাকেন। (প্রকাশকের মন্তব্য)

† ত্রিগুণ হলো যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; চতুর্বিংশতি তত্ত্বঃ অহংকার, বুদ্ধি, মানস, চিত্ত; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক); পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ); পঞ্চতত্ত্ব (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) এবং পঞ্চপ্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান)। (প্রকাশকের মন্তব্য)

সুতরাং 'স্বধর্ম' বলতে বোঝায় নিত্যস্থায়ী, জ্ঞানময় আনন্দাবস্থা। আর 'পরধর্ম' বলতে বোঝায় 'বিকারশীলতা'—বিনাশী অজ্ঞানাবস্থা।

গীতায় বলছেঃ "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহ" (৩—৩৫)। শরীর ধারণ করলেই নিধন অনিবার্য্য। যদি আত্মধর্মে থেকে নিধন হয় ও তাতে মুক্তি হয়, তবে তাই শ্রেয় ; আর 'পরধর্মে' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ধর্মে থেকে যদি নিধন হয়, তাহলে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহে পড়তে হয়। সুতরাং তাহা ভয়াবহ হয়।

গীতায় আছে, অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

"অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ (৩—৩৬)

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানুষ যেন কার দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে বলপূর্বক নিয়োজিত হয়েই পাপাচরণ করে থাকে। সাধক ক্রিয়াকালে দেখতে পায় 'ক্রিয়া' বেশ হচ্ছে—লক্ষ্যও 'কূটস্থে' বেশ রয়েছে। হঠাৎ কে যেন জোর করে মনকে অন্যদিকে নিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। নানারকম চঞ্চলতায় ফেলে। আত্মজিজ্ঞাসু সাধক তাই জিজ্ঞাসা করছেন—এরূপ কেন হয় এবং কাহার দ্বারাই বা হয়?

'কামই' পার্থিব জগতে সকল কার্য্যের প্রবর্তক। জীব যে বস্তু কামনা করে তাহা প্রাপ্তির বিঘ্ন হলেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ কামই ক্রোধের রূপ ধারণ করে। কাম রজঃগুণজ ; যেহেতু 'কাম' সর্বদা পূর্ণ হয় না তাই তা দুঃখদায়ী। ভোগের দ্বারা কামের শান্তি হয় না—অনন্তকাল ভোগ্য বস্তু পেলেও তাতে তৃপ্তি আসে না। 'প্রাণায়াম' করতে করতে যতক্ষণ না মন 'আজ্ঞাচক্রে' স্থির হচ্ছে ততক্ষণ কাম মনকে বিষয়ের দিকে টেনে নেবার চেষ্টা করে—এমনকি সাধকের অজ্ঞাতে তাকে পথভ্রষ্ট করার জন্যও সে গোপনে কাজ করে যায়। আত্মা স্থানভ্রষ্ট হয়ে অধোদেশে এসে 'মন' উপাধি ধারণ করে এবং চঞ্চল হয়ে পড়ে। 'অনাহত' চক্রের অধোগমন হলে পর সে নিম্নস্থ তিনটি চক্র যথা 'মণিপুর', "স্বাধিষ্ঠান" এবং 'মূলাধারে'র বশীভূত হয়ে কামের উৎপত্তি ঘটায়। "যেমন ধূমের দ্বারা অগ্নি ঢাকা থাকে, ময়লার দ্বারা দর্পণ ঢাকা থাকে, জরায়ু দ্বারা গর্ভ ঢাকা থাকে—সেইরূপ কাম দ্বারা আত্মজ্ঞান ঢাকা থাকে। নিত্য বৈরী এই কামরূপ দুষ্পূরণীয় অনলের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে।" (ভগবদ্গীতা ৩ঃ ৩৮—৩৯)

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই তিনটি মিলে এক হওয়াই পরম পুরুষার্থ। জ্ঞাতা হলো জীব, জ্ঞান শক্তি এবং জ্ঞেয়ই 'পরমাত্মা'—ভগবান। পূজা এবং অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ ইত্যাদি থেকে যখন জানা যায় যে সবই ব্রহ্মময়, তখন সেই জ্ঞান হলো পরোক্ষ জ্ঞান। আর ধ্যানযোগে 'লয়' হয়ে যখন জানা যায় আমিই ব্রহ্ম—তখন তাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে।

'কাম' জ্ঞানীর নিত্য বৈরী ও অনল স্বরূপ। অগ্নি পর প্রকাশক হলেও নিজে কাঠি প্রভৃতি কোনো আশ্রয় ব্যতীত প্রকাশ পায় না। আশ্রয় যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ অনলের প্রকাশ। আশ্রয় ক্ষয় হলে অনলও বিলুপ্ত হয়। রাশি

রাশি দ্রব্য ভস্মীভূত করেও অনল পরিতৃপ্ত হয় না, বরং ক্রমশঃ তা অধিক শিখা বিস্তার করতে থাকে। তেমনি কামও নিজ আশ্রয় মনকে সন্তপ্ত করে এবং বিষয় সংস্পর্শে ক্রমেই তা বৃদ্ধি পায়। আশ্রয়বিহীন হলে অনল যেমন নিভে যায়, তেমনি বিষয়ত্যাগ হলেই কামও ফুরিয়ে যায়।

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই তিন হলো কামের অধিষ্ঠানভূমি।' কাম ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিবেকজ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। কাম ও বিষয়ে ইচ্ছা জীবমাত্রেই প্রবল। কামনা বা বাসনা থাকার জন্যই জীব দেহধারণ করে বারবার জন্মগ্রহণ করে। যেমন ভিজে কাঠে শীঘ্র আগুন ধরে না, তেমনি কামনার অবস্থানে মনেতেও জ্ঞানজ্যোতি ফোটে না। তবে ইন্দ্রিয়গুলিকে স্ববশে আনতে পারলে কাম স্বতঃই বিনষ্ট হয়ে যায়। আর ইন্দ্রিয়বশীভূত হলেই মন ও বুদ্ধি ক্রমশঃ বশীভূত হয়ে আসে।

শাস্ত্রোপদেশজনিত আত্মবোধের নামই জ্ঞান। অগ্রে শ্রবণ, তারপর মনন ও নিদিধ্যাসনের মধ্যে দিয়ে যে বিশেষ আত্মজ্ঞান লাভ হয় তারই নাম 'বিজ্ঞান'।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ

"বীতরাগ ভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসাপূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥"

(ভগবদ্গীতা ৪ ঃ ১০)

—বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বর্জিত, আমাতে একাগ্রচিত্ত এবং আমার শরণাগত ব্যক্তি, জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার স্বরূপলাভ করেন।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" ও "তত্ত্বমসি"—আত্মার এই দৃঢ় ধারণাই হলো প্রকৃত জ্ঞান। ধ্যানকালে দেহকাণ্ড ঋজু রেখে ভ্রূমধ্যে প্রাণপ্রবাহকে চালিত করলে যে অবস্থা হয় তাকেই বলে প্রকৃত 'তপস্যা'। এর সাহায্যে অন্তরের ঐশী শক্তিগুলির উপর প্রভুত্বলাভ করা যায়। এইরূপ জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা শুদ্ধ চিত্ত অনেকেই দিব্যকর্ম জেনে বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধবিহীন হয়ে পরমভাব লাভ করে থাকেন।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—যার যেমন মনের ভাব তার সেইরূপ সিদ্ধিলাভ হয়। সাধক নিজেকে যেভাবে চিন্তা করেন—মুক্ত, বদ্ধ, লিপ্ত-নির্লিপ্ত, সকাম-নিষ্কাম, দেহবদ্ধ আত্মাও তাঁকে সেই রূপে গ্রহণ করে। যার যেমন মতি তার তেমন গতিও হয়। 'যে খায় চিনি তাকে যোগান চিন্তামণি।' যে সাধক ইহজন্মেই সংসার থেকে মুক্ত হব এই বিশ্বাসে সাধনা করেন, মৃত্যুকালে তাঁর পক্ষে আর পরলোক কোথায় থাকতে পারে? যাবেন কোথায়? তিনি যে অজ—তাঁর তো মৃত্যু নেই। তিনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকেন। নির্ভয়ে বুদ্ধি দ্বারা নিজেকে 'আমি' জ্ঞান করে লয়যোগ অবলম্বন কর এবং সকল আবরণ ছিন্ন করে আমিই আমি—এই জ্ঞানভাবাপন্ন হও।

রঙীন কাঁচ দিয়ে দেখলে সাদা জিনিষও যেমন কাঁচ যে বর্ণের, সেই বর্ণ ধারণ করে, সেইরকম সাধকের সাধন অবস্থানুসারে বিমল ব্রহ্মও নানাভাবে রঞ্জিত হয়। কেহ অত্যন্ত সুখী আবার কাউকে অত্যন্ত দুঃখী দেখে মানুষ ঈশ্বরকে দোষারোপ করে। কিন্তু দুঃখের সৃষ্টি ও জগতের সংহার দেখে ঈশ্বরকে নির্দ্দয় বলা যায় না কারণ ঐগুলি ঈশ্বর-সৃষ্ট নয়। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে 'ঐগুলির নিমিত্ত কি?' শ্রুতি বলে 'জীবের ধর্মাধর্মই নিমিত্ত।' সৃজিত জীবের ধর্মাধর্মই সৃষ্টি বৈষম্যের কারণ। যেমন মেঘ যবাদি শস্যোৎপত্তির সাধারণ কারণ, সেইরূপ ঈশ্বরও দেব মনুষ্যাদি সৃষ্টির সাধারণ কারণ। কিন্তু শস্যের ভাল-মন্দের জন্য যেমন আকাশের মেঘ দায়ী নয়, সেইরকম মানুষের আচরিত ধর্মাধর্মই তাদের মধ্যে বৈষম্যের 'অসাধারণ কারণ'।

ভক্তের প্রতি ভগবানের যে একটু বিশেষ টান দেখা যায় তা ভক্তের ভক্তির গুণে, ভগবানের পক্ষপাতের দোষে নয়। যিনি সর্বভূতে সর্বত্র ঈশ্বরকে দেখেন; যিনি ঈশ্বরে ভক্তিমান এবং তাঁকেই একমাত্র ইষ্ট বলে মনে করেন, "....ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ।" (ভগবদ্গীতা ১২ঃ২০) আয়নার দিকে তাকালে আমরা নিজেদের চেহারা দেখতে পাই। কিন্তু আয়নার দিক থেকে মুখ ফেরালে আর নিজেদের চেহারা দেখা যায় না। সেইরকম ভগবানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখলে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় না বা কৃপাও লাভ হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেনঃ

"যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"

(ভগবদ্গীতা ৬ঃ৩০)

—'যিনি পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছু দেখেন না, আর কিছু জানেন না, আর কিছু ভাবেন না, ভগবান ব্যতীত যার আর কিছু দ্রষ্টব্য, জ্ঞাতব্য বা ধ্যাতব্য আছে বলে আদৌ অনুভবই হয় না—আমি তার অতিশয় প্রিয় এবং তিনিও আমার পরম প্রীতির কারণ।' কোনো ব্যক্তির ইহজীবনের অবস্থা তার পূর্বজীবনে কৃত কর্মানুযায়ী হয়ে থাকে। যে যেমন বীজ বপন করে, তাহার বৃক্ষ সেইরূপ ফল প্রসব করে। জীবের নিজ নিজ পূর্ব জন্মার্জিত কর্মই পরজন্মে তাহাকে ধনী বা দরিদ্র, ধার্মিক বা অধার্মিক করে। ইহা ঈশ্বরের সৃষ্টি বৈষম্য নহে—তিনি সকলের প্রতিই সমদর্শী।

'ক্রিয়াকালে' সাধক কোনো চক্রের ফলের প্রতি লক্ষ্য না করে ব্রহ্মনাড়ীস্থিত আকাশ অবলম্বনে 'আজ্ঞাচক্রে'র দিকে প্রাণচালনা করে, তবে তার প্রভাব এমনই হয় যে মনের আকাংখা ফুরিয়ে গিয়ে বিষয়সঙ্গ কেটে যায়। মন একমাত্র 'তারক*ব্রহ্ম' বিন্দুতে স্থির হয়। কোন প্রতিবন্ধক না থাকায় শান্তি বা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করে। এটিকে স্থির সিদ্ধান্ত বলে জানবে।

* তারক অর্থ চক্ষুতারা বা নক্ষত্র—এখানে ঈশ্বর বা মহাজাগতিক চৈতন্যের কথা বলা হয়েছে। মানুষের চৈতন্য যখন আধ্যাত্মিক চক্ষুর তারকাটি, যা মহাজাগতিক চৈতন্যের

'আপ্ত কামস্য কা স্পৃহা'—শ্রুতি এই কথায় বলেন, সর্বাত্মক দৃষ্টিতে সমস্তই যাহাতে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে—সেই আপ্তকাম পুরুষের আবার বস্তুর কামনা কেন হইবে? কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বর এই বিশ্বরচনা করেন নি। বিশ্বব্যাপার সবই তাঁর প্রকৃতি সুলভ লীলা মাত্র। জীবের এই আত্মতত্ত্ব জানা হলে পর পরমেশ্বরের সঙ্গে তার অভিন্নতা বুঝতে পারে, ফলে জীবের মুক্তি হয়।

জীবের দেহত্যাগ কি করে হয়?

'মূলাধারে' 'অপান' এবং 'আজ্ঞা'য় প্রাণ অবস্থিত। প্রাণ মেরুদণ্ড দিয়ে ঊর্ধ্বমুখে আজ্ঞাতে যায়, আর অপান সেই মেরুদণ্ড পথে নিম্নমুখে 'মূলাধারে'র দিকে যায়। এই দুই বায়ু মেরুদণ্ডের দুই প্রান্ত থেকে বিপরীত আকর্ষণে পরস্পরকে টেনে নেবার চেষ্টা করে। কেউ কাউকে জয় করতে না পারায় দেহে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে। যেদিন 'প্রাণ' 'অপানে'র টানে পরাজিত হয় সেইদিনই জীবের দেহত্যাগ হয়।

গীতায় আছে:

'যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥'

(ভগবদ্গীতা ৪:৩৭)

অর্থাৎ যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি কর্মরাশিকে ভস্মীভূত করে।

'কর্ম' হলো জন্ম এবং মৃত্যুর বাস্তব কারণ। 'কর্ম' তিন প্রকার—'প্রারব্ধ', 'সঞ্চিত' ও 'ক্রিয়মান্'।

'প্রারব্ধ' কর্ম হলো যা বর্তমানে ফল দিতে আরম্ভ করেছে অর্থাৎ পূর্বজন্মকৃত কাজের ফল স্বরূপ এই দেহ ও তার কর্মভোগ।

'সঞ্চিত' হলো সেই কর্ম যা এখন সঞ্চয় হচ্ছে। এর ফল ভবিষ্যৎ জন্মে পাওয়া যাবে।

'ক্রিয়মান্' হলো ভাবী কর্ম, যা এখনও অনুষ্ঠিত হয়নি।

অগ্নির তেজে যেমন কাঠ পুড়ে গিয়ে শুধু ভস্ম পড়ে থাকে, সেইরকম 'জ্ঞানোদয়' হলে 'প্রারব্ধ' এবং 'সঞ্চিত' কর্ম ধ্বংস হয়ে যায়। প্রাক্তন এবং বর্তমান কর্মফল ধ্বংস হওয়ায় তা আর সাধককে অভিভূত করতে পারে না। এমৎ অবস্থায় 'ক্রিয়মান' কর্ম অনুষ্ঠিত হলেও পদ্মপাতার উপর জলের ন্যায় কর্মীকে লিপ্ত করতে পারে না।

স্বারস্বরূপ—তাকে ভেদ করতে সক্ষম হয়, তখন তার ঐ মহাজাগতিক চৈতন্যের অনুভূতি লাভ হয়। (প্রকাশকের মন্তব্য)

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন :

"গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥"

(ভগবদ্গীতা ৪ : ২৩)

অর্থাৎ জ্ঞানের স্বরূপ জানা হলে অন্তঃকরণ বৃত্তি অন্তর্মুখী হওয়ায় সর্ব-কর্ম আপনা-আপনি ত্যাগ হয়ে যায়। কেননা কর্মক্ষয় না হলে সৎ-অসৎ ফলে আবদ্ধ হতে হয়। সেই বন্ধনই পাপ। জ্ঞানীর চিত্ত সহস্রারে জ্ঞানের অতীত স্থানে নিবিষ্ট থাকায় তাহার কর্ম তাহাকে স্পর্শ করতে পারে না।

যিনি শ্রদ্ধাবান, তৎপর ও সংজিতেন্দ্রিয়—তিনি জ্ঞানলাভ করেন এবং পরম শান্তি প্রাপ্ত হন্। এই 'রাজযোগ' বা আত্মজ্ঞানলাভ হলো সকল বিদ্যার রাজা, শ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র ও প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। এই অক্ষয় আত্মজ্ঞান সঞ্চিত হলে পর 'ক্রিয়ামান' অথবা প্রারব্ধ সমস্ত কর্মের ক্ষয় হয়ে যায়। মায়া বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ায় সাধক আত্মজ্ঞান লাভ করে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পান। এই জ্ঞান তাই সর্বোৎকৃষ্ট এবং পবিত্র থেকেও পবিত্রতম। গীতার উক্তি এক্ষেত্রে স্মর্তব্য :

"রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্র মিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥"

(ভগবদ্গীতা ৯ : ২)

সংশয়

"অজ্ঞশ্চা শ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকো হস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥"

(ভগবদ্গীতা ৪ : ৪০)

অজ্ঞানী, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়যুক্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোক বা পরলোক নাই।

মনের অজ্ঞতা থেকেই সংশয় আসে। সংশয়ই সকল অনর্থের মূল ; সুতরাং সংশয় ত্যাগ করা উচিত। এটি তোমার নিজের হাতে অর্থাৎ এর জন্য তোমার পুরুষাকার প্রয়োজন। নিজের সংশয় নিজে বুঝে নিজে ত্যাগ না করলে, অন্য কেউ তাকে ত্যাগ করাতে পারে না।

'কুণ্ডলিনী' জাগ্রত হলে 'শুদ্ধ বুদ্ধির' বিকাশ হয়—প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে যা জানবার সব জানা যায়, সন্দেহের অবসান হয়। 'কুণ্ডলিনী' বায়বীয় আকারে 'মূলাধারে' অচৈতন্য ভাবে আছেন। গুরুদত্ত সাধনার বলে সেই কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করে সুষুম্নায় নিয়ে যেতে হবে। তাহলে চেতনা, বিষয় ও ইন্দ্রিয়মুক্ত হয়ে আত্মায় ও পরমাত্মায় মিলন ঘটাবে। এই প্রক্রিয়াকেই 'ধ্যান' বলে।

যোগ কাহাকে বলে ?

হে সাধক, যোগ নভস্তলে নেই ভূমিতলেও নেই কিংবা রসাতলেও নেই। যোগ বিশারদ পণ্ডিতগণ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একতা, 'নারায়ণে'র সঙ্গে 'নরে'র একতা সাধনকেই যোগ বলে নির্দ্দেশ করেছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যকেই যোগবিঘ্ন বলে বলা হয়ে থাকে। যোগীগণ যোগাঙ্গ দ্বারা উল্লিখিত ছয় প্রকার বিঘ্ন বিনাশ করিতে পারিলেই যোগলাভে সমর্থ হন্। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধরণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি যোগিগণের যোগ সাধনের অঙ্গ বলে উক্ত হয়েছে।

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥"
(ভগবদ্গীতা ২ : ৪৮)

কূটস্থে লক্ষ্য স্থির করে ফলাফলের দিকে মন না দিয়ে কেবলমাত্র চিদাকাশে বিচরণ কর। শ্বাস-প্রশ্বাস সমান হয়ে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হতে হতে স্থির হয়ে যায়। মনও 'কূট' (ভ্রূ মধ্য স্থান) পার হয়ে 'বিন্দু সরোবরে' বিলীন হলে তার আর কোনো ক্রিয়া থাকে না। সুতরাং কোনো কিছুরই জ্ঞান থাকে না। চিত্তের এই সাম্যভাবের নামই হলো যোগ। এইরকম অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

যোগারূঢ় অবস্থা

উচ্চকোটি যোগির দেহে ইন্দ্রিয়ের কাজ ইন্দ্রিয় করে যায়, কিন্তু যোগির তাতে কোন যোগ থাকে না। তিনি নিষ্কলঙ্ক থেকে কেবল আত্মাতেই বিরাজ করেন। এমন অবস্থায় সব দেহগত এবং বস্তুগত আকর্ষণ আপনা-আপনি ত্যাগ হয়ে যায়। একেই যোগারূঢ় অবস্থা বলে।

গুরু নির্দ্দেশে যোগভ্যাস কর

কুশাসনের উপর মৃগচর্ম ও তার উপর তসরাদি কাপড় পেতে ঋজু হয়ে বসে 'ক্রিয়া' করতে হয়।* তাহলে শরীরে যে বৈদ্যুতিক তেজ ও শক্তি সঞ্চার হয় তাকে পৃথিবী টেনে নিতে পারে না। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জোর করে প্রাণবায়ুকে চক্রভেদ করে উর্দ্ধমুখীন করার চেষ্টা করলে দৈহিক ক্ষতি ও রোগের সম্ভাবনা খুবই বেশী থাকে। 'ক্রিয়া'র মত উচ্চাঙ্গের যোগ বিদ্যা শিখতে

* আসনরূপে কুশাসন ও মৃগচর্মের ব্যবহার ভারতে সুপ্রচলিত। অবশ্য পরমহংস যোগানন্দজী বলেছেন যে কম্বলের বা সিল্কের ঢাকা দেওয়া কাপড়ের আসনও সমান উপযোগী।
(প্রকাশকের মন্তব্য)

হলে উচ্চ কোটির গুরুর কাছে শেখা উচিত। গুরুর আশীর্বাদ ছাড়া শুধু বই পড়ে অভ্যেস করতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট। প্রত্যেকের বয়স ও স্বাস্থ্য অনুযায়ী গুরু তাকে উপযুক্ত ক্রিয়া দিয়ে থাকেন।

যথেষ্ট আলো-বাতাসযুক্ত ঘরে যে কোন যোগ, বিশেষ 'ক্রিয়াযোগ' অনুশীলন করা উচিত। খুব খোলা ও ঠাণ্ডা জায়গায় ক্রিয়া মোটেই করা উচিত নয়। তাতে ফুসফুসের রোগ হতে পারে।

'ক্রিয়া' করে তারপর অনেকক্ষণ ধ্যানাবস্থায় থাকতে হয়। তাতে এক অপূর্ব শান্তি ও আনন্দ অনুভূত হয়। এক বালতি দুধ দুয়ে তাকে লাথি মেরে ফেলে দেওয়াও যা, আর ক্রিয়া করে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়াও তাই—একই অবস্থা হয়।

স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রত অবস্থা

যোগশাস্ত্র মতে দিবা বা রাত্র—যখনই আমরা বিষয় চিন্তা করি অথবা বিষয়াসক্ত থাকি, তখনই হলো আমাদের স্বপ্নাবস্থা। কিন্তু যখন ঈশ্বরচিন্তা ও জগতের অনিত্যতা অনুভব করি তখন সেটাই হয় আমাদের জাগ্রত অবস্থা।

"যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

(ভগবদ্গীতা ২ঃ৬৯)

প্রকৃত ধনী

যিনি আত্মজ্ঞানরূপ ধনে ধনী, তিনিই প্রকৃত ধনী। যার শুধু টাকাকড়ি বিষয় সম্পত্তি আছে, তিনি প্রকৃত অর্থে মোটেই ধনী নন্। কারণ দেহত্যাগের পর এক কানাকড়িও কেউ নিয়ে যেতে পারবে না—সবই ফেলে যেতে হবে। তাই বিষয় সম্পত্তি, টাকা পয়সা আমাদের আসল ধন নয়। শুধু আত্মজ্ঞানই চিরদিন আমাদের সঙ্গে থাকবে। যে অবস্থা লাভ করলে সাধক অপর কোনো লাভকে তদপেক্ষা অধিক বলে মনে করেন না এবং যাতে স্থিত হলে জরা মৃত্যুরূপ মহৎ দুঃখ দ্বারা বিচলিত হয়েন না, সেই দুঃখ সংস্রববিহীন চিত্তবৃত্তি নিরোধ* অবস্থার নাম যোগ। এই যোগ নির্বেদ চিত্তে অধ্যবসায় সহকারে

* "...'চিত্তের বিপরীতধর্মী আবেগের প্রশমন'...অথবা অন্যভাবে অনুবাদ করলে 'মনের সংকল্প বিকল্পের লয় বা স্তিমিত ভাব।' চিত্ত=চিন্তন ব্যাপারের অন্তর্গত প্রাণ-শক্তিসমূহ, মানসসত্তা, অহংকার, বুদ্ধি ইত্যাদি। বৃত্তি=চিন্তা ও ভাব, যা মানুষের সংজ্ঞান মনে অবিরত উত্থান ও বিলীন হয়। নিরোধ=এক অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তকে স্থির রাখা অর্থাৎ অভ্যাস দ্বারা যথেচ্ছ যে কোন বিষয়ে চিত্তকে নিশ্চল রাখতে পারা। (পতঞ্জলির যোগসূত্রঃ ১ঃ২) [প্রকাশকের মন্তব্য]

অভ্যাস করতে হয়। এই যোগাবস্থা প্রাপ্ত হলে অন্য আর কিছুতে আকাঙ্খা থাকে না। এইরকম ভাবকেই 'কৈবল্য' বা 'নির্বাণ' অবস্থা বলে।

যে লাভ থেকে শ্রেষ্ঠ লাভ, যে সুখ থেকে শ্রেষ্ঠ সুখ, যে জ্ঞান থেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আর কিছুই নাই—সেই ব্রহ্মকে সর্বদা ধ্যান করলে তবেই তাকে পাওয়া যায়।

যোগী

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ

"তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোঽপিমতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকোযোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জুন॥"

(৬ ঃ ৪৬)

—যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব যোগী হওয়াই শ্রেয়।

মানবদেহের প্রাণ ও চৈতন্যের যে সূক্ষ্ম কেন্দ্রগুলি মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের চক্রগুলিতে রয়েছে, সেখানেই 'পঞ্চতত্ত্বে'র স্থান। এই চক্রগুলি সক্রিয় হয়ে উঠলে জীবচৈতন্য বিশ্ব চৈতন্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। 'পৃথ্বীতত্ত্বে'র স্থান 'মূলাধার', 'অপ'তত্ত্বের স্থান 'স্বাধিষ্ঠান', "তেজ" তত্ত্বের স্থান 'মণিপুর', 'বায়ু' তত্ত্বের স্থান 'অনাহত' এবং 'আকাশ' তত্ত্বের স্থান 'বিশুদ্ধ চক্রে'। এছাড়া 'বুদ্ধি'তত্ত্বের স্থান 'আজ্ঞা'চক্রের 'কূটস্থে'র মধ্যে। আর 'সমষ্টি' বা 'হিরণ্যগর্ভে'র স্থান হলো সহস্রদল পদ্ম বা 'সহস্রা'র চক্রে, যা অব্যক্ত এবং সৃষ্টি ও বৃদ্ধির কারণ।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে প্রকাশিতা। জীবের চেতনা আজ্ঞাচক্রে থাকলে তখন তার সাত্ত্বিকভাব, আজ্ঞার নীচে নাভিমূল পর্যন্ত রাজসিকভাব এবং নাভির নীচস্থ তিনটি চক্রে থাকলে তামসিক ভাব হয়।

মায়া

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

(৭ ঃ ১৪)

—আমার এই গুণময়ী দৈবী মায়া দুস্তরা। কিন্তু যারা একমাত্র আমাকেই ভজনা করেন, তারা এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারেন।

যিনি ধর্ম-কর্ম-জ্ঞানাদির আশা ভরসা ছাড়িয়া, আপনার অভিমান ও অহংকারাদি দূরে ফেলিয়া ভগবানকে একমাত্র অগতির গতি জানিয়া ভক্তিপূর্বক উপাসন করেন এবং তাঁর শরণাপন্ন হন্, ভগবান দয়া করিয়া তাহাকে মায়ামুক্ত করিয়া দেন।

কেবল শাস্ত্রধ্যান কিংবা মেধা দ্বারা বা বহু শাস্ত্র শ্রবণে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। গভীর ভক্তির মাধ্যমে নিজেকে ঈশ্বরচরণে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে তাঁরই আশ্রয় নিলে পর ভগবানের সঙ্গে যে মিলন হয় তাকেই 'নিরালম্ব' সমাধি বলে। সর্বাবরণ ভেদ পূর্বক আত্মার ও পরমাত্মার সাক্ষাৎ না হলে মায়াবন্ধন মোচন হয় না।

সংস্কার

যে বিষয় তীব্রভাবে চিন্তা করা যায় তাই মনের মধ্যে সংস্কার হয়ে থাকে। সংস্কার অতর্কিতে স্মরণ ও মনন ব্যতীত সম্পদ ও বিপদ, যে কোনো সময়ে, স্বয়ং সমুদিত হয়।

সংস্কার অতি মাত্রায় কার্যকরী হলে মনে তার প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশঃ অভ্যাসে পরিণত হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম অনেকাংশে এই সকল সংস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যেহেতু পুনঃ পুনঃ প্রয়োগের ফলে সংস্কার মনে দৃঢ় হয়ে বসে, সেহেতু সদ্ভ্যাস গড়ে তোলাই বুদ্ধিমানের পক্ষে উপযুক্ত কর্ম। এই সদ্ভ্যাসই মৃত্যুকালে আমাদের মনে ভগবৎ ভাব আনে এবং আমাদের চেতনাকে উন্নত করে।

অবতার

'যোগমায়া' বলে 'পরমার্থতত্ত্ব' মানুষের মধ্যে অদৃশ্য অবস্থায় অবস্থান করে।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্ ॥"

(ভগবদ্গীতা ৯ : ১১)

ভগবান, নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ স্বভাব ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করার জন্য শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি মনুষ্যদেহ ধারণ করে ধরাতলে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। সংকীর্ণচেতা মূঢ়গণ তাঁর সর্বভূতের মহান্ ঈশ্বরভাব অর্থাৎ তিনি যে অনন্ত—এইভাব বুঝতে না পেরে রাম-কৃষ্ণাদিকে সাধারণ মানুষ জ্ঞানে অনাদর করে থাকে। কিন্তু সূক্ষ্ম বুদ্ধির সাধকগণ সেই চিৎঘনানন্দ মূর্তি আরাধনা করেই পরমানন্দ লাভ করে থাকেন।

সহস্রার সুধা

সাধকগণ যখন 'সমাধি' মগ্ন হয়ে সাম্য অবস্থায় উপনীত হন, তখন সহস্রদল পদ্মযুক্ত 'সহস্রা' থেকে দিব্য সুধা ক্ষরণ হতে থাকে। সাধক সেই সুধা পান করে নিষ্পাপ হন্ এবং ব্রহ্মসুখ ভোগ করেন। শুধু তাই নয়, সেই সুধা পান করার সঙ্গে সঙ্গে সাধক অনন্তব্যাপি ব্রহ্মনাদও নিয়ত শ্রবণ করে থাকেন।

অভ্যাস যোগ

শ্রীভগবান বলেছেন ঃ

"অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥"

(ভগবদ্গীতা ১২ ঃ ৯)

—যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে অভ্যাস-যোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে যত্ন কর। অসমর্থের জন্য ভগবান সহজ উপায় নির্দ্দেশ করে বলছেন—অভ্যাস করো। যদি ভক্ত তার চিত্তকে ঐ 'অমিয়ে' উপস্থাপন করতে না পারে, যদি কোন একটি বিষয় সংস্কার বশতঃ বারবার মনে জেগে উঠে মনকে আত্মচ্যুত করে, তাহলে বৈরাগ্য ভাবনার দ্বারা সেই সব বিষয়ের অসারত্ব বিচার করে মনকে আবার ভগবৎ চিন্তায় ফিরিয়ে আনার অভ্যাস করতে হবে। এই যে বারবার চেষ্টা করে মনকে ভগবৎ চরণে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা, একেই বলে 'অভ্যাস যোগ'।

ভগবদ্গীতার ১২শ অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগ স্ত্যগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥"

—অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান বিশিষ্ট, ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ বিশিষ্ট আর ত্যাগের পরই আসে শান্তি। তখন সুখ-দুঃখ বলে আর কোন কিছুই থাকে না। সাধক তখন সর্বদাই ক্ষমাশীল, স্বতই সন্তুষ্ট। ইহাই প্রকৃত যোগীর অবস্থা। তখন চিত্ত সদাই সংযত, দৃঢ় অধ্যবসায়যুক্ত এবং মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরেই নিবেদিত। সাধনার বলে যোগীর যখন এ'রকম অবস্থা হয় তখন তিনি ঈশ্বরের অতীব প্রিয় হন্। শাস্ত্রে বলে—জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে শেষে জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করতে হবে। আত্মজ্ঞান লাভ হলে পর বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞান অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। পরমাত্মার সঙ্গে মিলন হলে পর ভক্তের আর পথের প্রয়োজন থাকে না—সব অনুসন্ধানের সেখানেই শেষ হয়ে যায়।

ভক্তি

ভক্তি ছাড়া কোনো সাধনাতেই ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভক্তিহীন লোকের কাছ থেকে তিনি নিজেকে বহু দূরে সরিয়ে রাখেন। কিন্তু যিনি

ভক্তিমান, তিনি তাঁর অতি নিকটেই থাকেন। তিনি সর্বলোকে বিরাজমান—সকলের অন্তরেই তিনি বিরাজ করছেন। তিনি স্থাবর আবার তিনিই জঙ্গম। তিনি অতি দূরে অথচ অত্যন্ত নিকটেই আছেন।

প্রভাবমুক্ত হওয়া

অনেক উঁচুতে কেউ বসে থাকলে নীচ থেকে যেমন অন্য কেউ তাকে ছুঁতে পারে না, তেমনি 'গুণ' ও 'গুণে'র কার্য্য থেকে আলাদা হয়ে যিনি উদাসীনবৎ থাকেন তাঁকে গুণ ও গুণের কার্য স্পর্শ করতে পারে না। যিনি সদাই আত্মায় অবস্থান করেন তাঁকেই 'গুণাতীত' বলে। যিনি সর্বদা স্বরূপে স্থিত, সুখ-দুঃখ, ঢিল-পাথর ও স্বর্ণাদিতে ভিন্ন জ্ঞান নাই, প্রিয়-অপ্রিয়, নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান, শত্রু বা মিত্রপক্ষ বলে যার কোনো বোধ নাই—তাঁকেই গুণাতীত বলে। পাঁকাল মাছের মত—পাঁকের মধ্যে থেকেও গায়ে পাঁক লাগে না।

'জীব' ব্রহ্মেরই স্বরূপ—যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও অগ্নি অথবা সমুদ্র ও সমুদ্রের তরঙ্গ। কেবল সাময়িক উপাধি ব্যবধানে উহাদের স্বতন্ত্র বলে মনে হয়। জীবের নিজ স্থান ব্রহ্মপদ। আত্মজ্ঞান প্রভাবে 'মায়া'কে অতিক্রম করতে পারলেই জীব নিজ স্থান ব্রহ্মপদ লাভ করে। কিন্তু আত্মজ্ঞান না জন্মালে মায়াবশে জীব কর্মফল ভোগ করার জন্য বারবার সংসারে জন্মগ্রহণ করে থাকে।

"শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎ ক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধা নিবাশয়াৎ ॥"

(ভগবদ্গীতা ১৫ : ৮)

—যেমন বায়ু পুষ্পাদি হইতে গন্ধ লইয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ ঈশ্বর (জীবাত্মা) দেহ হইতে উৎক্রমণ করিয়া কর্মবশে অন্য শরীর গ্রহণ কালে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।

মৃত্যুর পর জীবাত্মা দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সূক্ষ্ম জগতে কিছুদিন সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করে। তারপর পুনর্বার জন্মগ্রহণের জন্য যথানিয়মে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। যতদিন মাতৃগর্ভে থাকে ততদিন তার শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বতন্ত্র ক্রিয়া থাকে না—মাতৃ শরীরের দ্বারাই তার প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু ভূমিষ্ট হওয়া মাত্র তার নাসারন্ধ্রে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং তখনই অন্তর্লীন প্রাণপ্রবাহ নাসারন্ধ্রের প্রবাহের সঙ্গে মিশে বহির্মুখী হয় এবং বিষয় সংস্পর্শে এসে মোহিত হয়ে পড়ে। জীবাত্মা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকরূপী পঞ্চেন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করে শব্দাদি বিষয়সমূহ উপভোগ করে।

সাপ যেমন খোলস ছেড়ে বেশী বলীয়ান হয়, জীবও সেইরকম নতুন দেহে নতুন বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। এইভাবে জন্ম থেকে সারা জীবনভোর প্রতি মুহূর্তে স্নায়ু পথে বিষয় থেকে শক্তিপ্রবাহ ভিতরে প্রবেশ করছে, আর জীবাত্মাও তদনুরূপ সুখ বা দুঃখ ভোগ করছে।

বিভিন্ন চক্রে উত্থিত নাদ

'কূটস্থে' মন স্থির হলে একটি প্রাণবায়ু তীব্র বেগে নীচ থেকে উপরে উঠতে থাকে এবং সেই সঙ্গে একটি শব্দ 'আজ্ঞা'চক্রে শুনতে পাওয়া যায়। একেই 'নাদ' বলে। এরই অপর একটি নাম 'পাঞ্চজন্য', কেননা সেই ধ্বনি মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধ চক্র ভেদ করে আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করবার চেষ্টা করে। কৃষ্ণচৈতন্য বা কূটস্থের স্থান আজ্ঞাচক্রে এই নাদ শোনা যায় বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে মাধবের 'পাঞ্চজন্য'। এই ধ্বনি শোনার সঙ্গে আজ্ঞাচক্রে এক তেজোময় জ্যোতির প্রকাশ হয়।

'মণিপুর' চক্রে যে ধ্বনি শোনা যায় তার শব্দ অনেকটা বীণার মত। অর্জুনের 'দেবদত্ত' শংখের নামানুসারে একে দেবদত্ত শংখধ্বনি বলে। তেজস্তত্ত্বেরও অবস্থান মণিপুরে। সেখানে ইনি 'বৈশ্বানর' নামে প্রসিদ্ধ।

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপান-সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥"

(ভগবদ্গীতা ১৫ : ১৪)

ভোজনকালে ভোজ্যবস্তু ভগবানের যে তেজশক্তি মণিপুরে বৈশ্বানর নামে অবস্থিত তাহাকে অর্পণ করলে, ভুক্ত অন্ন অপরিপাকজনিত কোনো ক্লেশ হয় না।

নরকের দ্বার

কাম, ক্রোধ, লোভ—এই তিনটি হলো নরকের দ্বার ; অতএব সর্বদা পরিত্যাজ্য।

দেহমন্দির

দেহকে সর্বদা মন্দিরজ্ঞানে পবিত্র রাখবার চেষ্টা করবে। এই দেহেই ভগবানের অংশ আত্মা বাস করছেন। এই জ্ঞান থাকলে দেহ দ্বারা বা মনের দ্বারা কোনো পাপ বা অন্যায় করতে পারবে না।

ঈশ্বর কি ?

যোগশাস্ত্রের বিখ্যাত প্রবক্তা মহাযোগী পতঞ্জলি ঈশ্বরের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন ঃ ঈশ্বর ব্যক্তিসত্তাবিশিষ্ট হয়েও মানুষ, এমনকি, মুক্তাত্মা

থেকেও স্বতন্ত্র। যদিও তিনিই স্রষ্টা এবং সর্বভূতে বিরাজমান হয়ে সমস্তই উপভোগ করেন, তবুও 'মায়া' বা মায়াশক্তি সমূহের তিনি বশীভূত নন্। তিনি 'কর্ম' বা 'সংস্কার' থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যেমন সূত্রধর কাষ্ঠ নির্মিত অশ্ব, হস্তী বা ব্যাঘ্রাদিকে যন্ত্রারূঢ় করিয়া ঘুরাইয়া দিলে তাহারা ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ ভগবানের মায়া প্রভাবে জীবসমূহ নানাভাবে নানা দিকে 'প্রবৃত্তি' ও 'নিবৃত্তির' বশবর্তী হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। নিজেকে যতই স্বাধীন মনে করিয়া থাক ঐশী শক্তি 'মহামায়া'র অধীন হইয়া তোমাকে চিরদিনই থাকিতে হইবে। কারণ পরম মুক্তি না আসা পর্য্যন্ত দৈবী মায়া 'দুরত্যয়া'।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ

মেজদা বলতেন মানব দেহে তিনটি গুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। তমোগুণে অজ্ঞানতার নিম্নস্তরে মানুষের ক্রমাবনতি হয় ও আপন-সৃষ্ট নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। আত্মশুদ্ধিকর কাজ করে কেউ যদি চেতনাকে তমঃ-শক্তির বন্ধন ছিন্ন করে উচ্চাভিমুখী করতে না পারে, তাহলে পরজন্মে তার মধ্যে আসুরিক লক্ষণ দেখা দেয়, এমনকি পশুযোনিতেও* জন্মগ্রহণ করে থাকে।

রজোগুণে মানুষ লোকব্যবহারপরায়ণ হয়ে স্ত্রী পুত্র পরিবারের সঙ্গে সংসারে অবস্থান করে এবং নিজ চিন্তা ও কর্ম অনুযায়ী সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতা ইত্যাদি দ্বৈত কর্মফলের শিকার হয়।

আর সত্ত্বগুণে মানুষ ধর্মপরায়ণ আধ্যাত্মিক নীতিনির্দ্দেশ মান্য করে ক্রমশ 'মোক্ষে'র সন্নিহিত হতে থাকে।

নিজের আচার-ব্যবহার ও গুণাবলী লক্ষ্য করে কোন্ 'গুণে'র প্রভাব তার মধ্যে অধিক সেকথা মানুষ বুঝতে পারে। মৃত্যুকালে যার মধ্যে যে গুণের প্রভাব অধিক হয়, তার পুনর্জন্মও সেইরূপ হয়। 'সাত্ত্বিক'ভাব প্রবল হলে হয় স্বর্গলোকে যান অথবা নরলোকে আধ্যাত্মিক পরিবেশে জন্মলাভ করেন। রজোভাব প্রবল হলে সাধারণ মানবরূপে তিনি জন্মগ্রহণ করে থাকেন। আর তমোভাবাপন্ন হলে পশুবৃত্তি সম্পন্ন নিম্নস্তরের মানুষ রূপে জন্মলাভ করে এবং এমনই পরিবারে জন্ম হয়ে থাকে যেখানে পশু মনোভাবেরই প্রাবল্য দেখা যায়। ইহজীবন অত্যধিক পাপাচারী হয়ে থাকলে একজন্মের জন্যও তাকে পশু-যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হতে পারে।

যদি কেউ নিজেকে সত্ত্বাদি গুণ থেকে নির্লিপ্ত করতে পারেন, তাহলে তাঁর আর যোনি ভ্রমণের আশংকা থাকে না—আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। যেমন নির্মল জল নির্মল জলে মিশে যায়, যেমন নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে

* পশুযোনি প্রাপ্ত হয়ে পাপী তার অশুভ কর্মভার না বাড়িয়ে বরং সেই কর্ম ক্ষয় করার সুযোগ পায়। কারণ পশুর কোন স্বাধীন ইচ্ছা নেই, সে তার প্রবৃত্তির 'বশ মাত্র'। সে কর্মের জন্য দায়ী না হওয়ায় কর্মফলও লাভ করে না।

গিয়ে সমুদ্রেই বিলীন হয়ে যায়, সেই রকম গুণাতীত ব্যক্তি ভগবানে বিলীন হয়ে যান।

ত্রিবিধ গুণ সম্পন্ন মনের চিন্তারাশিকে নির্বিকল্প* সমাধির দ্বারা জয় করতে হবে। যদি সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যায় রত থাক, যদি শিলাখণ্ডে আপনার দেহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করো, যদি প্রজ্বলিত হুতাসনে প্রবিষ্ট হও, যদি কণ্টক পূর্ণ গহ্বরে নিপতিত হও, যদি প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণিত খড়্গ দ্বারা নিজ দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করো, যদি তুমি মহেশ্বর বা বিষ্ণুর সকল মন্ত্র কণ্ঠস্থ করো, এমনকি স্বর্গাধিপতি মহেন্দ্রও যদি তোমার দুঃখে বিচলিত হন—তথাপি তোমার বাসনা ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই মুক্তি আসবে না। পাতালেই যাও আর স্বর্গে যাও অথবা এই স্থানেই থাক—বাসনা বা সংকল্প ক্ষয় ব্যতিরেকে কোথাও কোনো শ্রেয় লাভ হবে না। বাসনার বিনাশ ছাড়া দুঃখ উপশমের অন্য কোনো উপায় নেই। অতএব পৌরুষ (যোগ) অবলম্বন পূর্বক বিকার শূন্য হয়ে পরমপদ আত্মজ্যোতি লাভের জন্য যত্নবান হও। নিশ্চয় জেনো তুমি যোগারূঢ় হতে সমর্থ।

একমাত্র বাসনা তন্তুতে নিখিল ভাব আবদ্ধ হয়ে আছে। এই বাসনা তন্তু ছিন্ন হলেই দেখবে বিষয়ভাব কোথায় পালিয়ে গেছে।

প্রতিদিন 'ক্রিয়া'র পর সাধক আসনে বসে কূটস্থ লক্ষ্য করে স্থির হয়ে থাকবেন। যে আত্মচেতনা সাধারণতঃ বহির্মুখী হয়ে দেহ চেতনায় পরিণত হয়, 'ক্রিয়া' সাধন করলে পর তাই আবার অন্তর্মুখী হয়ে থাকে। এর ফলে মন বাইরের বিষয় ভুলে গিয়ে অন্তরে অনেক অত্যাশ্চর্য বিষয় দেখতে পায়। কূটস্থে মন স্থির হয়ে থাকার ফলে শীতোষ্ণ সুখ দুঃখাদির বোধ আপনা থেকেই রোহিত হয়ে যায়।

ওম্-কারের গূঢ় তত্ত্ব

ওম্-এই একাক্ষর যুক্ত শব্দটি ব্রহ্মের বাচক অর্থাৎ প্রতীক, যাহাকে অবলম্বন করে ভগবানকে লাভ করা যায়। শব্দটি ঈশ্বরের নাম-কীর্তন করার পক্ষে খুবই উপযুক্ত। সৃষ্ট লোকের মধ্যে ঈশ্বরের বাহ্যিক প্রকাশ শব্দটির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে।† শব্দটিকে 'প্রণব' বলেও উল্লেখ করা হয়। কথাটির অর্থ হলো-যার দ্বারা সকল প্রকার সংশয় ছেদন করা যায় অথবা যার সাহায্যে প্রকৃষ্ট-রূপে ভগবানের স্তব করা হয়ে থাকে।

* 'নির্বিকল্প সমাধি' লাভের দ্বারা যোগী তার শেষ পার্থিব কর্মটুকুও ক্ষয় করেন। এটা হলো 'সমাধির' সর্বোচ্চ স্তর। এই অবস্থায় ভগবদ্ চিন্তা থেকে মনকে দূরে সরিয়ে না রেখেও যোগী সহজেই পৃথিবীতে বিচরণ করে থাকেন।

† সৃষ্ট জগতে কম্পনের মাধ্যমে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশক; এরই অন্য কয়েকটি নাম হলো Word, Holy Ghost বা Amen. ইনি হলেন অদৃশ্য ঐশী শক্তি, পরম কারণিক এবং একমাত্র সক্রিয় কারণরূপী শক্তি যা অনুরণনের দ্বারা সৃষ্টিকে সংহত করে রেখেছেন। (প্রকাশকের মন্তব্য)

প্রণবের অর্থ ও তার সাধন প্রণালী প্রথমে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকে ভালভাবে জেনে নিতে হয়। তবেই প্রণব জপ সিদ্ধ হয়। সাধন কৌশল না শিখে শুধু মুখে 'প্রণব' শব্দ বা ওম্-কার উচ্চারণ করলে তার দ্বারা বিশেষ কিছুই লাভ হয় না। শুদ্ধভাবে 'প্রণব জপ' করলে পর 'নাদ' শোনা যায় এবং একাগ্রতার মাধ্যমে তার সঙ্গে একীভূতও হওয়া যায়। সাধকের মন তখন দিব্য আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ—ঈশ্বরের এই তিন রূপ এবং তাঁর অপরাপর সকল গুণাবলী 'ওম্' ধ্বনির মধ্যে নিহিত রয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পক্ষে যত অবলম্বন বা প্রতীক আছে তার মধ্যে ওম-ই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। বেদ, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবৎ প্রভৃতি সকল ধর্মগ্রন্থ এই একাক্ষর প্রণব মন্ত্র ওম্ যোগে ভগবানকে পাবার নির্দ্দেশ দিয়েছে।

প্রতীক অবলম্বনে যারা ঈশ্বরলাভে ইচ্ছুক তাদের পক্ষে ওম্-কারই শ্রেষ্ঠ। কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি ভগবানের প্রতীক মূর্তি অপেক্ষা ওম-কার ধ্যান শ্রেয়ঃ। ঐ সব মূর্তি উপাসনার দ্বারা সাধকের মনে একটি রূপায়িত ইষ্ট মূর্তির সংস্কার সৃষ্টি হইয়া থাকে। পরে এই সংস্কার পরিত্যাগ করা তার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ইষ্টমূর্তির চিন্তা মন থেকে বিদূরিত না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত নির্বিশেষ অবস্থা পেতে পারে না। তাছাড়া মন রূপজ ইষ্টমূর্তির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে ক্ষুদ্র থেকে যায়—সে আর বৃহৎ বা ব্রহ্ম হতে পারে না। কিন্তু প্রণব উপাসনায় মনের সামনে কোনো মূর্তি থাকে না বলে মন আপন ক্ষুদ্রত্ব দূর করে ব্রহ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ক্রিয়াযোগ

বহু জন্মের পুণ্যফলে তবেই মানুষের মন অমূল্য 'ক্রিয়াযোগ' সাধনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যারা এই সাধন-পদ্ধতি শিক্ষা করেছেন তারা বাস্তবিকই ভাগ্যবান। বিভিন্ন প্রকার নীচ যোনিতে আশি লক্ষ বার জন্মগ্রহণের পর তবেই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করা যায়। মনুষ্যজন্ম লাভ করে পাপাচার করলে পর পুনরায় অধোগতি হয়। প্রশ্ন হলো—এত নতুন মানুষ জন্মাচ্ছে কোথা থেকে? ধাতব পদার্থ, উদ্ভিদ থেকে সুরু করে পশু পক্ষী ইত্যাদি জীব সকল ক্রমশঃ উন্নত জীবন ধারণ করে অবশেষে মনুষ্যদেহ পায়। এইভাবে আত্মার ক্রমবিবর্তন ও উন্নতির মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন মানুষ জন্মলাভ করছে। একমাত্র মানুষের মধ্যেই আছে সেই শক্তি যা দিয়ে সে নিজের অন্তরের দেবত্বকে প্রকাশ করতে পারে। তাই আত্মার মানবজন্ম লাভ করাকে ব্যর্থ হতে দেওয়ার মত মহাপাপ আর কিছুই নাই। 'ক্রিয়াযোগ' সাধনের দ্বারাই মানবাত্মার দ্রুত আধ্যাত্মিক জাগরণ সম্ভবপর।

যিনি 'ক্রিয়া' সাধন করে ঈশ্বরকে জেনেছেন তেমনি কোনো সংগুরুর কাছে 'ক্রিয়াযোগ' সাধন শিক্ষা করতে হয়। গুরু নির্দ্দেশে এবং গুরুর

আশীর্বাদ নিয়ে 'ক্রিয়া' অনুশীলন করলে পর সাধকের চৈতন্য মেরুদণ্ডস্থ সূক্ষ্ম চক্রভেদ করে আত্মজ্ঞান আনয়ন করে। 'ক্রিয়াযোগ' সাধনা করে সাধক যদি এক জন্মে ঈশ্বরলাভ না করতে পারে, তবে ইহজন্মের সুকৃতি তার সঙ্গে পরজন্মেও যায় এবং সেই জন্মেও সে ক্রিয়াযোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যে কর্ম নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে তাকে 'সহজ কর্ম' বলে। অতএব একজন 'ক্রিয়াযোগী'-র ক্ষেত্রে তার 'সহজ কর্ম' হলো পূর্ব জন্মে 'ক্রিয়া' অভ্যাস করে তার যে আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটেছে, তাই ; আর সেই কারণেই ইহজন্মেও সেই ব্যক্তি দ্রুত উন্নতি করার জন্য স্বাভাবিকভাবে 'ক্রিয়াযোগে'র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

মেজদা একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "তুমি 'গীতা' পড় ?"

আমি বললাম ঃ "মাঝে মাঝে পড়ি, তবে সব বুঝতে পারি না।"

মেজদা বললেন—"যখন যা বুঝতে পারবে না আমাকে অথবা গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করে নেবে।"

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানু বর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ৷৷"

(৪র্থ অধ্যায়, ১১ শ্লোক)

—যে যেরকম ভাবে আমাকে ভজনা করবে সে সেইরকম ভাবেই আমাকে পাবে। ঈশ্বরকে অনেক ভাবেই ভজনা করা যায় যেমন নাম কীর্তন, মালা জপা, অভ্যাস যোগ, ক্রিয়া যোগ ইত্যাদি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ "যত মত ততো পথ।" খুবই সত্য কথা তবে কোনো কোনো পথ দীর্ঘ আবার কোনো কোনো পথ দিয়ে শীঘ্র পেঁছান যায়। যেমন এখান থেকে কাশ্মীর যেতে হলে গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, মোটর, ট্রেন বা প্লেনে যাওয়া যেতে পারে। প্লেনে কিন্তু অন্য সবার আগে পেঁছান যায়। সেইজন্য ক্রিয়াযোগকে আমি ভগবানের কাছে পেঁছানর 'এরোপ্লেনের পথ' বলি।

পার্থিব বিষয়বস্তু অবাধ্য মনে যতই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করুক্ না কেন, 'ক্রিয়াযোগ' অনুশীলন করে তাকে শুদ্ধ এবং স্ববশে আনা যায়। মনকে বশে আনার প্রয়োজন কেন জান ? ভগবান এঁটো মন নেন্ না। তার মানে—মনে কামনা-বাসনার লেশমাত্র থাকলেও ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ হয় না। আমাদের মনে জন্ম-জন্মান্তরের এবং ইহজন্মের বহু কামনা বাসনা সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। একমাত্র ক্রিয়াযোগ অভ্যাসেই মন দ্রুত বাসনাশূন্য হয়। কি করে হয় বলছি। এই যে আমাদের মেরুদণ্ড তাতে 'মূলাধার' থেকে 'সুষুম্না' পর্যন্ত কয়েকটি চক্র আছে। মেরুদণ্ডের মধ্যে যে সুষুম্না ছিদ্র আছে তার বাম ও দক্ষিণে যথাক্রমে 'ইড়া' আর 'পিঙ্গলা' নামে দুটি নাড়ী আছে। জাগ্রত অবস্থায় আমাদের মন ও শক্তি বহির্জগতের বিষয়বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় প্রাণপ্রবাহ মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে নিম্নাভিমুখী হয় এবং চক্রসকল, ইন্দ্রিয়, সমস্ত অবয়ব ও স্নায়ুপথ ধরে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

এই বহির্মুখী প্রবাহ থেকেই পার্থিব বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমাদের মনে আগ্রহ ও বাসনা জন্মায়। গুরু নির্দেশিত প্রথায় 'ক্রিয়া' অনুশীলন করলে মেরুদণ্ড চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন প্রাণপ্রবাহ 'ইড়া' ও 'পিঙ্গলা' এই নাড়ী পথে অন্তর্মুখী হয়ে চক্রগুলির মধ্য দিয়ে সুষুম্নাতে যায়। তারই ফলে মানুষের মনে আধ্যাত্মিক জাগরণ দেখা দেয়। তখন সকল চিন্তা সকল চেতনা কেন্দ্রীভূত হয়ে ভগবানের দিকে ধাবিত হয়। ভক্তের মনে সেই সময় যে অপূর্ব আনন্দ ও জ্ঞানের উদয় হয় তাকে কোনো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

হিমালয়ে কত নগ্নদেহ সাধু বরফের ওপর বসে উপাসনা করে থাকেন। কেমন করে তাঁরা তা করতে পারেন? দেহের অনুভূতি থেকে চেতনা সরিয়ে নিতে পারেন বলেই তাঁদের পক্ষে তা সম্ভবপর হয়। (বাবার বয়স যখন আশি বছর সেই সময় তাঁর হার্নিয়া অপারেশন করা হয়। অপারেশনের সময় তিনি কোনো অ্যানিসথেটিক ব্যবহার করতে দেন নি। দীর্ঘকাল 'ক্রিয়াভ্যাস' করে চেতনাকে দেহমুক্ত ও অন্তর্লীন করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে অ্যানিস্‌থেটিক ব্যবহারের প্রয়োজন হয়নি।) (লেখকের মন্তব্য)

গীতার ১০ম অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোকে বলা হয়েছে:

"সর্ব মেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্‌ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥"

সাধারণ লোকে এর অর্থ এই প্রকার করে থাকে যে দেবগণ ও দানবগণ যাঁর অন্ত পান না, আমরা কি করে তাঁর প্রকৃত তত্ত্ব জানতে পারি? কিন্তু মেজদা বলতেন এর মানে ঠিক্‌ তা নয়। ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে যাওয়া বাস্তবিকই সম্ভব। তখন সাধকেরও ব্রহ্মসদৃশ জ্ঞানলাভ হয়।

সব কিছুরই অন্ত আছে, শেষ আছে। কিন্তু ভগবৎ প্রেমের অনাবিল আনন্দের আর শেষ নেই। মন এই প্রেমে যত মজবে ততই অপার আনন্দে নিমগ্ন হবে। এ' আনন্দের তুলনা নেই। এ' হলো এক চিরনবীন চিরবর্ধমান আনন্দ। এই আনন্দের অনুভূতি একটু একটু করে আসে এবং ক্রমশঃ তা বাড়তে থাকে। শেষে সিদ্ধ পুরুষগণ সচ্চিদানন্দে নিমগ্ন হয়ে আত্মহারা হয়ে পড়েন। এইসব সিদ্ধাত্মাদের আর সমস্যা পরিপূর্ণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। অনন্তকালধরে তাঁরা অপার আনন্দসুখ ভোগ করতে থাকেন।

প্রশ্ন ও উত্তর

[মেজদার নিকট উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর সদুত্তরের অংশ বিশেষ]

প্রঃ প্রার্থনা করলে ফল পাওয়া যায় কি? অনেকেই তো প্রার্থনা করে তবে সকলে ফল পায় না কেন? ভগবানের সাড়া পাবার জন্যে কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়?

উঃ ভগবান এঁটো মন নেন্ না। বাসনাপূর্ণ মন নিয়ে প্রার্থনা করাও যা, ভক্তির উচ্ছিস্ট অংশ ভগবানকে নিবেদন করাও তাই—দুই এক কথা। 'ক্রিয়া' করে কামনাশূন্য হয়ে মন-প্রাণ এক করে প্রার্থনা করতে হয়। অন্তরের ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হয়, তাঁর জন্য কাঁদতে হয়। তবেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, তাঁর দর্শনলাভ হয়। মনে অপূর্ব আনন্দানুভূতি জাগে, হৃদয়ে অসীম উপলব্ধির উদয় হয়।

"অখণ্ড মণ্ডলাকারম্ ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্
তৎপদম্ দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

"হে প্রভু, তুমিই পরম কারণ, তুমিই পরম সত্য। তুমি সর্বত্র এবং সর্বজীবে বিরাজমান। তুমিই সকল প্রাণ সৃজন ও পালন করো। আবার তোমাতেই সকল জীব তাদের শেষ আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।"

[স্কন্দ পুরাণ, "উত্তর খণ্ড" "গুরু গীতা" শেলাক ১৪৮, ১৮২]

ঈশ্বরকে পেতে হলে যে তপশ্চর্যা করতে হয় যেমন ব্রহ্মচর্য্য, ধ্যান, প্রাণায়াম ও সমাধি ইত্যাদি, তা অত্যন্ত ক্লেশকর বলেই বোধ হয়, কারণ ঐ সকল আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ। কিন্তু সাধক যদি নিষ্ঠাভরে আপন সংকল্পে অটল থাকেন, তাহলে পরিণামে আত্মপ্রসাদ বা পরম সন্তোষ লাভ হয়ে থাকে।

আত্মজ্ঞানী যোগী এক প্রকার উপমা রহিত সুখ প্রাপ্ত হন্। সে সুখ বিষয় নিরপেক্ষ সুতরাং তা নিরতিশয় অর্থাৎ তারতম্য রহিত নিবিড় সুখ যা বাক্য বা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। এই প্রকার সুখকে "সাত্ত্বিক সুখ" বলে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"আপনার চিতে নিবিড় নিভৃতে
যেথায় তোমারে পেয়েছি জানিতে
সেথায় সকলি স্থির নির্বাক
ভাষা পরাস্ত মানে।"

এই জগৎ এবং জাগতিক সমস্ত বস্তু 'অসৎ'। প্রতি মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জগৎ কত অনিত্য—কারোর একমাত্র সন্তান, কারোর স্বামী,

কে কোথায় মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। তবুও কিছুতেই আমাদের জ্ঞান হচ্ছে না, আমরা প্রতিনিয়ত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি, তার জন্য কত নীচতার আশ্রয় নিচ্ছি।

"হা কৃষ্ণ, অজ্ঞানতার বীজ নষ্ট করে দাও। পার্থিব কামনা-বাসনা ক্ষয় করে দাও। মুক্তির পথ দেখিয়ে দাও (সুষুম্নার পথ)। তোমার সোনার কাঠির স্পর্শে আমাদের জাগিয়ে দাও। তোমার শ্রীচরণে অচলা শ্রদ্ধা ভক্তি দাও। আমাদের সকল মোহ দূর করো। সর্বোপরি তোমার মোহিনী মায়া সরিয়ে নাও।"

"স্বর্গ, মর্ত্য, ও সকল জীবজগত তোমার থেকেই সৃষ্ট হয়ে আবার তোমাতেই সর্বতোভাবে প্রবেশ করছে। তুমিই যে পরম ব্রহ্ম, তুমিই যে পরম সত্য—সেই জ্ঞান আমাদের মধ্যে জাগ্রত করো। আমরা যেন চিরদিন তা স্মরণ করি।"

(তৈত্তিরীয় উপনিষদ ৩ঃ১)

"তোমার দয়াতেই জীব দেহধারণ করে ; তোমার দয়াতেই অন্ধ দৃষ্টিশক্তি পায়, মূক বাচাল হয়ে ওঠে, পঙ্গু পর্বত আরোহণ করতে পারে। হে পরম ব্রহ্ম, তোমাকে আমার প্রণাম জানাই ; তোমাকে নিত্য স্মরণ করি।"

(ভবিষ্য পুরাণ)

"সূর্য্য, চন্দ্র, তারকাগণ, বজ্র, অগ্নি—সকল বস্তু তোমার প্রভাতেই প্রভাময়। তোমারই জ্যোতিতে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হয়ে রয়েছে। সেই জ্যোতি যেন সদা আমাদের মধ্যে জাগরূক থাকে।"

[কঠোপনিষদ ২ঃ২ঃ১৫]

"বিদ্যুতের সাহায্যেই ট্রাম ট্রেন চলছে, আলো জ্বলছে পাখা ঘুরছে। সেই বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে গেলে, যে যেমন অবস্থায় আছে সে সেখানেই থেমে যাবে। সেইরকম সাধারণ মানুষের অদৃশ্য তোমার শক্তিতেই আমরা সঞ্জীবীত হয়ে আছি। তুমি না থাকলে সব ধ্বংস হয়ে যেতো। তুমি আছ তাই আমি আছি। তুমিই আমার প্রাণ। এই জ্ঞান যেন সর্বদা আমার মনে জাগরূক থাকে। যে কয়দিন এ'দেহে প্রাণ আছে ততদিন আমার চোখদুটি যেন তোমার দিকেই নিবদ্ধ থাকে। কম্পাসের কাঁটা যেমন সর্বদা ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে স্থির ইঙ্গিত করে তেমনি সকল অবস্থাতেই যেন আমার মনটিকে তোমার চরণে স্থির রাখতে পারি।

"সকল মায়া বন্ধন সরিয়ে নাও। আর শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার সময় যেন আমার প্রজ্ঞাচক্ষু সেই আত্মজ্যোতি পরমাত্মায় আটকে যায়। সে সময় যেন অন্য কোনো দিকে মন না যায়। শুধু তোমার চরণ স্মরণ করতে করতেই দেহত্যাগ করতে পারি।"

যোগ সঙ্গীতের এই গানটি যেন সর্বদা মনে থাকেঃ

দেহমাঝে প্রাণ আছে যতদিন
ততদিন কর সাধনা।

নতুবা যে দিন হারাইবে প্রাণ
সে'দিন সে' ভাব পাবে না ॥
যে ভাবে অন্তিমে ত্যজিবে জীবন
সে ভাবে এ' ভবে হবে জন্ম পুনঃ,
এখন হতে যদি না কর সাধন
সে' দিনে যাবে না বাসনা ॥

মরণকালে জীবের চেতনা যদি বাসনাপূর্ণ থাকে তাহলে তার পুনর্জন্ম হয়। আর সে সময় তার মনপ্রাণ যদি ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে তাহলে তার মুক্তিলাভ ঘটে। মরণ সময় মনের সংকল্প শক্তি যে ভাবকে আশ্রয় করবে, সূক্ষ্ম শরীরও তদনুরূপ মূল শরীর রচনা করবে। মৃত্যুকালে মন জীবের সকল কামনাবাসনা এবং কর্মজীবনে সে যা করেছে তাকে সূক্ষ্মভাবে নিয়ে যায় এবং সেই অনুসারে তার পরবর্তী জীবন গঠিত হয়। যেমন বট-বৃক্ষের ক্ষুদ্র বীজে নতুন বটবৃক্ষ লুক্কাইত থাকে, যেমন রেকর্ডের সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্যে শব্দ ধরে রাখা হয় শুধু পিনের স্পর্শে সে আবার বেজে ওঠে, সেইরকম পূর্ব জীবনের কর্মফল সূক্ষ্ম শরীর বহন করে আনে এবং নতুন জীবনে তা আবার স্বপ্রকাশিত হয়।

মৃত্যুর পর সবাই যখন দেহটাকে পুড়িয়ে ছাই করে বাড়ী চলে যায়, তখন দেহমুক্ত আত্মা ভাবে—কোথায় যাব? বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সবাই কোথায় গেল?

রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই পংক্তিকটি যেন মনে থাকেঃ

"পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে
ভেবে মরি সদা কি জানি কি হবে।
নতুনের মাঝে তুমি পুরাতন,
সে কথা যে ভুলে যাই ॥

তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর
নাহি কোনো মানা নাহি কোনো ডর।
সবারে মিলায়ে জাগিতেছ তুমি
দেখা যেন সদা পাই ॥

(গীতাঞ্জলি)

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিন ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেবো ॥

[পাণ্ডবগীতা, 'অনুশাসন পর্ব' মহাভারত]

শুনেছি তেলেপোকাকে দেখে কাঁচপোকা এত ভয় পেয়েছিল যে সর্বক্ষণ তার কথা চিন্তা করতে করতে পরজন্মে নিজেই তেলেপোকা হয়ে জন্মেছিল। সেই-রকম অনুক্ষণ ব্রহ্মধ্যান করতে করতে তুমি আমিও ব্রহ্ম হয়ে যেতে পারি।

আমরা যেন সদা ধ্যান করি :

অহমাত্মা ন চন্যোয়স্মি
ব্রহ্মাহিবাহং ন শোকভাক্
সচ্চিদানন্দরূপোহম্
নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ।

[ব্রহ্মঅনুচিন্তনম্—আদিশংকরকৃত ৭ম শ্লোক]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

চরণ ধরিতে দিও গো আমারে
নিও না নিও না সরায়ে।
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষে রহিব জড়ায়ে।

[“গীতবিতান”, পর্যায় পূজা, শ্লোক ১০৪]

“হে প্রভু, তুমি ছাড়া আমার আর কেউই নাই। আমি তোমার শরণ নিয়েছি—তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়। আমার মতো তোমার অনেক ভক্ত থাকতে পারে, কিন্তু তুমিই আমার সব। সুগভীর প্রেমভরে একমেবাদ্বিতীয়ম তোমারই চরণে যাতে মনকে সদা সর্বদা কম্পাসের কাঁটার মত লাগিয়ে রাখতে পারি, সেই মতিগতি করে দাও ঠাকুর। সমস্ত মায়া-বন্ধন দূর কর, আমাকে জীবন্মুক্ত কর। সকল মলিনতা, সকল পাপ থেকে মুক্ত কর।

“নুনের পুতুল যেমন সমুদ্র মাপতে গিয়ে নিজেই সমুদ্র হয়ে গিয়েছিল, তেমনি তোমার মাঝে আমিও হারিয়ে যেতে চাই।”

প্রঃ—দেখ মেজদা, ‘ক্রিয়া’য় বসলেই নানা কথা ভিড় করে এসে মনকে চঞ্চল করে দেয়। এর উপায় কি ?

উঃ—মেজদা আমাকে একটা কাঁচের গ্লাসে জল আর কিছু ধুলামাটি আনতে বললেন। তারপর সেই গ্লাসের জলে ধুলামাটি মিশিয়ে গ্লাসটিকে আমার সামনে রেখে বললেন :

“গেলাসে ঘোলা জল দেখছ বটে কিন্তু ধুলাবালির কণাগুলি কি দেখতে পাচ্ছ ?”

আমি বললাম—“না”।

—“খানিকক্ষণ অপেক্ষা কর।”

কিছুক্ষণের মধ্যেই ধুলার কণাগুলি আস্তে আস্তে নীচের দিকে জমতে আরম্ভ করল আর সেই সঙ্গে জলও ক্রমশঃ পরিষ্কার হতে লাগল। আরও অপেক্ষার পর জল একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল, শুধু ধুলাবালিই গেলাসের নীচে পড়ে রইল।

মেজদা বললেন, ‘এ’ থেকে কি বুঝলে ? আমাদের মনের মধ্যে নানা চিন্তা একসঙ্গে জট পাকিয়ে আছে। ‘ক্রিয়া’য় বসলে তাই প্রথমেই দেখতে পাই মন অস্থিরতায় ভরে-রয়েছে। জলের তলায় যেমন একটা একটা করে ধুলিকণা জমতে থাকে, সেই রকম এক একটি চিন্তা আলাদা আলাদা হয়ে দেখা দেয়। তাই বলে মনে কোরোনা মন আরও চঞ্চল হয়ে যাচ্ছে। ঐ

গেলাসের জলের মত অপেক্ষা কর ও স্থির হয়ে বসে 'ক্রিয়া' কর। দেখবে সব চিন্তা থিতিয়ে শেষ পর্য্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেছে।" চমৎকার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি যা আজ পর্য্যন্ত ভুলিনি।

প্রঃ—'পরম জ্যোতি'র কথা প্রায়ই বল। সেই জ্যোতির দর্শন কি করে পাওয়া যেতে পারে?

উঃ—উচ্চকোটি সাধক যখন ইন্দ্রিয় সকল থেকে চেতনা ও সূক্ষ্ম প্রাণশক্তিকে মুক্ত করে 'কূটস্থে' তাদের কেন্দ্রীভূত করেন তখন অকস্মাৎ এই পরম জ্যোতির আবির্ভাব হয়। এই আলোর বর্ণ নবোদিত অরুণের ন্যায়; তার প্রভা ও শক্তি কোটি কোটি সূর্য্যতুল্য। অথচ এই পরম জ্যোতির দ্যুতি চন্দ্রকিরণের ন্যায়ই সুশীতল। চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হলেও তাকে কোনো গণ্ডির দ্বারা আবৃত করা যায় না। সেই তেজোরাশি কি ঊর্ধ্বে, কি পার্শ্বে, কি মধ্যে—কোনদিকে পরিচ্ছিন্ন হইবার নয়। বহু ভাগ্যে সেই 'ক্রিয়া' পাওয়া যায় যার দ্বারা এই জ্যোতি দর্শন হয়।

প্রঃ—আমরা যে অন্ন ভক্ষণ করি তা শরীরে কি কি কাজ করে?

উঃ—খাদ্যবস্তু হলো কম্পমান জীবন শক্তির স্থূল প্রকাশ মাত্র। অন্ন ভুক্ত হয়ে তিন প্রকারে বিভক্ত হয়ে থাকে। ভুক্তান্নের যা স্থূলতম ভাগ তা বিষ্ঠা হয়। যে অংশটি আমাদের প্রাণক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তা দেহ কোষ, রক্ত ও অস্থি গঠনে সাহায্য করে। আর অন্নের সূক্ষ্মতম ভাগ আমাদের মানসিক ক্রিয়ার পুষ্টিবর্ধন করে।

প্রঃ—পাপ কাকে বলে?

উঃ—অশুভ কামনা আর অসৎ সংকল্পই পাপ—অন্যায় অনুষ্ঠান বা কার্য করাই শুধু পাপ নয়। 'ক্রিয়া' যোগ অভ্যাস করতে গিয়ে মনে অশুভ চিন্তার উদয় হলে তৎক্ষণাৎ তাকে পরিত্যাগ করা উচিত। যে যোগী ফলাকাঙ্খা না করে শুধু 'আত্মধর্ম' পালন করে যায়, তার কোন পাপ হয় না। অতএব তুমি প্রবৃত্তি নিগ্রহে যত্নবান হও। সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়—এই সব দ্বৈত চিন্তাধারা ত্যাগ করো। ইন্দ্রিয়ধর্মে আসক্তি থাকলেই অন্তরাকাশ অন্ধকারে ভরে যায়, আত্মজ্যোতি দেখতে পাওয়া যায় না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্ব, নির্যোগক্ষেম ও আত্মবান হতে উপদেশ দিয়েছেন।*

'সুষুম্না'র মধ্যে 'ব্রহ্মনাড়ী' আছে। তারই মধ্য দিয়ে চৈতন্য ঊর্ধ্বপানে পরমাত্মার দিকে উত্থিত হয়। এই 'ব্রহ্মনাড়ী'র মধ্যস্থিত 'আকাশ'কে 'নিত্যসত্ত্ব' বলে। মন এই নিত্যসত্ত্বস্থ আকাশে উপস্থিত হলেই পরমাত্মার কৃপাদৃষ্টি পাওয়া যায়।

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥"

(ভগবদ্গীতা ২:৪৫)

অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিকে যোগ বলে এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষাকে 'ক্ষেম' বলে। গীতার এই শ্লোকটির (২ ঃ ৪৫) অর্থ হলো ঃ অলব্ধ বস্তুর লাভে ও লব্ধ বস্তুর রক্ষায় তুমি যত্নশূন্য হও অর্থাৎ তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও।

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন ঃ "ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি আত্মাকে যে মায়াবন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে, তা থেকে মুক্ত হও, 'নিস্ত্রৈগুণ্য' হও।" এর অর্থ হলো মন এবং চেতনাকে ব্রহ্মপদে নিশ্চিতভাবে স্থির রাখ। মন যখন 'আজ্ঞাচক্র' পার হয়ে 'কূট' ভেদ করে—যা হলো 'সহস্রা'র প্রবেশ পথ—তখন তোমার ওপর গুণক্রিয়ার আর কোনো কার্যকরী প্রভাব থাকে না। তখন নিষ্ক্রিয় সহস্রা পদ্মের মত প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে এবং জ্ঞানজ্যোতি বিকশিত হয়। সেই জ্যোতিতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত আত্মার প্রত্যক্ষীভূত হয়। তখন 'আত্মা' 'মায়া'কে অতিক্রম করে মহেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়।

প্রঃ—সাধনকালে এক ভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে পা ও শরীর অবশ ও অচল হবার উপক্রম হয়। এর প্রতিকার কি?

উঃ—দীর্ঘ সময় 'ক্রিয়া' করার পর 'মহামুদ্রা' করতে হয়। 'মহামুদ্রা' হলো 'আসন' ও 'প্রাণায়ামে'র সংমিশ্রণ—যেটা ক্রিয়াযোগে শেখানো হয়েছে। এর ফলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয় এবং সে'কারণে শিরা উপশিরা, পেশী, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও গ্রন্থিসকল সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে ও সবল হয়। অন্য 'আসন' (হঠ যোগ) এর মত উপকারী হয় না। একে সবচেয়ে সেরা আসন মনে করা হয় বলেই এর নাম হয়েছে 'মহামুদ্রা'।

প্রঃ—সৎ কি আর অসৎ-ই বা কি?

উঃ—'সৎ' হলো যার অস্তিত্ব আছে, আর 'অসৎ' হলো যার অস্তিত্ব নেই। যা দেশ ও কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ তাই 'অসৎ'; অর্থাৎ যা এখানে আছে অন্যত্র নাই তা দেশ পরিচ্ছেদের অধীন, অতএব তা অসৎ। যা পূর্বে ছিল না পরেও থাকবে না কিন্তু এক্ষণে আছে তা কাল পরিচ্ছেদের অধীন। সুতরাং তাও 'অসৎ'। যেমন সমুদ্রের জল সৎ-স্বরূপ কিন্তু তরঙ্গ হলো তার এক ক্ষণ বিধ্বংসী বিকাশ মাত্র। তাই অসৎ। সেই রূপ সৃষ্টি হলো দেশ ও কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ; সুতরাং তা সর্বব্যাপী বা অবিনশ্বর হতে পারে না। তাই একমাত্র পরমাত্মাই হলো 'সৎ', কারণ সেখান থেকে যাবতীয় সৃষ্টি-কার্য সংঘটিত হচ্ছে এবং শুধু পরমাত্মাই সর্বকালে ও সর্বদেশে বিরাজমান।

প্রঃ—ক্রিয়াভ্যাসের সুফল কি একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন?

উঃ—প্রাচীন মুনি ঋষিরা স্বজ্ঞার সাহায্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যোগ উপলব্ধি কোরে বহু চিন্তার পর 'ক্রিয়াযোগ' রূপ অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের উদ্ভাবন করেন। ব্যাপারটা তোমাকে একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে বোঝাই ঃ অসৎ সঙ্গে মিশলে লোকে অসৎ হয়, আবার সৎ সঙ্গে মিশলে লোকে সৎ হয়। সাধক চায় ঈশ্বর বাসনা ছাড়া আর সব বাসনার নিবৃত্তি-সাধন। কিন্তু ঈশ্বর-ভাবনা করা আবার বাসনা রহিত হওয়া—দুই-ই একসঙ্গে কি ভাবে করা যায়?

আমরা যে দিন থেকে জন্মেছি সেই দিন থেকে শ্বাস গ্রহণ করছি আবার ত্যাগ করছি এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাই করবো। এই যে শ্বাস ক্রিয়া যা আমাদের প্রাণ কার্যকে অব্যাহত রেখেছে এবং আত্মাকে দেহবন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে তা আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে গ্রাহ্য না করেই আপনা-আপনি ঘটে চলেছে। 'ক্রিয়া' অভ্যাসের দ্বারা আমরা নিজেদের দেহ-সংযুক্ত না করে প্রাণ ক্রিয়ার সংগে সংযুক্ত করিঃ শ্বাস-প্রশ্বাস, জীবন, শক্তি, চেতনা—সবই একীভূত হয়ে যায়। তাই 'ক্রিয়া'ভ্যাসের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গ করলে আমরা শেষ পর্য্যন্ত দেহ-চেতনা থেকে মুক্ত হতে পারি। আর তা হলেই বাসনা মুক্ত হয়ে ভূমানন্দও পেতে পারি। সুতরাং ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য এই পদ্ধতি অনুসরণ সকলেরই করা উচিত, নয় কি?

কি সুন্দর ও সহজ ভাবে মেজদা সব বুঝিয়ে দিলেন ; এ কি কোনদিন ভোলা যায়?

প্রঃ—আমরা যে ওম্ মন্ত্র চক্রে চক্রে জপ করি তার অর্থ কি?

উঃ—ওম্-কারের অপর নাম 'প্রণব'। ঈশ্বরের নামই এই শব্দের দ্বারা সংকেত করা হয়। অনুকম্পনশীল বিশ্বে এই ওম্-কারই হলো ঈশ্বরের 'নাদ' এবং তাঁর উপস্থিতির প্রতীক। পরব্রহ্মকে কতকগুলি শব্দ, পদার্থ বা চিন্তা রূপে উপলব্ধি করতে না পারলে তাঁর বিষয়ে কোন বোধ জন্মে না। যে সকল প্রতীক মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানা যায় তার মধ্যে ওম্ হলো সবচেয়ে পবিত্র। এই ওম্ধ্বনির মধ্যেই একত্রে রয়েছে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সকল ধারণা ও তাঁর সর্বময় প্রকাশ। ওম্ এই শব্দ উচ্চারণে যেরূপ চিত্তস্থৈর্য্য বা ঈশ্বরের সঙ্গে মনের দিব্য একতানতা লাভ হয়, তেমনটি অন্য কোনো প্রতীক বা মন্ত্র উচ্চারণে সিদ্ধ হয় না। ওম্-কার মন্ত্র জপ করলে ভগবৎ দর্শন হয়।

প্রঃ—আত্মার স্বরূপ কি?

উঃ—আত্মা আনন্দ স্বরূপ। তাই যদি হয় তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে—মানুষের এত দুঃখ কেন? 'অবিদ্যা' বশতঃ আত্মাকে একদিকে যেমন বিরুদ্ধ ধর্মী অপর দিকে আবার সর্ব ধর্মাতীত বলে প্রতীত হয়। আত্মা স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ হয়েও সর্বত্র অপ্রকাশিতের ন্যায় রয়েছেন। আবার সদা মুক্ত হয়েও তাকে বন্ধন দশাগ্রস্তের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। আত্মার এই পরস্পরবিরোধী ভাব বড়ই আশ্চর্য্যজনক—তাই নয় কি?

আত্মা হলো শুভ্র জ্যোতির্ময় কিন্তু অন্য সব ভৌত আলোর মত তাতে উত্তাপও নেই বা ছায়াও সৃষ্টি করে না। আত্মা নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক। আত্মা শ্রবণ দর্শন কিছুই করে না, কিংবা কোনো ব্যাপারে লিপ্তও নয়। তথাপি 'কূটস্থ' চৈতন্যরূপে আত্মা সর্বদ্রষ্টা ও সর্বজ্ঞানী।

আত্মা হলো 'সচ্চিদানন্দস্বরূপ' অর্থাৎ নিত্য স্থায়ী জ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ। যা কিছু মানসিক ক্রিয়া সবই শারীরিক যন্ত্র অথবা প্রাকৃতিক গুণের সাহায্যেই হয়। আত্মা করেন না। আত্মা স্বভাবতই দুর্বিজ্ঞেয় হলেও তাকে জানবার উপায় আছে। শাস্ত্র পাঠ, শাস্ত্র কথা শ্রবণ বা বোধির দ্বারা শাস্ত্রার্থ

জ্ঞানেও তিনি লভ্য নন্। কিন্তু যে সাধক শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করেন, ঈশ্বর তারই কাছে নিজের স্বরূপ প্রকটিত করেন এবং ভক্তও বুঝতে পারে ক্ষুদ্র 'জীবাত্মা' পরমাত্মারই অংশ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন :

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি—
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

(ভগবদ্গীতা ২ : ২০)

—এই আত্মা কখনও জন্মান না বা মরেন না। উৎপন্ন হন্নি বা উৎপন্ন হইবেন না। ইনি অজ, নিত্য ও শাশ্বত। শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ হয় না। "জলের মধ্যে সূর্য্য যেমন স্থিত থাকেন, আত্মাও সেইরূপ শরীরে অবস্থান করেন। জল শুকিয়ে গেলেও সূর্য্য বিনষ্ট হন্ না। সেইরূপ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হলে শরীরস্থ আত্মার সুখ-দুঃখাদি দ্বৈত গুণের সঙ্গে কোনো সংশ্রব থাকে না।

যাহার উৎপত্তি আছে তাহারই আদি আছে। যাহা গুণ বিশিষ্ট তাহারই রূপান্তর ঘটে। অনাদি ও নির্গুণ বলে পরমাত্মা বিকারবিহীন। সুতরাং দেহে অবস্থিত থাকিয়াও তিনি কিছুতেই লিপ্ত হন্ না। গীতায় আছে :

"যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥"

(১৩ : ৩৩)

আকাশ যেমন সর্বত্র বিরাজ করিয়াও কোনো কাল, স্থান বা বস্তুর সুগন্ধ-দুর্গন্ধ, বর্ষা, আতপ, অগ্নি, ধূম ও পংকাদির গুণ বা দোষে লিপ্ত হয় না, আত্মাও সেইরূপ দেব, দানব, গন্ধর্ব, মানব পশ্বাদি দেহে থাকিয়াও তাহার প্রাকৃতিক ধর্মে লিপ্ত হন্ না।

প্রঃ—মানুষ মারা গেলে দেহে যে আত্মা আছে সে কোথায় যায় ?

উঃ—"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

(ভগবদ্গীতা—২ : ২২)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন : মানুষ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে যেমন নতুন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ দেহী (আত্মা) এই জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে আবার এক নতুন দেহে প্রবেশ করে।

প্রঃ—আত্মা কি ভাবে বিরাজ করছেন ?

উঃ—এই জড় জগতে আত্মার চেয়ে মহান্, পবিত্র ও মহোত্তম আর কিছুই নাই। জীব শরীরে তিনি বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে জ্যোতির্ময় অদ্বিতীয় রূপে বিরাজ করছেন। পরব্রহ্মের সঙ্গে একত্র হয়ে সর্বজগৎ পরিপূর্ণ করে রয়েছেন। এই 'আত্মা' অব্যক্ত অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তার দ্বারা তাঁর তল পাওয়া যায় না। তিনি হলেন বিরাট, অনন্ত, সর্বোত্তম ও অধিকারী অর্থাৎ তাঁর কোনরূপ বিকার বা পরিবর্তন নাই।

প্রঃ—শুনেছি যোগ সাধনার ফলে অনেক রকম শক্তিলাভ হয়। তাকেই কি 'সিদ্ধি' বলে ? সেই 'সিদ্ধি' কত রকমের হয় ?

উঃ—এই সিদ্ধি আট প্রকার যথা (১) অনিমা (২) মহিমা (৩) লঘিমা (৪) গরিমা (৫) প্রাপ্তি (৬) প্রাকাম্য (৭) ঈশিত্ব (৮) বশিত্ব

(১) অণিমা—নিজের শরীরকে (অথবা অন্য যে কোন বস্তুকে) ইচ্ছানুসারে অণুর মত ক্ষুদ্র করার ক্ষমতা।

(২) মহিমা—নিজ শরীরকে যথেচ্ছ বিস্তারিত করার ক্ষমতা।

(৩) লঘিমা—নিজ শরীরকে লঘু এমনকি ভারশূন্য করার শক্তি।

(৪) গরিমা—শরীরকে স্থূল করার ক্ষমতা।

(৫) প্রাপ্তি—ইচ্ছানুসারে যে কোনো দ্রব্যকে লাভ করার ক্ষমতা।

(৬) প্রাকাম্য—ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে যে কোনো বাসনা চরিতার্থ করার ক্ষমতা।

(৭) ঈশিত্ব—সর্বভূতের উপর আধিপত্য করার শক্তি।

(৮) বশিত্ব—সকলকে বশ করার ক্ষমতা।

এই অষ্টসিদ্ধি যোগ সাধনার দ্বারা লাভ করা যায়। যে যোগী স্বানুভূতি-লাভ করেছেন, তিনি এই অষ্টসিদ্ধি লাভ করে 'জীবন্মুক্ত' হন্। সেই জীবন্মুক্ত অবস্থায় মৃত্যু জয়ী হয়ে তিনি স্বাধীনভাবে সর্বলোকের মঙ্গলে রত থাকেন। যেমন শোনা যায় মহাবতার বাবাজী মহারাজ এখনও জীবিত এবং বহু জায়গায় আবির্ভূত হয়ে তিনি অনেককে দর্শনও দিয়েছেন ও জীবের উপকারার্থে 'ক্রিয়াযোগ' সাধনা প্রচার করে গেছেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী এবং আমার পরমপ্রিয় গুরু ও পরমগুরু স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজী ও লাহিড়ী মহাশয়, পতঞ্জলি বর্ণিত এই সকল অষ্টসিদ্ধির অধিকারী ছিলেন।

প্রঃ—'গীতা'র মাহাত্ম্যই বা কি এবং 'গীতা' পাঠের উপকারিতাই বা কি, একটু ব্যাখ্যা করে বলুন।

উঃ—মহামুনি ব্যাসদেব ('মহাভারতে'র গ্রন্থকার, যার একটি অংশ হলো শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা) গীতা মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ

পার্থো বৎস সুধী ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।

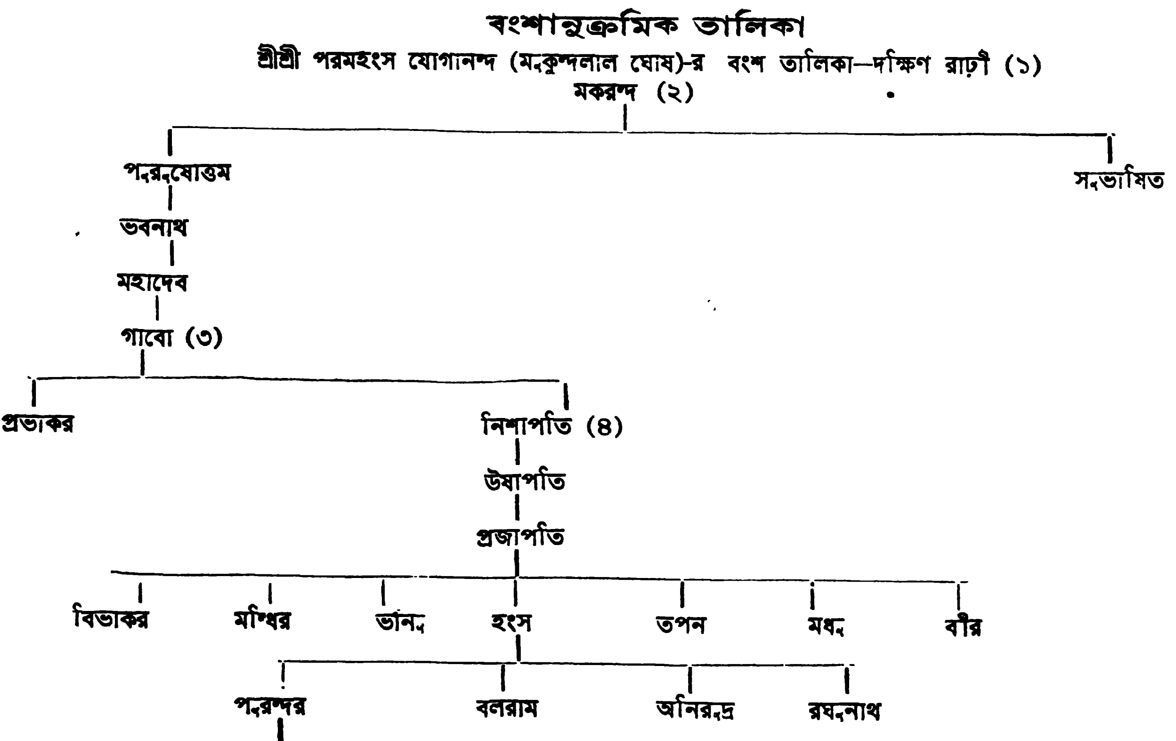
অর্থাৎ উপনিষদগুলি হলো গাভী ; শ্রীকৃষ্ণ হলেন দোহনকারী ; পার্থ হলেন বৎস এবং গীতার পরমামৃতময় বাণী হলো দুগ্ধ। সুধীগণ এই অমৃত পান করে অমরত্ব পান। সর্বলোকের উপকারের জন্য অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করে এই গীতামৃত যিনি দান করেছেন, সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম জানাই। যে ব্যক্তি মায়াময় এই ঘোর সংসার-সাগর পার হতে ইচ্ছা করেন, গীতারূপ নৌকাকে আশ্রয় করে পরমসুখে তিনি তা পার হয়ে যান। গীতায় 'জ্ঞান', 'ভক্তি' ও 'কর্ম' তত্ত্ব এবং সগুণ ও নির্গুণ পরব্রহ্মের বিষয়ে সর্বোচ্চ জ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে। তাই 'গীতা'কে সর্বধর্মশাস্ত্রের সারাৎসার এবং সমস্ত মানুষের মুক্তিপথ বলে অভিহিত করা হয়।

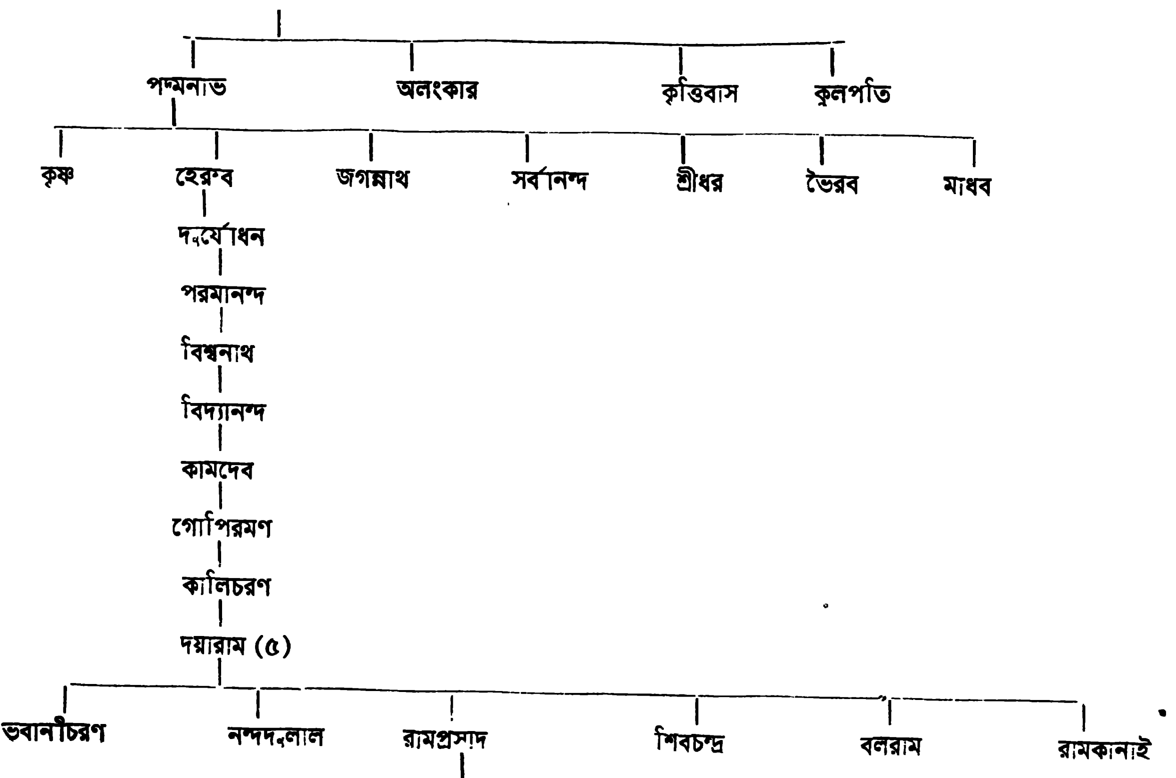
হিন্দু শাস্ত্রগুলিতে 'গীতা'র মাহাত্ম্য নানাভাবে কথিত আছেঃ

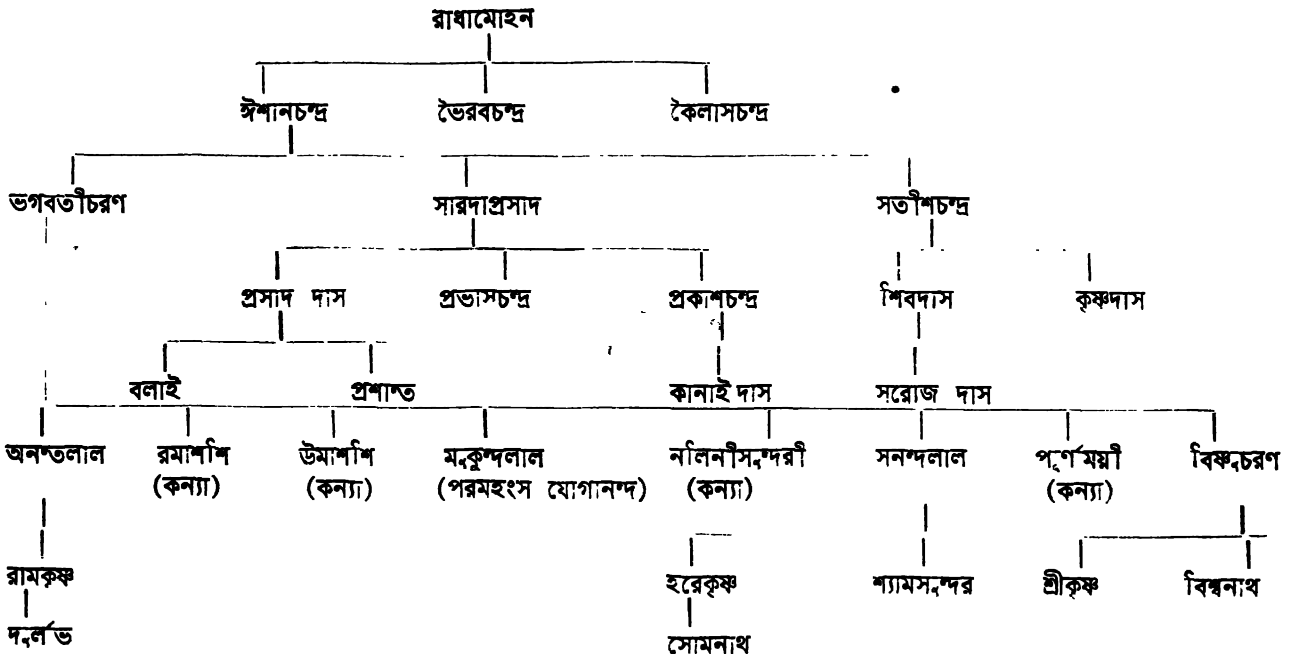
পবিত্র গীতারূপ জলাশয়ে স্নান করলে সংসারমালিন্য নাশ হয়...যিনি শালগ্রাম শিলার নিকট, দেবালয়ে বা শিবালয়ে, তীর্থস্থানে বা নদীতটে 'গীতা' পাঠ করেন তিনি অবশ্যই সৌভাগ্যলাভ করে থাকেন।...যে গৃহে গীতার অর্চ্চনা হয়, তথায় হিংসা বা ভয়ানক অভিশাপ জনিত কোনো দুঃখই উপস্থিত হয় না।...সেখানে ত্রিতাপজনিত পীড়া বা ব্যাধি, অভিশাপ বা পাপ, দুর্গতি বা নরক অথবা দেহে বিস্ফোটকাদি কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি হয় না।...'গীতা'তে যাহার প্রবৃত্তি হয়, জীবিতকালে এবং মরণান্তে সমস্ত দেবতা, ঋষি ও যোগীগণ তাঁহার দেহ রক্ষা করে থাকেন...অনাচার সম্ভূত ও অকথ্য বচন জনিত পাপ সকল ও অভক্ষ ভক্ষণজনিত কিংবা অস্পৃশ্য স্পর্শজনিত দোষসকল, জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত অথবা ইন্দ্রিয়জনিত যে কোনো দোষই হউক্ না কেন, সবকিছু গীতাপাঠ মাত্র বিনষ্ট হয়ে যায়...যিনি মরণকালে গীতার অর্থ শ্রবণ করেন বা পাঠ করেন, মহাপাতকযুক্ত হইলেও মুক্তিভাগী হয়ে থাকেন। যিনি গীতা-পুস্তক সংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া বিষ্ণুর সহিত আনন্দভোগ করে থাকেন। গীতার একটি অধ্যায়ও যদি মৃত্যুকালে কারোর নিকটে থাকে, তাহলে নীচ যোনি প্রাপ্ত না হয়ে তিনি মনুষ্যযোনি লাভ করেন এবং সেই দেহে গীতা অভ্যাসপূর্বক মুক্তিপদ লাভ করে থাকেন। মরণকালে কেউ যদি 'গীতা'—এই শব্দমাত্র উচ্চারণ করেন তবে তাতেই তাঁর সদগতি হয়। শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে গীতা পাঠ করলে তাঁরা যদি নরকস্থও থাকেন, তথাপি আনন্দলাভপূর্বক স্বর্গে গমন করেন।...মনুষ্য যখন কোনো কর্মের অনুষ্ঠান করেন সেই সময় গীতা পাঠ করিলে সেই সকল কর্ম নির্দোষ হইয়া সম্পূর্ণ ফলদানের সমর্থ হয়।...যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ না করিয়া পরমার্থলাভে যত্নবান হন, উন্মত্তের পরিশ্রমের ন্যায় তাহার তাহাতে কোনো ফলই লাভ হয় না। গীতা পাঠ করিয়া যিনি গীতার মাহাত্ম্যপাঠ না করেন, তাঁহার গীতা পাঠের ফল হয় না।...ভগবান বলেছেনঃ গীতা আমার হৃদয় গীতাই আমার সার ; গীতা আমার অব্যয় জ্ঞান স্বরূপ, আমার পরম স্থান এবং পরম পদ।

গীতা আমার পরম গুহ্য, আমার পরম গুরু। গীতা আশ্রয়েই আমি অবস্থিত। গীতা আমার পরম নিকেতন, গীতা জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই আমি ত্রিলোক প্রতিপালন করি...বেদ পাঠে বা দানে কিংবা যজ্ঞ ও ব্রতাদি দ্বারা দেবকীনন্দন ভগবান কৃষ্ণকে তাদৃশ সন্তুষ্ট করা যায় না, যেরূপ তিনি গীতা পাঠে পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন।...বেদ পুরাণাদি পাঠ করিলে যে ফল হইয়া থাকে ভক্তিপূর্বক একমাত্র গীতা পাঠ করিলেই তাহা সিদ্ধ হয়।

উদ্ধৃত শাস্ত্রোক্তিসমূহ থেকে যে কথাটি সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে তা হলো —ধর্মময়ী গীতা সর্বজ্ঞান প্রদায়িকা। কিন্তু এই আশীর্বাদ উপলব্ধির জন্য চাই ভক্তি, বিশ্বাস ও আন্তরিক সত্যনিষ্ঠা। অন্তরে অনুভূতি না হলে পর শুধু গীতা পাঠ বা শ্রবণ বা অর্চ্চনা করলে তা নিষ্ফলাই থেকে যায়। গীতা অধ্যয়নের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে শাস্ত্রে যে সব উক্তি আছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো —গীতায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথোপকথনের মাধ্যমে যে ভাব ব্যক্ত হয়েছে, ভক্ত যেন আপন অন্তরে তারই পুনরাবৃত্তি করতে অনুপ্রাণিত হন্। তবেই ঈশ্বরের প্রতি সাধকের আরাধনা সত্য হয়ে উঠবে এবং দিব্যজ্ঞান লাভ করে তিনি মোক্ষলাভ করবেন।


বংশানুক্রমিক তালিকা
শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ (মুকুন্দলাল ঘোষ)-র বংশ তালিকা—দক্ষিণ রাঢ়ী (১)
মকরন্দ (২)
পুরুষোত্তম
সুভাষিত
ভবনাথ
মহাদেব
গাবো (৩)
প্রভাকর
নিশাপতি (৪)
উষাপতি
প্রজাপতি
বিভাকর
মহেশ্বর
ভানু
হংস
তপন
মধু
বীর
পুরন্দর
বলরাম
অনিরুদ্ধ
রঘুনাথ


পদ্মনাভ
অলংকার
কৃত্তিবাস
কুলপতি
কৃষ্ণ
হেরম্ব
জগন্নাথ
সর্বানন্দ
শ্রীধর
ভৈরব
মাধব
দুর্যোধন
পরমানন্দ
বিশ্বনাথ
বিদ্যানন্দ
কামদেব
গোপিরমণ
কালিচরণ
দয়ারাম (৫)
ভবানীচরণ
নন্দদুলাল
রামপ্রসাদ
শিবচন্দ্র
বলরাম
রামকানাই



দ্রষ্টব্য : তালিকাটিতে পরমহংস যোগানন্দের সরাসরি বংশানুক্রম দেখানো হয়েছে। অন্যান্য শাখার কথা এখানে অনুল্লেখিত। তাছাড়া একমাত্র পরমহংসজীর ভগ্নীগণ ছাড়া পরিবারের অন্য কন্যাদের নামও এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

(১) 'দক্ষিণ রাঢ়ী' : ঘোষ পরিবারের আদি বাসভূমি ও বংশের পরিচয়-জ্ঞাপক নাম। রাজা আদিশূরের পুত্রের নির্দেশে মকরন্দ ঘোষের পুত্র পুরুষোত্তম ঘোষ রাঢ়ের দক্ষিণ অংশে বসবাস করতে থাকেন। তারপর থেকেই তাঁকে 'দক্ষিণ রাঢ়ী' এবং বংশধরগণ দক্ষিণ রাঢ়ের ঘোষ পরিবার বলে সুপরিচিত হন্।

(২) মকরন্দ ঘোষ ছিলেন উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত কনৌজের সম্ভ্রান্ত 'শৌকালিন গোত্রে'র একজন 'ক্ষত্রিয়'। শৌকালিন গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি শৌকালিনের বংশসম্ভূত ছিলেন তিনি। তাছাড়া তিনি নিজেই ছিলেন একাদশ শতাব্দীর একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত। বঙ্গদেশের নৃপতি আদিশূরের আমন্ত্রণে তিনি বঙ্গদেশে বসবাস আরম্ভ করেন এবং স্থানীয় লোকদের শাসন ও নানাবিধ সংস্কার কার্যে তিনি রাজাকে সাহায্য করেন।

(৩) একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজয় সেনের রাজত্বকালে গাবো ঘোষ বঙ্গদেশের হুগলী জেলার সপ্তগ্রামে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

(৪) রাজা বল্লাল সেন নিশাপতি ঘোষকে 'ক্ষত্রিয়' সম্প্রদায়ের একজন কুলীনের মর্যাদা প্রদান করেন। রাজার অধীনে সমাজ সেবার উদ্দেশ্যে ১১২২ থেকে ১১৩৯ সালের মধ্যে কোন এক সময়ে বঙ্গদেশের হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগের বালি গ্রামে তিনি বসবাস আরম্ভ করেন। নিশাপতি ঘোষ প্রতিষ্ঠিত সমাজ 'বালি সমাজ' নামে খ্যাত।

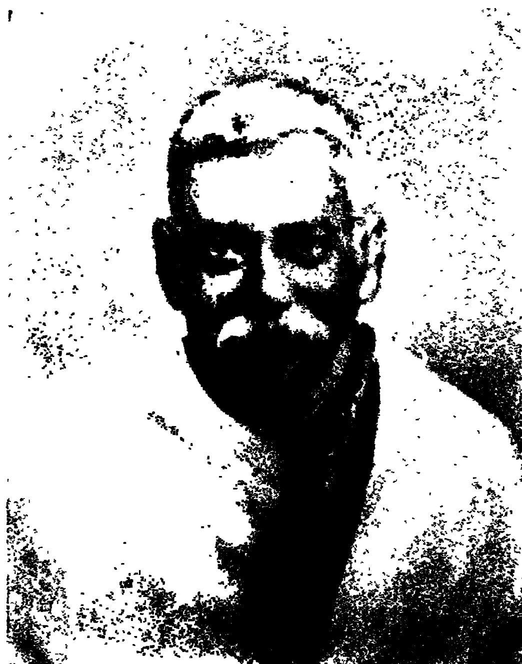
(৫) বঙ্গদেশের ২৪ পরগণা জেলার ইছাপুরে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে দয়ারাম ঘোষ বসবাস করতে শুরু করেন। ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত এটাই ছিল ঘোষ পরিবারের পৈতৃক বাসস্থান। তারপর বৃটিশ সরকার অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরি সম্প্রসারণের জন্য ঘোষ পরিবারের (দয়ারামের পরবর্তী বংশধর পরমহংস যোগানন্দের পিতা ভগবতীচরণ ঘোষ সহ) নিকট হইতে জায়গাটি ক্রয় করেন। তারপর থেকে দয়ারামের ঐসকল বংশধরগণ কলিকাতা, শ্রীরামপুর, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে বসবাস করতে আরম্ভ করেন।



জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—অনন্তলাল ঘোষ



সর্বজ্যেষ্ঠা ভগিনী—রমাশশী



রমাশশীর স্বামী—সতীশচন্দ্র বোস



দ্বিতীয়া ভগিনী—উমাশশী (কৈশোরে)



উমাশশীর স্বামী—সত্যচরণ বসু মল্লিক



তৃতীয়া ভগিনী—নলিনী সুন্দরী



নলিনী সুন্দরীর স্বামী—ডাঃ পঞ্চানন বোস



সর্বকনিষ্ঠা ভগিনী—পূর্ণময়ী (থামু)



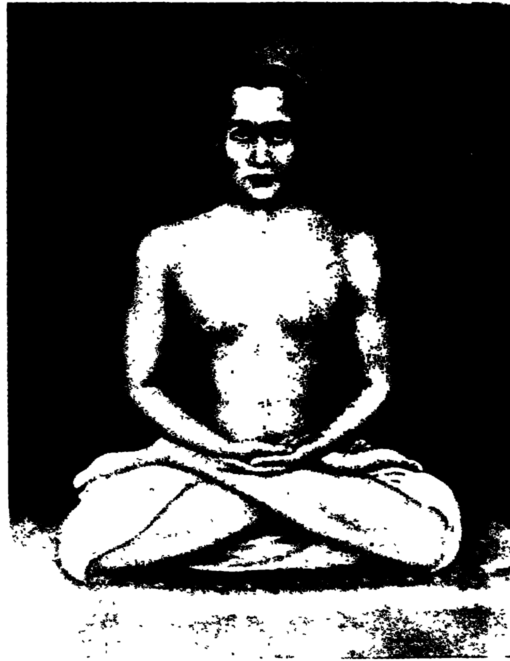
থামুর স্বামী—অরিন্দম সরকার



সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা—বিষ্ণুচরণ ঘোষ



১৯১৪ সালে নবপরিণীতা বধূ পারুল সহ লেখক





শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের গুরুদেব মহাবতার বাবাজী মহারাজ ও শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয় (১৮২৮-১৮৯৫) :
লেখক অংকিত চিত্র



শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়
তরুণ বয়সকালে



তিনকড়ি লাহিড়ী
শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র



দুকড়ি লাহিড়ী
শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র



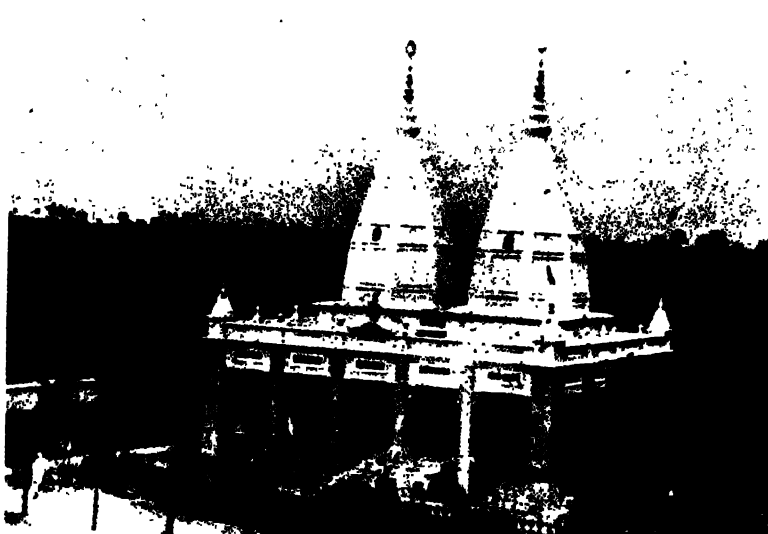
সত্যচরণ লাহিড়ী
শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের পৌত্র



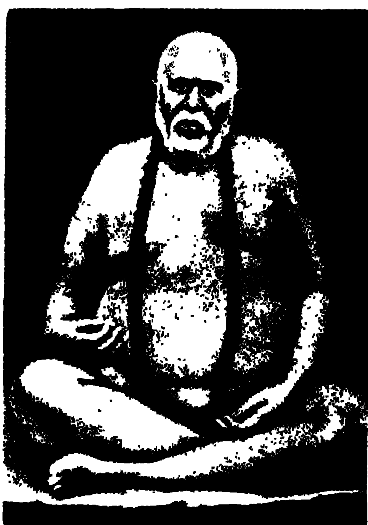
তরুণ বয়সে শ্রীযুক্তেশ্বরজী



'সমাধি' মগ্ন শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী



বিহারের ভাগলপুরে শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের নামে উৎসর্গীকৃত মন্দির





ভূপেন্দ্র নাথ সান্যাল
শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য

ত্রৈলংগ স্বামী
সিদ্ধযোগী এই মহা ঋষি ছিলেন শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের সমকালীন ও বন্ধু



ভাবতপস্বিনী আনন্দময়ী মা ও তাঁর সন্ন্যাসী স্বামী ভোলানাথের (বাম) সংগে মেজদার প্রথম সাক্ষাৎ হয় কলকাতায়। আনন্দময়ী মা-র সম্বন্ধে মেজদা লিখেছেন : 'কি ভিড়ের মধ্যে…কি নীরব ধ্যানে বসে, তাঁর দৃষ্টি ঈশ্বর থেকে কখনও লক্ষ্যচ্যুত নয়।'
(ভেতরের ছবিটি লেখকের অংকিত)



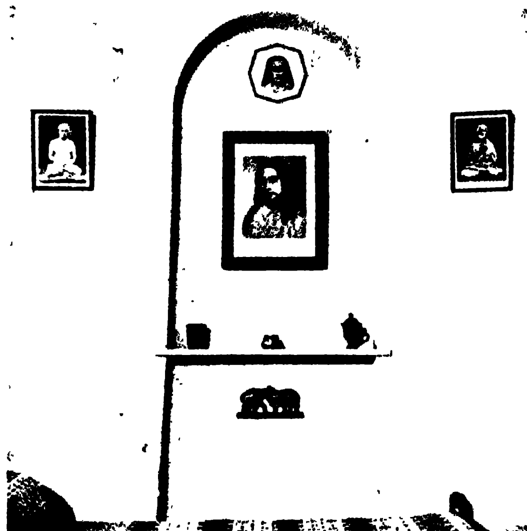
মেজদা—ছয় বৎসর বয়ঃক্রম
(লেখকের অংকিত চিত্র)



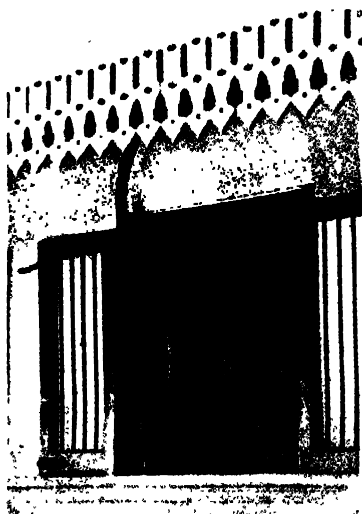
যোগাসনে মেজদা—১৯১৬ সাল
(লেখকের অংকিত চিত্র)



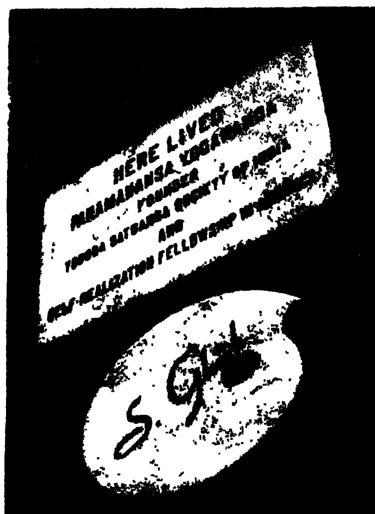
ইছাপুরে পৈতৃক বাড়ীর ঠাকুরঘরে সিংহাসনে
দেবী চণ্ডী (বাম) ও শালগ্রাম শিলা (দক্ষিণ)



৪, গড়পার রোডে মেজদার শয়নকক্ষ



মেজদার ঘরের দরজা। এই ঘরেই মহাবতার বাবাজী মহারাজ আবির্ভূত হয়ে মেজদার প্রতীচ্য ভ্রমণকে আশীর্বাদপূত করেন



মেজদা ও তাঁর বিশ্বব্যাপি মিশনকে সম্মান জানাতে এই ফলকটি সহস্তে নির্ম্মাণ করে আমি বসতবাটীর বাইরে লাগিয়েছি



মেজদার মোটর সাইকেলে চালক লেখক ও সাইডকারে
উপবিষ্ট শ্রীযুক্তেশ্বরজী



মোটর সাইকেল চালক মেজদা—১৯১৬ সাল। পশ্চাতে উপবিষ্ট এন. এন. দাস
ও সাইডকারে তুলসী বোস (দুর্ভাগ্যক্রমে চিত্রটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় মেজদার মুখটি
বিকৃত দেখাচ্ছে)



লেখক ও তাঁর পরিবার—কলিকাতা ১৯৪৯ : (উপবিষ্ট) লেখক ও স্ত্রী পারুল
(দণ্ডায়মান) পুত্রবধূ অঞ্জলি, কন্যা শেফালি ও পুত্র হরেকৃষ্ণ



যোগদা ধ্যানকেন্দ্র—১৯৪১
৪, গড়পার রোড, কলকাতা



মেজদার ভালবাসার কথা স্মরণ করে আত্মমগ্ন লেখক এখানে সেই প্রেমাবতারের একটি চিত্র সম্পূর্ণ করার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন

SELF-REALIZATION FELLOWSHIP

October 16, 1947

Dear Janardas

Prokas Das has recently written me that you are starting the Center in #4 Gurpar Road. I am extremely pleased with this news, and pleased with your determination to render spiritual service in this manner.

What you have undertaken you must carry out to the finish. [illegible] of past tragedies must be wiped away [illegible] more and more to God and by doing some [illegible] work.

You have my full approval for what you have started [illegible] through this noble service to the end. Try to make the work self-supporting and enlist the sympathy and interest of the local people.

[illegible] must also practise [illegible] regularly and write to me [illegible]

With sincerest love [illegible] and blessings to your wife and children,

Erase all memories of tragedy by establishing the altar of meditation for God. Every place on earth is a place of tragedy – only by finding the omnipresence of God – all these places of dark trials become illumined with the light of God. Stick to what you have started. With unceasing blessings & love beyond

P. Yogananda

প্রকাশ দাসের চিঠি থেকে জানলুম যে তুমি ৪নং গড়পার রোডে একটা সেন্টার খুলেছো। খবরটা শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি এবং আরো আনন্দ হয়েছে এই জন্যে যে ঐভাবে তুমি ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চাইছ। যা সুরু করতে যাচ্ছ তা শেষ করা চাই। ভগবানকে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরে এবং ধর্মীয় কাজের মধ্যে দিয়ে অতীতের সমস্ত হৃদয়বিদারক ঘটনার স্মৃতিকে মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। যে কাজ তুমি সুরু করেছ তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে এবং এই মহৎ কাজ অবশ্যই শেষ করা চাই। ঐ কাজ যাতে নিজের খরচ নিজেই চালাতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখো এবং স্থানীয় লোকদের সাহায্য ও সহানুভূতি পাবার চেষ্টা কোরো। নিয়মিত ক্রিয়া অভ্যাস করবে আর আমাকে চিঠি লিখবে। তুমি আমার ভালবাসা গ্রহণ কোরো, আর তোমার স্ত্রী এবং সন্তানদের আমার আশীর্বাদ দিও। ভগবানের জন্য ধ্যানবেদী নির্মাণ করে সব দুঃখময় স্মৃতিকে* মুছে ফেল। পৃথিবীর সর্বত্রই দুঃখ ছড়িয়ে আছে। ভগবানের সর্বব্যাপিত্ব উপলব্ধি হলে পর তবেই সব সংকটময় অন্ধকার দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যে কাজ সুরু করেছ তাতে লেগে থেকো।

তোমার এবং অন্য সকলের প্রতি আমার অফুরন্ত ভালবাসা আর আশীর্বাদ রইল।

* দুঃখময় স্মৃতি বলতে লেখকের পুত্র শ্যামসুন্দরের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে।

(প্রকাশকের মন্তব্য)

3880 San Rafael Avenue
Los Angeles 31, California
Mt. Washington Estates

Sri Sananda Lal Ghosh
Yogoda Sat-Sanga Center
4, Gurpar Road
Calcutta, India

April 6, 1949

Dear Sananda:

It has been physically impossible to write letters as I wanted to do. Really I work fourteen to fifteen hours a day and it doesn't seem I can catch up with all my work.

(I am pleased that you liked the pictures of you and your family and the students. I am extremely proud of you that you have kept the name of my guru in the good old Gurpar Road homestead wherein I was brought up and carried on my spiritual activities first.)

(Aren't you happy to see that from the very place which you are occupying now a world-wide movement has started which is continuously developing.)

Please keep it confidential that if God wills, by the end of this year I propose to visit India.

Please forget the past memories of tragedy. (On the dark back ground of tragedy God has built through you this wonderful Center which will immortalise your name and purify you and many generations behind you and ahead of you with God's and the Guru's blessings.)

Cling to the skirt of the Divine Mother and to her bosom in a stronger way no matter how she beats you or tests you.

Yogananda

ইচ্ছে মতো যে চিঠি লিখব তা আর সম্ভব হয়ে উঠছে না। দিনে চোদ্দ পনের ঘণ্টা পরিশ্রম করেও সব কাজ সেরে উঠতে পারিনে। তোমার, তোমার পরিবার এবং ছাত্রদের ছবি পছন্দ হয়েছে জেনে খুব খুশী হয়েছি। আমাদের পুরানো গড়পার রোডের বাড়ীতে, যেখানে আমি মানুষ হয়েছি, যেখানে আমার সাধন জীবন সুরু হয়েছে, সেখানে যে তুমি আমার গুরু স্মৃতি রেখেছ সেকথা জেনে আমি তোমার সম্বন্ধে বড়ই গর্ববোধ করছি।

যে বাড়ীতে তুমি এখন বাস করছ, সেই বাড়ী থেকেই যে একদিন এক বিশ্বব্যাপি জাগরণ গড়ে উঠেছিল এবং যা ক্রমান্বয়ে প্রসারলাভ করে চলেছে—সে'কথা ভেবে তোমার মনে কি খুব আনন্দ হয় না?

একটা কথা বলি, খুব গোপনে—ভগবানের আশীর্ব্বাদ যদি পাই তাহলে এ'বছরের শেষের দিকে ভারতে যাবার ইচ্ছা আছে।

অতীতের সব বিয়োগান্ত স্মৃতি ভুলে যাও। এই বিষাদময় তমসাঘন পটভূমি থেকেই ভগবান তোমার মধ্যে দিয়ে এই সুন্দর কেন্দ্রটিকে গড়ে তুলেছেন যা তোমার নামকে অমর করে রাখবে, এবং তুমি ও তোমার অতীত এবং ভবিষ্যৎ বংশধররা যার জন্য ঈশ্বর ও গুরুর আশীর্বাদে ধন্য হবে।

মা ভগবতী তোমায় যতই মারুন আর পরীক্ষা করুন তাঁর আঁচল ছেড় না, তাঁকেই আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরো।

April 19, 1949

Sananda lal Ghosh

Dear Sananda:

I have your letter written January 22nd and am very glad to hear from you. I should have written much sooner but have been extremely busy looking after affairs here and seeing people all day long-day in and day out. I long for solitude but this seems to be my life for the present.

I wrote to you a letter recently. Hope you have received it. Love God inspite of his test - everybody belongs to Him. This is His play - work for His Drama good or bad - trying to love Him & concentrate in Him. কেহ কারু নয় তাই জন্মই জীবন মরণ - we must learn to love all as we love them with whom we are born & know we all belong to God. Then everybody becomes our own. I am so proud of you that you are carrying on such a good work at 4 Garpar my Pith where I found God. It was in the name I transferred to you knowing someday you will be heart & soul with me. Do you remember I used to call you my secretary.

— Yogananda

তোমার ২২শে জানুয়ারীর চিঠি পেয়েছি এবং খুব খুশীও হয়েছি। তোমাকে আরও অনেক আগেই আমার উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রতিদিন এখানকার কাজে এত ব্যস্ত থাকি, তার ওপর আছে বারোমাস, সারাদিন ধরে, লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত করা। আমি নির্জ্জনে থাকতে চাই, কিন্তু এখন এভাবেই বোধহয় আমাকে দিন কাটাতে হবে।

কিছুদিন আগে তোমায় একখানা চিঠি দিয়েছি, নিশ্চয়ই তা পেয়েছ। ভগবান যত ভাবেই পরীক্ষা করুন না কেন তাঁকে ভালবেসো—জেনো সবই তাঁর। এ হলো তাঁর লীলা—তাঁর নাটক ভাল বা মন্দ যাই হোক্, তুমি তোমার কাজ করে যাও—তাঁকে ভালবাসার চেষ্টা কোরো আর তাঁতেই মনঃসংযোগ কোরো—'কেহ কারু নয় তাই জন্মই জীবন মরণ'—যাঁদের মধ্যে আমরা জন্মেছি তাঁদের যেমন ভালবাসি, তেমনি সকলকে ভালবাসতে শিখতে হবে। জানবে, আমরা সবাই তাঁরই সন্তান। তাহলে সবাই আমাদের আপনজন হবে।

৪নং গড়পার হলো আমার 'পীঠ'—ওখানেই আমি ঈশ্বরের দেখা পেয়েছি। সেখানে যে তুমি এত ভাল কাজ করছো, তারজন্য আমি তোমার সম্বন্ধে গর্ববোধ করি। মনে আছে বোধহয় ওটা আমার নামেই ছিল এবং আমিই সেটা তোমাকে হস্তান্তর করি, কারণ জানতাম, একদিন তুমি আমার সঙ্গে একাত্মা হয়ে উঠবে। মনে পড়ে কি আমি তোমাকে আমার সেক্রেটারী বলতাম ?

Founded in 1920 by
PARAMHANSA YOGANANDA
CABLE: "SELFREAL"

PUBLISHERS
SELF-REALIZATION MAGAZINE
PHONE CAPITOL ...

SELF-R  WSHIP

3880 SAN RAFAEL AVENUE MOUNT WASHINGTON ESTATES LOS ANGELES 65 CALIFORNIA

Beloved Sananda, Oct 12th 1949

Please come out of your sorrow. This is a drama of God - play your part of sorrow or joy in the best way you can.

(As my brother give your life in God's service - service of the Gurus and in spreading YSS in India.)

I am very proud ... that ... Sadhan ... 21st Sep ... a great celebration with ... etc.)

- Very ... yours
[illegible signature]

নিজের দুঃখকে ভুলে যাও। এ সবই ভগবানের লীলাখেলা—দুঃখী বা সুখী যে ভূমিকাতেই অভিনয় কর না কেন, নিজের সাধ্যমত তা অভিনয় করে যাও।

তুমি আমার ভাই—তাই ভগবানের সেবায়, গুরুদেব সেবায় আর ভারতে ওয়াই. এস্. এস্'কে প্রচার করার কাজে লেগে পড়।

আমার 'সাধন' ক্ষেত্র ঐ পুরানো বাড়ীতে ২১শে সেপ্টেম্বর 'লুচী' ইত্যাদি সহযোগে যে বিরাট উৎসবের আয়োজন করেছিল তার জন্যে আমি তোমার সম্বন্ধে গর্ববোধ করি।

SELF-REALIZATION FELLOWSHIP
3880 San Rafael Avenue
Los Angeles 65, Calif.
U. S. A.

November 17, 1949

Sananda Lal Ghosh
4, Garpar Road
Calcutta 9, India

Dear Sananda:

Thank you so much for your letter of October 27th. The sincerity of your words touched me very deeply.

The Board of Reconciliation and Recommendation can act as a great boon in co-ordinating YSS in India. And I was especially pleased to read your interpretation -- to revitalize the entire organization. That is exactly what the new Board of R and R can help greatly to do.

Being on the Board of R and R will give you the greater opportunity to serve our great Universal cause and I humbly join with you as we turn our minds to God, Babaji, Sri Sri Lahiri Mahasaya and my beloved Guru, Sriyukteswar and all the Great Ones who are giving us our renewed energies and inspirations to make our plans and carry them out.

My love and unceasing blessings always,

P Yogananda

তোমার ২৭শে অক্টোবরের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। তোমার কথার মধ্যে নিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে আমি গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছি।

ভারতবর্ষে ওয়াই. এস্. এসের কাজের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে বোর্ড অফ্ রিকন্সিলিয়েশন্ এণ্ড রেকমেণ্ডেশন্* (Board of Reconciliation and Recommendation) একটা বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। সমগ্র সংগঠনকে নতুন করে প্রাণোদ্দীপ্ত করা সম্বন্ধে তোমার মতামত আমাকে যারপরনাই সন্তুষ্ট করেছে। নতুন R and R বোর্ড ঐ কাজে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।

R and R বোর্ডের সদস্যরূপে তুমি আমাদের এই মহান্ জগৎজোড়া কাজে অংশ গ্রহণ করার যথেষ্ট সুযোগ পাবে। তার আগে এস আমিও তোমার সঙ্গে একত্রে প্রার্থনা করি ঈশ্বর, বাবাজী, শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়, আমার প্রিয়তম গুরুদেব শ্রীযুক্তেশ্বরজী এবং সমস্ত মহাপুরুষদের কাছে, যাঁরা আমাদের নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা কার্যকরী করার জন্য নব নব শক্তি এবং উদ্দীপনা দিয়ে চলেছেন।

---

* পরমহংসজী সৃষ্ট একটি প্রশাসনিক কমিটি। অল্পকাল কাজ করার পর ঐ কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়। (প্রকাশকের মন্তব্য)

PARAMHANSA YOGANANDA
Founder

PUBLISHERS
Self Realization Magazine

SELF-[redacted]HIP

CABLE: "SELFREAL"

PHONE: CApitol 6612

880 SAN RAFAEL AVENUE • MOUNT WASHINGTON ESTATES • LOS ANGELES 31, CALIF.



December 23rd, 1949

Dear Sananda:

I am proud of all that you are doing in God's name to spread the work of Yogoda Sat-Sanga. God will ever bless you if you keep on striving to please Him as you are doing.

Unceasing love,

Paramhansa Yogananda

পু: তোমার পত্র পেয়ে বড় আনন্দ হ'ল। জগন্মাতা
ভগবান যতই মারুন ততই তাঁকে আঁকড়ে ধর।
তুমি ৪বং গড়পারে সভা করে আমাকে বড় আনন্দদান
করেছো - নিঃস্বার্থ ভগবানের কার্য্য করে - ও গুরুদেবের
ও বংশের মুখ রক্ষে করে। ধামুকে বল তার পত্র
না পেয়ে আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হয়েছি। পত্রের জবাব
সময়মত না পেলেও নিয়মিত পত্র লিখিবে। ১৪ ঘণ্টা
বা ১৭ ঘণ্টা রোজ মহাকার্য্য ভগবান ও গুরুর কাজ করে
জীবনপাৎ শ্রেয়। ইতি তোমাদের যোগানন্দ

যোগদা সৎসঙ্গের কাজের প্রসারের জন্য ঈশ্বরের নামে তুমি যা করছ তাতে আমি গর্ববোধ করছি। এখন যেমন করছো, সেইরকম ভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্য তুমি যদি সর্বদা চেষ্টা করে যাও তাহলে ভগবান তোমাকে চিরকাল আশীর্বাদ করবেন।

পুঃ তোমার পত্র পেয়ে বড় আনন্দ হ'ল। জগন্মাতা ভগবান যতই মারুন ততই তাঁকে আঁকড়ে ধর।

তুমি ৪বং গড়পারে সভা করে আমাকে বড় আনন্দদান করেছো—নিঃস্বার্থ ভগবানের কার্য্য করে ও গুরুদেবের ও বংশের মুখ রক্ষে করে। ধামুকে বল তার পত্র না পেয়ে আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হয়েছি। পত্রের জবাব সময়মত না পেলেও নিয়মিত পত্র লিখিবে। ১৪ ঘণ্টা বা ১৭ ঘণ্টা রোজ মহাকার্য্য ভগবান ও গুরুর কাজ করে জীবনপাৎ শ্রেয়।

ইতি তোমাদের
যোগানন্দ

July 27, 1950

Sananda Lal Ghosh
4 Garpar Road
Calcutta 9, India

Dear [illegible]

I have received your letter written June 28th and so glad to have the information which you sent.

I am glad you are in Puri with Nirvanananda and at last are repairing the Hall (left unfinished by Guruji) & creating a temple over his grave. This makes me very happy. I hope you keep the lotus design. I like to know when building will be finished.

Nogen Babu has just left here and brought with him the four paintings. They are most wonderful and will hang in our newly-constructed India House. I am very proud of your work on them. Everybody is astonished at your ability to paint. Each oil painting is indeed classical. They will be immortalized in America in the India House newly created at Los Angeles with an auditorium of 300 people & India Cafe - right in the heart of Hollywood. We have 72 Centers in the world. New institutions are cropping up all the time.

How is your family & building [illegible] love to you that you have turned to God. Keep going towards Him [illegible] with unceasing blessings [illegible]

Paramahansa Yogananda

আমি তোমার ২৮শে জুনের চিঠি পেয়েছি এবং যে খবর তুমি পাঠিয়েছ তার জন্য খুব খুশী হয়েছি।

নির্বানানন্দের সংগে তুমি পুরী গেছ আর সেখানকার হলঘর মেরামত (যা গুরুজী অসমাপ্ত রেখে গিয়েছেন) এবং তাঁর সমাধির ওপর মন্দির নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছ শুনে আনন্দিত হয়েছি। এইসব খবর পেলে আমার বড্ড ভাল লাগে। পদ্ম ফুলের নকশাটা ঐ ভাবেই রেখো। কবে নাগাদ বাড়ী তৈরীর কাজ শেষ হবে জানিও।

নগেনবাবু চারখানা ছবি নিয়ে এসেছিলেন। তিনি সবে এখান থেকে গেছেন। ছবিগুলি বাস্তবিকই অপূর্ব হয়েছে। ওগুলিকে আমাদের নতুন তৈরী ইণ্ডিয়া হাউসে টাঙিয়ে রাখা হবে। তোমার ঐসব কাজ দেখে আমি সত্যি গর্বিত। তোমার ছবি আঁকার ক্ষমতা দেখে সবাই বিস্মিত হয়েছে। তোমার তেলরঙা ছবিগুলি অত্যুত্তম হয়েছে। লস্ এঞ্জেলেসের নতুন তৈরী ইণ্ডিয়া হাউসে, যার প্রেক্ষাগৃহে ৩০০ লোক বসতে পারে, আর একেবারে হলিউডের প্রাণকেন্দ্র ইণ্ডিয়া কাফেতে*—ছবিগুলি অমর হয়ে থাকবে। পৃথিবীতে আমাদের ৭২টি কেন্দ্র আছে। সব সময় নতুন কেন্দ্র গড়ে উঠছে।

তোমার পরিবারের এবং বাড়ীর সকলে কে কেমন আছে। তুমি যে ভগবানের দিকে মন দিয়েছ তার জন্যে তোমায় ভালবাসা জানাচ্ছি। তাঁরই দিকে আরও বেশী বেশী করে মন নিবিষ্ট কর।

অফুরন্ত আশীর্বাদ সহ
তোমার একান্ত আপনার

* রেস্তোরাঁটিতে পরমহংসজীর নিজস্ব রন্ধন প্রণালীতে তৈরী সুন্দর সুন্দর খাদ্য পরিবেষণ করা হতো। কিন্তু নিকটবর্তী সেলফ্ রিয়্যালাইজেশন হলিউড্ টেম্পেলে অধিক জনসমাগম, এবং কার্য্য বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধাদান ও লোকের প্রয়োজন হয়ে পড়ায় ১৯৬৯ সালে এটিকে ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেওয়া হয়। (প্রকাশকের মন্তব্য)

SELF-REALIZATION FELLOWSHIP
3880 San Rafael Avenue
Los Angeles 65, Calif.
U.S.A.

August 29, 1950

Dear Sanando,

I am very glad of the good work you are doing at Puri.
Have you started any work in a Garpar
I am very glad your daughter was spared from disease.
With boundless love & blessings
P Yogananda

P.S. Your picture of Gandhi is most excellent - praised by eminent artists here.
It will permanently find its place in our new most gorgeous S.R. "million dollar" Lake shrine with ocean lake & mountain donated to us.
With blessings P. Yogananda

পুরীতে তুমি যে কাজ করছো তার জন্য আমি খুবই সন্তুষ্ট।

গড়পারে কোন কাজ শুরু করেছ নাকি ?

তোমার মেয়েটি যে রোগ থেকে রক্ষা পেয়েছে তার জন্যে খুবই আনন্দিত হয়েছি।

অফুরন্ত ভালবাসা ও আশীর্বাদসহ

পুঃ তোমার 'গান্ধী' ছবিটি ভারী চমৎকার হয়েছে। এখানকার বিখ্যাত বিখ্যাত আর্টিস্টরা প্রশংসা করেছেন। সমুদ্র, পাহাড় হ্রদঘেরা 'লক্ষ লক্ষ ডলার' দামের খুব সাজনো এস্. আর্. এফ্. লেক্ শ্রাইন যা আমরা দানস্বরূপ পেয়েছি, সেখানেই তোমার ঐ ছবিটা স্থায়ীভাবে থাকবে।

ইতি

আশীর্বাদক

Founded in 1920 by
PARAMHANSA YOGANANDA
CABLE: "SELFREAL"

PUBLISHERS
SELF-REALIZATION MAGAZINE
PHONE: CAPITOL

SELF-  OWSHIP

SAN RAFAEL AVENUE — MOUNT WASHINGTON ESTATES — LOS ANGELES …, CALIFORNIA

December 27, 1950

Sananda lal Ghosh
#4 Gurpar Road
Calcutta, India

Dear Sananda:

I am so pleased that you are overseeing the work on Master's shrine at Puri. Be sure to put on top the golden lotus, which is our symbol, and write to me how the work is coming along. What about the lotus on top of temple.

How is your family? Please remember me to them. And how are you getting along?

With love & blessings to you & Prakash Prabhas & all

very sincerely yours
P. Yogananda

তুমি যে গুরুদেবের পুরীর সমাধি মন্দিরের কাজ তত্ত্বাবধান করছ তারজন্য আমি খুব খুশী হয়েছি। সোনালী রঙের পদ্ম মাথায় বসাতে ভুলো না—ওটাই আমাদের প্রতীক। কাজ কেমন এগোচ্ছে আমায় চিঠি লিখে জানাবে। মন্দিরের চূড়ার পদ্ম কি হলো ?

তোমার পরিবারের সবাই কে কেমন আছে ? তাদেরকে আমার কথা বোলো। তোমার দিনকাল এখন কেমন চলছে ?

প্রকাশ, প্রভাস, তুমি এবং অন্য সবাই আমার ভালবাসা আর আশীর্বাদ নিও।

ইতি
আশীর্বাদক



Dear Sanando　　　　　　　　　　May 30th 1951

I thought you had forgotten me altogether & I anxiously expected reports from Puri & 4, Garpar Rd improvement. It delighted my heart to know you have made an assembly for 200 people. How could you do it on the 3rd or 2nd floor or downstairs - will you let me know

So your Gandhi picture is much appreciated by great artists here (I am glad my brother Sananda is a great artist - I am proud)

Very deeply yours
P. Yogananda

ভেবেছিলাম বুঝিবা তুমি আমাকে একদম ভুলেই গেছ। আমি এদিকে পুরী আর ৪নং গড়পার রোডের কাজ কতদূর কি এগোল, সে খবর জানার জন্যে অধীর আগ্রহে বসে আছি। তুমি যে ২০০ লোকের সভা করেছিলে সে খবর জেনে মনে বড়ই আনন্দ পেলাম। কিন্তু এত লোকের আয়োজন তুমি করলে কোথায়—একতলায়, দোতলায় না তিনতলায়। আমাকে চিঠিতে সব জানাবে।

তোমার 'গান্ধী' ছবি এখানকার বড় বড় শিল্পীদের কাছ থেকে অনেক প্রশংসা পেয়েছে। (আমার ভাই সনন্দ যে এতবড় শিল্পী—তার জন্য যেমন আমার আনন্দ তেমনি গর্ব হয়)।

ইতি

আশীর্বাদক

SELF-REALIZATION FELLOWSHIP
3880 San Rafael Avenue,
Los Angeles 65, Calif.
U.S.A.

Telephone:
CApitol 0212

Cable:
"SELFREAL"

November 14, 1951

Sri Sananda Lal Ghosh
4 Garpar Road
Calcutta, 9, India

Dear Sananda,

Thanks for your recent letter and greetings from you and family. I am very happy to know about the silver lotus. I hope that it won't be too long before I receive the glad tidings that Gurudeva's Samadhi-pith in Puri is finished. From time to time I receive letters from over there asking about it.

Your trouble is you don't write to me & inform me about the happenings & building at Garpar Road. I am so interested. Please send me a photograph of the hall with the people & yourself there. Tell N.N. Das to take a flash light picture. Please let me know if the Hall is on the 1st floor or 2nd or 3rd floor & how you made it.

[illegible]

তোমার সর্বশেষ চিঠি এবং তুমি ও তোমার পরিবারের শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ। তোমার রূপোর পদ্ম সম্বন্ধে খবরে আমি খুবই খুশী হয়েছি। এখন আশা হচ্ছে কিছুদিনের মধ্যেই পুরীতে গুরুদেবের সমাধি-পীঠ নির্মাণ হয়ে যাওয়ার সুসংবাদও পাব। মাঝে মাঝে ওখান থেকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে অনেকে আমায় চিঠি লেখেন।

মুশকিল হলো, তুমি গড়পার রোডের বাড়ী এবং সেখানকার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমাকে চিঠি বা সংবাদ কিছুই দাও না। সেখানকার কথা জানতে আমি খুবই আগ্রহী। হলঘরে লোকজন সমেত তোমার একখানি ছবি আমাকে পাঠাবে। এন, এন, দাসকে বোলো যেন ফ্ল্যাশ্ লাইটে ছবিটা তোলে। হলঘরটা একতলা, দোতলা না তিনতলা—কোথায় করেছ এবং কেমনভাবে করেছ, সব কথা আমায় চিঠিতে জানাবে।

তুমি ও অন্য সবাই আমার ভালবাসা নিও

আশীর্বাদক

Telephone:
CApitol 0212

SELF-REALIZATION FELLOWSHIP
3880 San Rafael Avenue,
Los Angeles 65, Calif.
U.S.A.

Cable:
"SELFREAL"

December 28, 1951

Dear Sananda,

I am glad that you are going ahead with the work on the temple and that you will be sending weekly reports to Premanandaji and that you are making a sketch of the plan. I am looking forward to seeing the sketch. I am awfully delighted you made those nice lotuses of varnished silver or stainless steel. Unless it is varnished every six months with colorless shellac the sea will rust them. We do varnish our lotuses by the sea & thus save them. Please never come in to anger "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভব মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিনম্" [illegible]

ইতি তোমাদের যোগানন্দ,

জেনে খুশী হলুম যে তোমার মন্দির তৈরীর কাজ বেশ ভালভাবে এগিয়ে চলেছে। তুমি যে প্রেমানন্দজীকে সপ্তাহে সপ্তাহে কাজের রিপোর্ট পাঠাবে আর প্ল্যানেরও একটা স্কেচ্ তৈরী করছ তা জেনে আনন্দ হলো। স্কেচ্‌টি দেখার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছি। চক্‌চকে রূপালী রংয়ের অথবা স্টেনলেস্ স্টীলের অতগুলি সুন্দর সুন্দর পদ্মফুল বানিয়েছ জেনে ভারী খুশী হয়েছি। যদি ৬ মাস অন্তর অন্তর বর্ণহীন চাঁচগালা দিয়ে ঐগুলিকে বার্নিশ করা না হয়, তাহলে সমুদ্রের লোনা হাওয়ায় মরচে ধরে যাবে। আমরাও এখানে সমুদ্র পার্শ্ববর্তী জায়গার পদ্মগুলিকে বার্নিশ করে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাই।

কখনো ক্রোধের বশ হয়ো না।

'কাম এস ক্রোধ এস রজোগুণ সমুদ্ভব

মহাশনো মহাশাপ্মা বিদ্ধেনমিহ বৈরিনম।

ভগবানের উপর খুব বিশ্বাস রাখবে—নিজের family ও সবাই তাঁর রূপ তাঁর জিনিষ—তাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করবে—ও আদর ভগবৎ ভালবাসা practice করবে। তোমার হৃদয় খুব ভাল কষ্ট পাচ্ছ বলে নিজের ভিতর ক্রোধকে স্থান দিওনা—ওর মত মহাপাপ ও অশান্তির কারণ আর কিছুই নাই। আমি কত কষ্টের মধ্যে গিয়েছি—কিন্তু অন্তরের ভিতর ক্রোধকে ঢুকতে দিই নাই। তুলসী মিঠা বচনসে ভগবান সুখ মিলতে হঁয়।

ইতি তোমাদের যোগানন্দ

PARAMHANSA YOGANANDA
Founder

PUBLISHERS
Self-Realization Magazine

SELF-[redacted]SHIP

CABLE "SELFREAL"

PHONE: CApitol 0612

SAN RAFAEL AVENUE • MOUNT WASHINGTON ESTATES • LOS ANGELES 31, CALIF.



January 30, 1952

Sananda Lal Ghosh
c/o Puri Ashram
Puri, India

Beloved Sananda:

I have received your recent letters about going to Puri and of the progress of the building of the temple there. I cannot begin to tell you how much this means to me. The work that you all are doing is of utmost importance -- and God will ever bless you for it.

The enclosed letter is for your information. When Prokas comes to Puri, please look into the matter fully and send me complete information about your findings. Please let Robinarayan see the enclosed letter also.

With love, unceasing blessings yours,
Paramhansa Yogananda

তোমার পুরী যাওয়া এবং সেখানকার মন্দির তৈরী কাজের অবস্থা জানিয়ে তোমার চিঠিগুলি আমি পেয়েছি। এই কাজটা যে আমার কাছে এখন কত গুরুত্বপূর্ণ সেকথা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। তোমরা সবাই মিলে যে কাজ করছ তার গুরুত্ব অপরিসীম—এরজন্য ভগবান তোমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করবেন।

সঙ্গের চিঠিটা তুমি পোড়ো। প্রকাশ পুরী এলে বিষয়টা সম্বন্ধে ভালভাবে খোঁজখবর কোরো এবং তোমাদের অনুসন্ধানের ফলাফল বিস্তৃতভাবে আমাকে জানিও। রবিনারায়ণকেও সঙ্গের চিঠিখানা দেখাতে পার।

ভালবাসা সহ

আশীর্বাদক

Founded in 1920 by
PARAMHANSA YOGANANDA
CABLE: "SELFREAL"

PUBLISHERS
SELF-REALIZATION MAGAZINE
PHONE CAPITOL [illegible]

SELF-R[redacted]WSHIP

3880 SAN RAFAEL AVENUE   MOUNT WASHINGTON ESTATES   LOS ANGELES 65, CALIFORNIA

Feb 25th 1952

Dear Sananda

~~My young brother is bound for~~
my brother is such an artist - build a
better lotus than America. Indeed it is
very artistic.

I am very proud of you & grateful to you that my
gurujis samadhi mandir is so beautifully done
I owe everything to guruji

with deepest love to you & all
Yours ever
P Yogananda

আমার ভাই যে এতবড় একজন শিল্পী—এ কি আমার কম আনন্দ! আমি আমেরিকায় যে পদ্ম তৈরী করিয়েছি তার চেয়েও ভাল পদ্ম সে তৈরী করেছে। বাস্তবিক ভারী চমৎকার হয়েছে।

আমার গুরুজীর সমাধিমন্দির যে এত সুন্দরভাবে তৈরী হয়েছে, তার জন্য আমি যেমন তোমার সম্বন্ধে গর্বিত তেমনি কৃতজ্ঞও বটে। আমার যা কিছু সবই গুরুজীর কাছে পাওয়া।

তুমি আর অন্য সবাই আমার গভীর ভালবাসা নিও।

ইতি

আশীর্বাদক

Founded in 1920 by
PARAMHANSA YOGANANDA
CABLE: "SELFREAL"

PUBLISHERS
SELF REALIZATION MAGAZINE
PHONE CAPITOL 0212

SELF-R  WSHIP

3880 SAN RAFAEL AVENUE — MOUNT WASHINGTON ESTATES — LOS ANGELES 65, CALIFORNIA

Br. Sananda Lal
Dear one, — Feb 28th 1952

Thank you for your letter and wonderful photographs. Please send photographs without the building platforms. The lotus is extremely wonderful befitting my artistic brother.

I long for photographs — please take photographs of Yogoda Math from all sides.

I again say the lotus is beautiful & the temple very wonderful. I will send the $100 —

যেমন সকলের কাছে ভাল ব্যবহার কর সেইরূপ বাটীতে পারুলের সঙ্গে ও অন্তরঙ্গদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবে — জীবনত আমাদের শেষ হয়ে এল — সকলকে মিষ্ট বচন ও হৃদয়ের সত্যি ব্যবহারে জয় করিবে ইতি আঃ ভালবাসা

P. Yogananda

চমৎকার ফটোগুলি আর তোমার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। ভারা ছাড়া ছবি পাঠিও। পদ্মটা দারুণ সুন্দর—আমার শিল্পী ভাইয়ের উপযুক্তই বটে।

আমার আরও ফটো দেখতে ইচ্ছে করে—চারদিক থেকে যোগদা মঠের ফটো তুলে আমাকে পাঠিও।

আমি আবার বলছি—পদ্ম আর মন্দির দুটোই খুব সুন্দর হয়েছে। আমি শীঘ্রই ১০০ ডলার পাঠাব।

যেমন সকলের কাছে ভাল ব্যবহার কর সেইরূপ বাটীতে পারুলের সঙ্গে ও অন্তরঙ্গদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবে—জীবনত আমাদের শেষ হয়ে এল—সকলকে মিষ্ট বচন ও হৃদয়ের সত্যি ব্যবহারে জয় করিবে। ইতি আঃ ভালবাসা